বাংলা বানান ও উচ্চারণ

বাংলা

বানান ও উচ্চারণ

বাংলা
বানান ও উচ্চারণ

সুকুমার বাগচি

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কাছাড় জেলা সমিতি
'বঙ্গভবন', শিলচর, কাছাড়, আসাম

বাংলা বানান ও উচ্চারণ : সুকুমার বাগচি
bangla banan o uccharan
(A Book on Bengali Spelling and Pronunciation by Sukumar Bagchi)

© Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan

গ্রন্থস্বত্ব : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

প্রথম প্রকাশ : ১৯ মে, ২০২৩

প্রকাশক : ডঃ জয়ন্ত দেবরায়, সম্পাদক-কাছাড় জেলা সমিতি,
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন,
'বঙ্গভবন', অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর, কাছাড়, আসাম

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব, আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রুফ সংশোধন : তমোজিৎ সাহা

মুদ্রণ : অক্ষর পাবলিকেশানস্
সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ি রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা

মূল্য ❑ ৩০০ টাকা

উৎসর্গ

বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও বহু অভিধান-প্রণেতা
বন্ধুবর সুভাষ ভট্টাচার্যকে

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

'বঙ্গভবন', অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর ৭৮৮০০১, কাছাড়, আসাম

Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan

CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE, SILCHAR

প্রাক্-কথন

জাতিসত্তার বিকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাই জাতির আত্মপরিচয়। জাতিকে সজীব এবং বিকশিত করে তার ভাষাচর্চা। পৃথিবীর জীবন্ত ভাষাগুলোর মধ্যে যেসব ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বাংলা তার অগ্রগণ্য সারিতে রয়েছে। এই ভাষাচর্চার পরিসর বিশ্বের নানা দেশে প্রসারিত হলেও ভারতবর্ষের বাঙালি অধ্যুষিত বিভিন্ন প্রান্ত আজ বহুমাত্রিক সমস্যার আবর্তে। রাজ লালিত ভাষাগুলোর আগ্রাসনের প্রণালিবদ্ধ ধারায় বাংলা এবং বাঙালি আজ অনেকটাই বিপন্ন। একটা জাতির সার্বিক উত্তরণে মাতৃভাষা শিক্ষা খুবই অপরিহার্য। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর অবলুপ্তি ঘটিয়ে, রক্তচক্ষু দেখিয়ে ভাষা ব্যবহারের সংবিধান সম্মত অধিকারগুলো কেড়ে নিতে চেয়ে এক অসহনশীল আবহ তৈরি করা হচ্ছে।

একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশেও বাংলা ভাষার উঠে দাঁড়ানোর জন্য উন্মুখতা স্পষ্টভাবেই রয়েছে। এই ভাষা চেতনাই ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের ধারাকে রাজ্যে রাজ্যে সজীব রেখেছে। তবে জাতি ও ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার স্ফুরণকে পল্লবিত করতে নিরন্তর শুদ্ধ ভাষাচর্চা এক আবশ্যক শর্ত। বঙ্গীয় বিভিন্ন উপ-ভাষা বাংলার মূল স্রোতধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এটা ভাষা সত্তার প্রধান প্রবাহকে গতিশীল রেখেছে। অবশ্য শুদ্ধ বাংলা বানান ও তার সঠিক উচ্চারণ এবং যথাযথ প্রয়োগের বিদ্যায়তনিক পাঠকে ভাষার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্যই প্রসারিত করা জরুরি।

এই প্রেক্ষাপটে 'বাংলা বানান ও উচ্চারণ' গ্রন্থটি বাংলা ভাষাচর্চার ধারায় নবতম সংযোজন। বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক পরম শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাগচি শুদ্ধ বাংলা

বানান এবং উচ্চারণের চর্চা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই প্রয়াসের ফসল হিসেবে তিনি এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। সময়ের দাবি মেনে বাংলা শব্দাভিধান, শব্দকোষ, বানান অভিধানের আধুনিক সংস্করণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি খুবই প্রাসঙ্গিক। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন প্রায় পাঁচ দশক ধরে আসামে বাঙালির আত্মপরিচয় রক্ষা, ভাষার অধিকার সংরক্ষণ এবং শুদ্ধ ভাষাচর্চার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধারার সঙ্গে সংগতি রেখেই আমরা সময়োপযোগী এই গ্রন্থটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি, গ্রন্থটি বাংলা ভাষাচর্চার জন্য আন্তরিক প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়ক হবে।

বিনীত

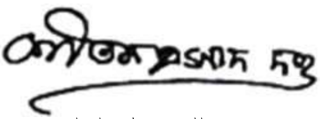

সাধারণ সম্পাদক,
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি
১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

লেখকের নিবেদন

এই বইয়ের প্রায় পুরোটাই কলকাতার মাসিক কবিসম্মেলন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিছু অংশ শিলচরের দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কবি অমিতাভ দেবচৌধুরীর সৌজন্যে। এইসূত্রে কবিসম্মেলন-এর সম্পাদক কবি শ্যামলকান্তি দাশ ও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কবি শংকর চক্রবর্তী এবং অমিতাভকে ধন্যবাদ জানাই।

যাঁদের সুপরামর্শ ও সহায়তায় এরকম একটি বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শঙ্খ ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, সুভাষ ভট্টাচার্য এবং পলাশ বরন পাল। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

এই বইয়ের মূল পরিকল্পনার অঙ্গ আরো তিনটি বই। তার মধ্যে ‘বাংলা উচ্চারণের নিয়মাবলি’ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। বাকি দুটি বই— ‘বাংলা বানানের নিয়মাবলি’ এবং ‘বাংলা বানান ও উচ্চারণ অভিধান’-এর কাজ চলছে। আশা করছি, আগামী বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি সম্মানিত বোধ করছি এবং সেইসঙ্গে সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সঞ্জীব দেব লস্করকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অকুণ্ঠিত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

যেসব বই ও পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে যথাস্থানে, তাই সে-তালিকা আর আলাদা করে দেওয়া হলো না।

সুকুমার বাগচি

১ মে ২০২৩

লেখকের অন্যান্য বই :

সমর্পণ (কবিতা-সংকলন)
গোধূলির দিনলিপি (ওই)
জন্মদিন প্রতিদিন (ওই)
দূরের জানালা (ওই)
এইসব এলোমেলো (ওই)
বর্ণমালা ও কিংবদন্তির মণিপুর (প্রবন্ধ-সংকলন)
বাংলা উচ্চারণের নিয়মাবলি
ভূমিকা-সহ সম্পাদিত গ্রন্থ : সবুজ পাতার ডাক

প্রকাশের অপেক্ষায়:

বাংলা বানানের নিয়মাবলি
আট মহিরুহ (স্মৃতিচারণ)
নানারকম (প্রবন্ধ-সংকলন)
বাংলা বানান ও উচ্চারণ অভিধান

ভূমিকা

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক রাজশেখর বসু বাংলাভাষায় অনেকদিন আগেই একটি ছোট অভিধানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে (১৯৩৭ সালে) এর বাস্তবায়ন ঘটেছে 'চলন্তিকা' প্রকাশের মাধ্যমে। এই অভিধান পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও সপ্রশংস উক্তি ছিল— 'বাংলাভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে যে ইচ্ছে করবে তোমার বই ছাড়া তার অন্য গতি নেই।' অতঃপর ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের (১৯৫১) শ্রীবসু এ অভিধান সম্বন্ধে বলেন, 'যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।' বর্তমানে আমরা যে-গ্রন্থটি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি তা অবশ্য কোনো অভিধান নয়, কিন্তু অভিধানের অন্যতম বিষয় বানান ও উচ্চারণ প্রসঙ্গই এখানে প্রধান।

বিগত তিনটি দশক থেকে নতুন অভিধান বা সম্পাদিত অভিধানের নব-সংস্করণের অভাব আমাদের ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর কোনো চটজলদি সমাধানও নেই। তবে এ নিয়ে চিন্তাচর্চার প্রয়োজন এখনই। ভাষাভাবুক সুকুমার বাগচি মহোদয় ঠিক সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'বাংলা বানান ও উচ্চারণ' বইটি লিখে বাঙালির ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতার মধ্যে একটি আশার সঞ্চার করেছেন। এ নিয়ে বিশদ বলার আগে কয়েকটি দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে করি।

আমরা জানি সুভাষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান' (১৯৮৬), 'সংসদ বাংলা অভিধান' (২০০০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' (১৯৯৯), 'আকাদেমি বানান অভিধান' (১৯৯৭), অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'সংসদ বানান অভিধান' (১৯৯৮, সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ ২০১৯), 'সংসদ ব্যাকরণ অভিধান' (২০০৫)— এই সব ক'টি গ্রন্থ আজ প্রায় নিঃশেষ। পবিত্র সরকারের 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৮৭) বইও কয়েকটি সংস্করণের পর আজ দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া বাজারে আর যা আছে তার প্রায় সবই পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, ক্ষেত্রবিশেষে পুরনো বইয়ের ফটোকপি, এমন-কি পাইরেটেড সংস্করণও।

মানোএল থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে সাহিত্য সংসদ, বাংলা আকাদেমি পর্যন্ত আড়াইশো বছরের বাংলা অভিধান ঐতিহ্যের ধারাটি আজ প্রায় স্তব্ধ। অসম্পাদিত পুনর্মুদ্রণে সময়ের চাহিদা মেনে সংশোধন, পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংযোজনের কোনো ব্যাপার নেই। এদিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পরিবর্তন ঘটে চলেছে বাংলা বাক্যগঠন, বাংলা উচ্চারণে; বাংলা ভাষায় নিরন্তর ঘটে চলেছে নতুন শব্দ সংযোজন, প্রচলিত শব্দের অর্থান্তর, যা একটি জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক চারিত্র্যলক্ষণ। এমতাবস্থায় অসম্পাদিত পুনর্মুদ্রিত অভিধান দিয়ে তো কাজ চলতে পারে না। সীমান্তের ওপারে, অর্থাৎ বাংলাদেশের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশে আজ মৌলিক গ্রন্থ— বাংলা শব্দকোষ, শব্দাভিধান, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব— সমস্তকিছুই এক অর্থে মৃত গ্রন্থ।

গত শতকের নয়ের দশক এবং বর্তমান শতকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত মূল্যবান অভিধানসমূহের নব-সংস্করণের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের খবরও নেই। অথচ নানা প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও বাংলাভাষার চর্চা অব্যাহত রয়েছে, সমাজসংস্কৃতি, শিক্ষা, বিনোদনজগৎ এবং ব্যাবসাবাণিজ্যে (সীমিত পরিসরেই) বাংলাভাষার প্রয়োগ চলছে, ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের কল্যাণে মুদ্রণ জগতে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগ, অত্যাধুনিক সফ্‌টওয়ারের আত্মপ্রকাশ এতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

এটা সত্য, বিগত দিনগুলোতে বাঙালি-জীবনে নানা ধরনের পরিবর্তনের অভিঘাত লেগে বাংলা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র একদিকে যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনই সংকুচিতও হয়েছে। সম্প্রসারণের ক্ষেত্রটি সাহিত্য ও বিদ্যায়তনিক জগৎ ছাপিয়ে মুদ্রণ মাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে— এর মধ্যে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, আন্তর্জালীয় সামাজিক মাধ্যম, বাণিজ্যিক পোর্টাল যেমন আছে, তেমনই আছে মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, রেডিয়ো-টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপন-জগৎ। ভাষার এই বিস্তার শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক সীমারেখায় আবদ্ধ না-থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষার চারটি ভুবন পেরিয়ে বিশ্বের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সম্প্রসারণের বিপরীতে সংকোচনের দিকটিও উল্লেখনীয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের টানাপোড়েন, খণ্ডিত রাষ্ট্রীয় (এবং প্রাদেশিক) ভাষানীতির ফলে উদ্ভূত সমস্যা, ভারতীয় রাষ্ট্রসীমার বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষার সংকট এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দি-ইংরেজির আধিপত্যের চাপে বাংলা ভাষার আজ বিপন্ন দশা। এই বিপন্নতাকে আমরা মাতৃভাষা-বিহীনতা বলে চিহ্নিত করতে চাইছি। ইংরেজি-হিন্দি মাধ্যমে শিক্ষিত প্রজন্মের কাছে বাংলাভাষা শ্রুতিগ্রাহ্য হলেও বাংলা লিপি ক্রমাগতই তাদের কাছে অধরা হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে (বৈদ্যুতিন) যেটুকু বাংলার প্রয়োগ এদের মধ্যে রয়েছে, তা সবই ইংরেজি হরফে, যে-প্রবণতা কোনো একদিন এই জাতিকে লিপি-বিস্মৃতির দিকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সংখ্যক সহজবোধ্য, নিত্য-ব্যবহার্য শব্দকোষ, প্রয়োগাভিধান, বানান অভিধান, সমার্থশব্দকোষ, পরিভাষাকোষ কিংবা বিষয়ভিত্তিক কোষগ্রন্থের নিতান্তই প্রয়োজন। আর বাজার-চলতি অভিধানগুলোর সম্পাদিত সংস্করণের প্রয়োজন সমধিক তা তো বলাই বাহুল্য।

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার ১৯৯৮ সালে 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'বাংলা কথাটিতে এখন আর দেশ বোঝায় না, ভাষা আর সাহিত্য দুইই বোঝায়।' কিন্তু বিগত অর্ধশতকে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে-যে 'বাংলা' শব্দটা ভিন্ন তাৎপর্য লাভ করেছে। একদিকে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ-এর আত্মপ্রকাশ এবং 'পূর্ববঙ্গ' শব্দটির প্রয়োগ সংকোচন; অপরদিকে, আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অখণ্ড ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় বৈধতা

নিয়ে ক্ষমতাসীনদের সংশয়, অকাতরে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখার প্রবণতা— এ সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলা-বাঙালি-বাঙালিত্ব পুরো বিষয়টাই আজ জটিলতার আবর্তে। তবুও 'বাংলা' শব্দটি পশ্চিমবঙ্গের (এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গেরও) প্রাদেশিক/রাষ্ট্রীয় সীমারেখার বাইরে সেইসব সম্প্রসারিত ভূমি, যেখানে ঐতিহাসিক কাল থেকে পুরুষানুক্রমে বাঙালির বসবাস, তাকেও বোঝায়। [গাঙ্গেয় সমভূমির স্বাভাবিক উত্তরাংশ আসামের বরাক উপত্যকা তো আবহমান কাল ধরেই বঙ্গদেশের সঙ্গে ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত ভাবে বিলগ্ন।]

বলে নেওয়া প্রয়োজন, বাঙালির উৎসভূমির একটি প্রধান অংশ আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্র, বাকি যে-অংশের সঙ্গে বাংলা (বঙ্গ) শব্দটি জুড়ে আছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক পরিচিতি নিয়ে, সেই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম (বরাক-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা), মেঘালয়, ত্রিপুরা, ডিমাপুর (এর একাংশ ঐতিহাসিক ভাবে কাছাড় রাজ্যের সঙ্গে বিলগ্ন), মণিপুর (জিরিবাম অঞ্চল, প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালে কাছাড় রাজ্যের অংশ থাকায় ওখানে কয়েক শতাব্দ ধরে পুরুষানুক্রমে বাঙালির বসতি) এবং উত্তরে বিহার-ঝাড়খণ্ড-মানভূম নিয়ে ঐতিহাসিক কাল থেকে বাঙালির বিস্তারভূমি— এ যে আজ প্রকৃতই 'মমতাবিহীন কালস্রোতে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা' ভিতরে বাইরে। কথিত এলাকায় বাঙালির আত্মপ্রকাশ ও অবস্থান ঐতিহাসিক সত্য হলেও বাঙালি তাদের এই বিস্তারভূমিকে 'বাংলা' বলে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা কদাপিও দেখাবে না (বাঙালি তো আগ্রাসী ছিল না, আজও নয়), কিন্তু আবহমানকালের বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই 'সম্প্রসারিত বাংলায়' 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল'-এর স্তুতিবন্দনায় বাঙালি নিঃসংশয়। এসব অঞ্চলে বাঙালি পরিচিতি নিয়ে গৌরবের সঙ্গে তাঁদের বেঁচে থাকার এই স্বাভাবিক প্রবণতা কারো ভ্রূকুঞ্চনের কারণ হলেও বাঙালিকে নিজস্ব পরিচিতির ক্ষেত্রে দৃঢ় হতে হবে। এ মন্ত্র (শুধু একটি গান নয়) যে তার গৌরবজনক উত্তরাধিকার, যার সঙ্গে রয়েছে বঙ্গভঙ্গ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সংশ্লেষ—

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান।

(দুই)

ইতিপূর্বে বাংলাভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদির ওপর যে-সমস্ত কাজ হয়েছে তাতে বিহার-ঝাড়খণ্ড, বাংলা-সংলগ্ন ওড়িশা কিংবা সিলেট-কাছাড়ের সংস্থান থাকলেও তা ছিল একেবারেই প্রান্তিক উল্লেখ। স্মর্তব্য যে লিপি, বানান, ব্যাকরণ, পরিভাষা নিয়ে ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক উঠলে বরাক উপত্যকা থেকে সুজিৎ চৌধুরী ১০ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় ভাষা ও বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে আসামের বাঙালির মতামত অগ্রাহ্য হয়েছে এ অভিযোগ তুলে বলেন : 'পশ্চিমবঙ্গে বসে ভাষা

নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা যাঁরা করেন, তাঁরা অনেক সময়েই ভুলে যান যে বাংলা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ভাষা নয়।' তিনি বরাক উপত্যকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে এখানে বঙ্গভাষীর হার আশি শতাংশ এবং গোটা আসামে বঙ্গভাষীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি (সংখ্যাটি অবশ্য ইতিমধ্যে কোটির কাছাকাছি পৌঁছেছে)। এই বিশাল সংখ্যক বঙ্গভাষার শতকরা ৯৫ জনই প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে পড়ে এ-কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বলেন, 'সর্বশিক্ষা প্রকল্পের অর্থে এমন সব পাঠ্যবই বেরিয়েছে, যেগুলোর ভাষা বাংলা, না অসমিয়া তা বোঝা যায় না। অন্যসব বইয়েও অসমিয়া শব্দ ও বাক্যরীতি প্রায়ই ঢুকে যায়। হেলাফেলার কাজ, তথ্য-বিকৃতি আর তথ্য-বিভ্রাট আকছার ঘটছে।' এদেশে বাংলা বিদ্যাচর্চার মূল কেন্দ্র কলকাতা— এ সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না, কারণ সেই একই, বাংলা বলতে শুধু একটি দেশ বা একটি প্রদেশ বোঝায় না।

এমতাবস্থায় ওখানে (কলকাতায়) ভাষা সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বই দীর্ঘদিন থেকে প্রকাশ না-হওয়া একটি সার্বিক সমস্যা। আমাদের এই রাজ্যে ব্যক্তিগত সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারে যে-ক'টি শব্দাভিধান, বানান অভিধান, কোষগ্রন্থ রয়েছে তা দিয়ে তো চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পত্রপত্রিকা, সাহিত্য, বৈদ্যুতিন মাধ্যম (টেলিভিশনের গ্রাফিক্স), বিজ্ঞাপন, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা, বানানের শুদ্ধ্যশুদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো কোষগ্রন্থ এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। নয়ের দশকের যেসব অভিধান খুঁজে পেতে কাজ চালানো যেতে পারে (হচ্ছেও), এতে সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত সব সমস্যা-সংশয়ের সমাধান হয়নি (হওয়ার কথাও নয়, কারণ ভাষাটি যে সততই সচল, সজীব ও জীবন্ত, কদাচ মৃতভাষা নয়); তা ছাড়া বানান অভিধানে (বাংলা আকাদেমির) যেসব বিকল্পের সংস্থান রাখা হয়েছে এতেও সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রয়ে যায়। তা ছাড়াও আরেকটি দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, সেদিনের স্বীকৃত ভুল পরবর্তী দিনগুলোতে লাগাতার ব্যবহৃত হয়ে হয়ে একটা গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করে ফেলে (এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়), ব্যাকরণগত ভাবে বিশুদ্ধ বানানের অগ্রাধিকার অস্বীকার করেও অশুদ্ধ বানানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অনেক সময় কিছু ব্যাকরণ-অসিদ্ধ বানানকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলে (যেমন 'ইতোমধ্যে'র স্থলে 'ইতিমধ্যে' ইত্যাদি)। এই সবকিছু নিয়ে শেষ (আপাত) সিদ্ধান্তটির জন্য লেখক, পাঠক, শিক্ষার্থীর জন্য চাই নবীকৃত অভিধান, যা প্রতি দশকেই একবার করে অন্তত সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার, Oxford English Dictionary (OED) প্রতিবছর রুটিন মাফিক আপডেটেড হয়। গত বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে এতে সংযোজন করা হয়েছে ৬৫০টি নতুন শব্দ।

এই সমস্ত কিছু বিবেচনায় রেখে বাংলাভাষা ও বিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাণকেন্দ্রে শব্দাভিধান, শব্দকোষ, বানান অভিধান ইত্যাদির নতুন সংস্করণের দাবি রেখেই বঙ্গসাহিত্য তার প্রান্তিক অবস্থান থেকে 'বাংলা বানান ও উচ্চারণ' বইটি প্রকাশ করে তিনটি দশকের

বন্ধ দুয়ারটিতে একটি আঘাত দেবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস নিয়েছে।

বলে রাখতে চাই, বঙ্গসাহিত্য ইতিপূর্বে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় ভাবে ত্রিদিবসীয় বানান কর্মশালার আয়োজন করেছিল। তাতে ব্যাপক সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অশোক মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বাগচি, তপোধীর ভট্টাচার্য ছাড়াও জন্মজিৎ রায়, সুবীর কর সহ অন্যান্য অনেকে অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এর পর জেলা স্তরে একাদিক্রমে বাংলা বানান কর্মশালা চালু রেখেছে বঙ্গসাহিত্য। এবং সেই সঙ্গে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তকে বানান বিভ্রম, ভাষা বিকৃতি জনিত সমস্যার নিরসনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে তা অবশ্য বলা যাবে না। তবে শুদ্ধ মাতৃভাষার স্বার্থে এ প্রয়াস জারি আছে। বর্তমান বইটি এ ক্ষেত্রে অন্যতম।

বাংলা বানান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে বিগত তিরিশ বছরে যে প্রশ্নগুলো সংগত কারণেই উঠে এসেছে— এগুলোকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা, এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসাসূত্র সংবলিত এরকম একটি গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল। বর্তমান বইটিতে শুধু শব্দের বানান ও উচ্চারণ কী হবে তা-ই নয়, কেন হবে— এ নিয়েও তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনার সংস্থান রাখা হয়েছে। যতদিন সময়ের দাবি মেনে একটি প্রাসঙ্গিক বানান ও উচ্চারণের অভিধান আমাদের হাতে না-পৌঁছোয়, ততদিন এরকম একটি সহজপাঠ্য বই নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হোক। কবি, গদ্যকার এবং বাচিক শিল্পী সুকুমার বাগচি নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে বাংলা ভাষাচর্চায় সমস্যার দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সমস্যা নিরসনের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরও দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এখানে। বঙ্গসাহিত্য তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বাংলাভাষার জগতে ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য ঘোচাতে যদি সামান্য সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয় তাহলে এর কৃতিত্ব অবশ্যই সুকুমারবাবুর। বাংলাভাষার প্রতি গভীর গভীরতর ভালোবাসা ছাড়া তাঁর পিছনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক তকমাও নেই। আমরা আশা করব এই পথ দিয়েই আমাদের ভাষাচিন্তায় আসবে নতুন প্রাণের জোয়ার। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে, এপারে স্বাভাবিকভাবেই তা সহজলভ্য নয়, সর্বতোভাবে প্রাসঙ্গিকও নয়। সীমান্তের এপারে বাংলাভাষার অন্যতম কেন্দ্র (যাকে বাংলার প্রথম ভুবন বলেও চিহ্নিত করা হয়) নিশ্চয়ই এ দিকে মনোযোগ দেবে। তবে বাংলাভাষার সম্প্রসারিত অপর ভুবন বরাক উপত্যকা (যাকে বাংলাভাষার তৃতীয় ভুবন বলেও অভিহিত করা হয়) আপাতত এ বই নিয়েই শুরু করুক তার নতুন যাত্রা।

সঞ্জীব দেবলস্কর

সভাপতি, কাছাড় জেলা সমিতি,

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর।

১৯ মে ২০২৩

বিষয়সূচি

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১) প্রাক্কথন	১৭
২) বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার প্রসঙ্গ	২৯
৩) সুকুমার রায়, হরপ্রসাদ কথা	৪০
৪) উপেন্দ্রকিশোর-রামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী সংবাদ	৪৫
৫) মা.চ.বা.-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার প্রসঙ্গ	৫১
৬) বাংলার গায়ে সংস্কৃতের পোশাক!	৫৩
৭) মাত্রাহীন এ-কার, মাত্রাযুক্ত এ-কার : একটি বিকল্প প্রস্তাব	৫৯
৮) আকাদেমি, সংসদ অভিধান প্রকাশের তিন দশক পর	৬২
৯) রেফ, দ্বিত্ব, অনুস্বার, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি	৭০
১০) শঙ্খ, পবিত্র, সুভাষ, পলাশ বরন কী বলেছেন	৭৭
১১) ক.বি.২-এর সমাধি	৮২
১২) ক.বি.২-এর আরো কিছু কথা	৮৩
১৩) চলিত ভাষা, কথ্য ভাষা	৮৮
১৪) য়-শ্রুতির অপপ্রয়োগ, অন্তঃস্থ ব-এর লিপ্যন্তর	৯৩
১৫) এ কেমন ধরনধারন	৯৯
১৬) শ, ষ, স প্রসঙ্গ	১০৯
১৭) ষ্ট বনাম স্ট	১১৫
১৮) ব্য-ব্যা এবং অন্যান্য	১২০
১৯) কি/কী-র প্রয়োগ	১২২
২০) উচ্চারণের গুরুত্ব	১২৮
২১) উচ্চারণের কিছু নিয়ম ও ব্যতিক্রম	১৩৬

বাংলা বানান ও উচ্চারণ

প্রাক্‌কথন

[এই লেখায় যেসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উচ্চারণ বোঝানোর দরকার সেখানে আদ্য এ-কারের অ্যা উচ্চারণ নির্দেশের জন্য ে, মাঝখানের এ-কারের অ্যা উচ্চারণের জন্য ে, আদ্য এ বর্ণের অ্যা উচ্চারণের জন্য এ আর কোনো বর্ণের হ্রস্ব-ও উচ্চারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বর্ণের ওপর ঊর্ধ্বকমা অর্থাৎ ' চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজি z-এর উচ্চারণ বোঝাতে প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণে জ-এর নীচে ফুটকি দিয়ে জ় লেখা হবে।]

কয়েকটি কারণে বানান ও উচ্চারণ নিয়ে আমি আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। প্রথম কথা, গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, যে-কোনো লেখালিখির জন্যই শুদ্ধ বানান একটা অত্যাবশ্যক শর্ত। তাই এ-ব্যাপারে সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। সেইসঙ্গে আরো একটা বিষয় আমাদের মনোযোগ দাবি করে। এ-দেশে মোটামুটি চারটে বানানবিধি প্রচলিত, তার মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণ বা অনুসরণ করব?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ১৯৩৭ সালের মে মাসের তৃতীয় সংস্করণ আর সংশোধিত হয়নি। সেখানে অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রচুর বিকল্প বর্তমান, বিশেষ করে ই-কার আর ঈ-কারের প্রশ্নে, যদিও সেই বানানবিধি অনুমোদন করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুদ্রিত রচনায় অতৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রাকৃত বাংলায় আমরা সাধারণত দীর্ঘ উচ্চারণ করি না। এই যুক্তি পরবর্তী তিনটি বানানবিধি অর্থাৎ আনন্দবাজার পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং সাহিত্য সংসদের বিধিতেও স্বীকৃত। যেমন স্বীকৃত তৎসম শব্দেও সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত হলে বাংলায় সরল বিকল্পটি গ্রহণের প্রবণতা। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে চারটে বানানবিধিতেই যথেষ্ট মিল রয়েছে। অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও পরবর্তী তিনটি বানানবিধিতে অমিল খুব বেশি নয়, যদিও বানানে কিছু-কিছু পার্থক্য রয়ে গেছে। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ১৮ নম্বর নিয়মে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরে উ-কার বা ও-কারের পরে অযথা 'য়' বা 'য়া' না-লিখে 'অ' বা 'আ' ব্যবহারের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তার প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত নিতান্তই বিরল। উল্লেখ্য যে, ওই বিধি অনুসরণ করে রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' অভিধানে অবিকল্প 'জানুআরি' 'ফেব্রুআরি' বানান সুপারিশ করেছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি'-র অন্তর্গত 'বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান' গ্রন্থে সুভাষ ভট্টাচার্য উচ্চারণ অনুযায়ী 'জানুআরি' 'ফেব্রুআরি' বানান অনুমোদন করেছেন, অথচ ওই সংস্থার কোনো পত্রিকাতেই তা মানা হয় না। একসময়ে বিশ্বভারতী-র

বইপত্রে জানুআরি ফেব্রুআরি বানান ব্যবহৃত হত, এখন আর হয় না। কী কারণে এই যুক্তিসংগত বানান বাতিল করা হলো জানা নেই।

বস্তুত নিয়মটি অনুসরণের দৃষ্টান্ত খুবই কম। কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকদের অধিকাংশই নির্বিচারে 'য়' বা 'য়া' লিখে চলেছেন। বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরে উ-কার বা ও-কারের পরে অকারণে 'এ'-র পরিবর্তে 'য়ে' প্রয়োগও কি সংগত? অথচ এ-ক্ষেত্রেও আমরা বিভ্রান্তির শিকার। 'মানোএল', না 'মানোয়েল' — কোন্‌টা সঠিক বানান? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মানোএল' লিখেছেন। জ্যোতিভূষণ চাকীর লেখা 'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি'-র অন্তর্গত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় 'এ' ও 'য়ে' দু-রকম বানানই রয়েছে — সেখানে পাঁচ বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তিন বার 'এ' দিয়ে (মানোএল) আর দু-বার 'য়ে' দিয়ে (মানোয়েল)। জ্যোতিভূষণবাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলে তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি 'এ' দিয়ে মানোএল লেখা উচিত বলেই জানান।

বাংলা ভাষায় যেহেতু প্রচুর বিদেশী শব্দ এসেছে, যত সময় যাচ্ছে ততই আরো বেশি করে বিদেশী সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দও ব্যাবহারিক প্রয়োজনে আমাদের বলতে-লিখতে হচ্ছে সেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বহুল ব্যবহৃত বেশকিছু শব্দের বানান বিশেষজ্ঞরা নির্দিষ্ট করে দেবেন এমন একটা প্রত্যাশা আমাদের ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং সাহিত্য সংসদের বানানবিধিতে উল্লিখিত বিষয়ে একটি কথাও বলা হয়নি। তবে অল্প হলেও সুনীতিকুমার এবং রাজশেখর বসুর লেখায় বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরে 'য়' বা 'য়া'-র পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যেমন, 'এডওআর্ড' 'ওঅর' 'বুর্জোআ' প্রভৃতি।

সমস্যা রয়েছে অন্তঃস্থ ব-এর লিপ্যন্তর নিয়েও, কেননা বাংলায় এই বর্ণের আলাদা কোনো রূপ নেই — বর্গ্য- ও অন্তঃস্থ-ব দুইয়েরই চেহারা ও উচ্চারণ অভিন্ন। নাগরী লিপিতে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য অসম-এর প্রধান ভাষা অসমিয়াতেও অন্তঃস্থ ব-এর স্বতন্ত্র চেহারা (ৱ) ও উচ্চারণ রয়েছে। আমাদের প্রাকৃতে অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপের অভাবে মূল উচ্চারণের সঙ্গে মিল রেখে 'অ' ব্যবহারের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এইভাবে সুপারি অর্থে অন্তঃস্থ ব-যুক্ত সংস্কৃত 'গুবাক' (অর্থাৎ 'গুৱাক') শব্দটি প্রাকৃতে 'গুআ' হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় সেটাকে 'গুয়া' করা হলো। করলেন সেইসব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যাঁরা বাংলা ভাষাটাকে বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য বিবেচনা করতেন না, এবং অকারণে বাংলার স্বাভাবিক প্রকৃতি উপেক্ষা করে যত্রতত্র সংস্কৃতের 'য়'-শ্রুতি চালিয়েছেন। এ-কথা ইতিপূর্বে অনেকেই বলেছেন। স্বয়ং আচার্য সুনীতিকুমারও স্বীকার করেছেন, ''বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবারে সংস্কৃতের প্রকৃতি নহে, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সুযুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আমার পুস্তকে সর্বত্র প্রচার করিবার

চেষ্টা করিয়াছি।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশিতম প্রতিষ্ঠাদিবসে ১৩৮০ সনে প্রদত্ত ভাষণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত ও নেপাল মজুমদার সম্পাদিত 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের 'আধুনিক বাঙ্গলা বানান প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০ মে ২০০৭, পৃষ্ঠা ২০১ দ্রষ্টব্য।)

বলা বাহুল্য, গুআ আর গুয়া-র উচ্চারণ ভিন্ন। একই অর্থে শব্দটি অসমিয়া ভাষায় অন্তঃস্থ ব-তে আ-কার দিয়ে লেখা হয় (অর্থাৎ গুৱা) যার উচ্চারণ আমাদের প্রাকৃতের মতোই 'গুআ'। এই রাজ্যের প্রধান শহর 'গুৱাহাটী'র অসমিয়া উচ্চারণ তাই 'গুআহাটি', কিন্তু বাংলায় লেখা হয় 'গুয়াহাটি', যদিও বাঙালিরাও অসমিয়াদের মতোই 'গুআহাটি' উচ্চারণ করে। একই উদ্ভট কাণ্ড ঘটেছে অসমিয়াদের একটি সুপরিচিত পদবি 'বরুয়া'-র ক্ষেত্রেও। মূল বানানটি অন্তঃস্থ ব-যুক্ত বরুৱা, উচ্চারণ 'বরুআ'। চর্যাপদ সহ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শব্দের মধ্যে ও শেষে আ-যুক্ত শব্দের উদাহরণ ভূরি ভূরি — দেখাইআ, বহিআ, করিআ, মারিআ, ফরিআ, বিআএল, লইআ, ফুলিআ, পসিআঁ, ছাড়িআ, লাগিআ, চাপিআ, হইআ ইত্যাদি। অথচ সেই দৃষ্টান্ত অবহেলা করে ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা ভাষায় 'য়া' জাঁকিয়ে বসল।

স্বীকার করি, গুয়া-র মতো যেসব বানান দেড়শো-দুশো বছর ধরে চলছে এবং আমাদের অভ্যাসের অন্তর্গত, সেগুলোকে আর পালটানো যাবে না। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অন্তঃস্থ ব-যুক্ত শব্দ লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে উচ্চারণের কাছাকাছি বানান লেখার চেষ্টা নিশ্চয় করা যেতে পারে। অবশ্য অন্তঃস্থ ব-যুক্ত বহু তৎসম শব্দ হিন্দি, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষায় পৃথক অন্তঃস্থ ব-র রূপ থাকায় সেইভাবে লেখা ও উচ্চারিত হলেও বাংলায় বর্গ্য-ব দিয়েই লেখা ও উচ্চারিত হয়। যেমন— অনুভব (অনুভৱ) অবতারণা (অৱতারণা) অভিনব (অভিনৱ) উদ্ভাবন (উদ্ভাৱন) কেবল (কেৱল) জীব (জীৱ) পৃথিবী (পৃথিৱী) বিপ্লব (বিপ্লৱ) মনোভাব (মনোভাৱ) মানব (মানৱ) রাজীব (রাজীৱ) ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য অন্তঃস্থ ব-যুক্ত সেইসব অতৎসম শব্দের লিপ্যন্তর যেগুলোর ব্যবহার বাংলায় সুপ্রচলিত নয়। এটাকে কোনো নিয়ম বা বিধির আওতায় আনা গেলে কাজটা নিঃসন্দেহে সহজ ও সুশৃঙ্খল হবে।

সমস্যা রয়েছে গ ও দ-এর সঙ্গে ব কোথায় কোথায় যুক্তবর্ণ হিসেবে লেখা হবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণে হসন্ত দিয়ে ব আলাদা করে লেখা হবে সেসব নিয়েও। তার ফলে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাচ্ছে যেখানে একই অনুচ্ছেদে 'বাগ্‌বিধি' বানানটি তিন বার 'বাগ্বিধি' আর দু-বার 'বাগ্‌বিধি' রূপে মুদ্রিত। এ-ব্যাপারে একটা নিয়ম অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তা অনেকেই খেয়াল রাখেন না কিংবা সচেতনভাবে মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সকলেই জানেন, উচ্চারণের সঙ্গে বানানের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যে-কোনো ভাষার শব্দই প্রথমে মুখে উচ্চারিত হয়, লেখার ব্যাপারটা আসে অনেক পরে। আর শব্দের যথার্থ বর্ণনাই তো বানান। বানান শব্দটির মূল 'বর্ণনা' হওয়ায় এককালে বহু

সংস্কৃতভক্তই ‘বাণান’ লিখতেন, যেমন কর্ণ আর পর্ণ থেকে আগত কান আর পান বানানও ণ দিয়ে লেখা হতো। অসমিয়াতে এখনও ‘কাণ’ ‘পাণ’ লেখা হয়। বাংলায় অবশ্য এখন আর অতৎসম শব্দে মূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দায় স্বীকার করা হয় না, বিশেষ করে বাংলায় ণ-এর উচ্চারণ না-থাকায় অতৎসম শব্দে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ন ব্যবহারই স্বীকৃত। যা-ই হোক, আসল কথা, উচ্চারণকে অনুসরণ করেই তো বানান লেখার কথা। নানা কারণে সবসময় সেটা পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠে না, এবং বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতি হুবহু মানলে বহু শব্দের বানানেই অকারণে বাহুল্যকে প্রশ্রয় দিতে হয়। তা ছাড়া, কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, ইংরেজিতে পি-ইউ-টি (put) পুট আর বি-ইউ-টি (but) বাট হয়, বাংলায় সেরকম থাকলেই-বা অসুবিধে কী?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজির দৃষ্টান্ত কি বাংলার ক্ষেত্রে চলবে? বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দগঠন ও উচ্চারণের পদ্ধতি কি তাতে ব্যাহত হবে না? আমরা যতদূর বুঝি, প্রতিটি ভাষার বানান ও উচ্চারণের রীতি ভিন্ন। ইংরেজিতে শব্দের শেষে স্বরবর্ণ থাকলে তা উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয়। ফরাসি ভাষার ক্ষেত্রে আবার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক উলটো। Paris শব্দটার বানান ইংরেজি ও ফরাসিতে একই, কিন্তু ইংরেজিতে শেষ বর্ণটির উচ্চারণ থাকলেও সেটা ফরাসিতে উচ্চারণ করা হয় না। অসমিয়া ও বাংলায় যেমন মোটামুটি একই বর্ণমালা (অসমিয়ায় অতিরিক্ত অন্তঃস্থ ব রয়েছে আর র-এর চেহারাটা আলাদা) থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ দুটি ভাষায় পৃথক।

বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রভেদ তো আরো অনেক বেশি। ইংরেজি স্বরবর্ণগুলির কোনো সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ নেই। ‘a’ বর্ণটির উচ্চারণ কোথাও অ (অল্‌সো, অল্‌দো, কল্‌, টল্‌, বল্‌) কোথাও এ (এইব্‌ল্‌, কেব্‌ল্‌) কোথাও অ্যা (অ্যাক্ট্‌, অ্যান্ড, অ্যাবাউট্‌, ফ্যাক্ট্‌) কোথাও আ (আর্‌গিউ, আনস্যার্‌), ‘e’-এর উচ্চারণ কোথাও ই (ইভ্‌ন্‌, ইভল্‌ভ্‌, ইরেক্ট্‌, কমিটি, বিফিট্‌) কোথাও এ (এডিট্‌, এডিব্‌ল্‌, এন্‌ট্রি, এন্‌ড্‌, এক্‌স্‌ট্র্যা পেন্‌, পেল্‌ট্‌) কোথাও আ (পার্‌ফর্‌ম্‌), ‘i’-এর উচ্চারণ কোথাও ই (ইন্‌, ইন্‌টেন্‌ট, পিন্‌, টিন্‌, ডিশ্‌ হিন্‌ট্‌), কোথাও আই (আইকন্‌, আইডিঅ্যাল্‌, গেইন্‌, ডাইন্‌, ফাইন্‌, রেইন্‌) কোথাও আ (ফার্‌ম্‌, ডার্‌ট্‌), ‘o’-এর উচ্চারণ কোথাও অ (অন্‌, অক্‌টেইভ্‌, অর্‌ড্যার্‌, ডক্‌, ডন্‌, মরিস্‌) কোথাও ও (গো,) কোথাও উ (ডু,) কোথাও আ (কাল্যার্‌,) এবং ‘u’-এর উচ্চারণ কোথাও আ (আন্‌কাট্‌, আন্‌ডার্‌, আম্‌ব্রেলা, কাট্‌, বাট্‌,) কোথাও উ (পুট্‌, ব্রুইন্‌, ব্রুনেট্‌) আবার কোথাও ইউ (ইউনিটি, ইউনিভার্‌স্যাল্‌, ইউনিভ্যার্‌সিটি)।

আপাতত যা মনে এল তার কয়েকটিই শুধু এখানে উল্লেখ করলাম, ভালো করে খুঁজলে দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যাবে। বাংলা স্বরবর্ণ ও তার চিহ্নগুলির এরকম বিভিন্ন উচ্চারণের কথা কি ভাবা যায়? ইংরেজি ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো বর্ণের উচ্চারণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ‘c’-এর উচ্চারণ কখনো চ কখনো ক, আবার ‘ch’-এর উচ্চারণ চ ক ছাড়াও শ হয়। তা ছাড়া, ইংরেজদের ক আর প-এর মৌখিক উচ্চারণ অনেকটা খ আর ফ-এর কাছাকাছি। সুতরাং ইংরেজির দৃষ্টান্ত বাংলায় অনুসরণের

প্রশ্নটাই অবান্তর নয় কি?

তবে হ্যাঁ, বাংলাতেও এমন বহু শব্দ রয়েছে যেখানে বানান পুরোপুরি উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয় না বা লেখা যায় না, কিংবা আমাদের উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বানানকে অনুসরণ করে না। বাংলা স্বরবর্ণ ও তার যোজ্য রূপগুলির উচ্চারণ মোটামুটি নির্দিষ্ট, হেরফের ঘটে না বললেই চলে। পার্থক্য রয়েছে শুধু শব্দের শুরুতে এ আর এ-কার উচ্চারণে, যা কোথাও এ এবং কোথাও অ্যা। বহু ক্ষেত্রেই সেটাও একটা নিয়ম মেনেই চলে, তবে তার ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ঋ-এর আলাদা উচ্চারণ নেই, সেটা 'রি'-এর মতো। তবে ঋ-কারের উচ্চারণ ঠিক ই-কার যুক্ত র-ফলা নয়, তার একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতি রয়েছে যা বাচিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলেরই শিক্ষণীয় ও অনুসরণযোগ্য। বিষয়টি নিয়ে পরে আলাদা করে বলা যাবে। অবশ্য ঋ ও তার যোজ্য রূপের ব্যবহার অতৎসম শব্দের বানানে না-রাখলেই চলে। ঈ আর তার যোজ্য রূপ এবং ঊ আর তার যোজ্য রূপের উচ্চারণও বাংলায় নেই, সে-কারণে তৎসম শব্দ ছাড়া আধুনিক মান্য চলিত বাংলায় (মা.চ.বা.) এগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

এই দৃষ্টান্তগুলি বাদ দিলে প্রায় একই কথা বলা যায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণের ব্যাপারেও। ব্যতিক্রম শুধু ক্ষ উচ্চারণে, যা আসলে একটি যুক্তবর্ণ (ক+ষ)। আরো অল্প কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন— হ-এর সঙ্গে কোনো বর্ণ যুক্ত হলে তার উচ্চারণ পালটে যায়, যুক্তবর্ণে যে-অন্তঃস্থ ব বাংলায় উচ্চারিত হয় না তার পূর্ব বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে আর যে-অন্তঃস্থ ব উচ্চারিত হয় তার পূর্ব বর্ণের বানানে হসন্ত দেওয়া হয়। নিয়ম সহ বিষয়গুলি যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তা ছাড়া, বাংলায় জ ও য-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই, ঙ ও ং-এর উচ্চারণ অভিন্ন, ঞ বর্ণটির উচ্চারণও সুনির্দিষ্ট নয়, ষ শ-এর মতো উচ্চারিত হয় এবং বিসর্গের উচ্চারণ অনেকটা হ্-এর মতো। তবে তৎসম ছাড়া অন্য শব্দের মধ্যে বাংলায় বিসর্গের ব্যবহার নেই বললেই চলে, এমন-কি তৎসম শব্দেও অন্ত্য বিসর্গ বর্জন করা হয়েছে। বাংলায় আঃ বা বাঃ না-লিখে আহ্ বা বাহ্ লিখলেই চলে। যুক্তাক্ষর ছাড়া অন্যত্র স-এর খাঁটি দন্ত্য উচ্চারণ না-থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা ঠিক শ-র মতো নয়, স-যুক্ত বেশকিছু শব্দে বাঙালির একটা নিজস্ব উচ্চারণ রয়েছে, যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব।

এসব থেকে মনে হয়, বহু শব্দই আমরা প্রায় উচ্চারণানুযায়ী লিখতে পারি। বেশি সমস্যা হয় তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে। এক. যুক্তবর্ণগুলি বাংলায় স্বরান্ত উচ্চারিত হয়, এবং অধিকাংশ সময়ে তা 'অ' নয়, অনেকটা 'ও' বা ও-কারের মতো। যাকে বলা যায় হ্রস্ব-ও, অথচ উচ্চারণ অনুযায়ী ও-কার দেওয়া হয় না। দুই. একমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দে এবং বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরকালে উচ্চারণের সংশয় দূর করার প্রয়োজনে কিছু কিছু শব্দের মধ্যে ও শেষে হসন্ত প্রয়োগের বিধান আধুনিক কালে স্বীকৃত, অন্যত্র হসন্ত উচ্চারণ হলেও তার চিহ্ন দেওয়া হয় না। ফলে সেগুলিও ঠিক উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নয়। তিন. ও বা ও-কার না-থাকলেও বহু শব্দের শুরুর, মাঝখানের বা শেষের উচ্চারণ স্বরান্ত, যা

অনেক ক্ষেত্রেই হ্রস্ব-ও। প্রথম বর্ণের এই উচ্চারণ-বিকৃতি বেশ কয়েকটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খ্রি.) লেখা 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক প্রবন্ধে। কয়েকটি নিয়মের প্রতি ইতিপূর্বে একটি লেখায় ('বাংলা উচ্চারণ নিয়ে দু-চার কথা', 'কবিসম্মেলন', ডিসেম্বর ২০১৫) আমি সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, বর্তমান ধারাবাহিক রচনায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রয়েছে।

যুক্তাক্ষর আর ও-কারবিহীন তৎসম শব্দের শেষ বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণের ব্যাপারে মা.চ.বা.-য় বিসর্গলোপের কারণটা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অতৎসম শব্দের মধ্য ও শেষ বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণের পিছনে সবসময় নির্দিষ্ট নিয়ম কাজ করে বলে মনে হয় না। অথচ বাংলায় অতৎসম শব্দের সংখ্যাই বেশি। একদা সুনীতিকুমার জানিয়েছিলেন যে সাধুভাষায় ৪৪ শতাংশ তৎসম শব্দ রয়েছে। চলিত বাংলায় স্বভাবতই তা আরো কম। এবং আমরা যদি মনে রাখি যে বাংলার মতো জীবিত ভাষায় নিত্যই বহু অতৎসম শব্দ সংযোজিত হয়ে চলেছে, তাহলে বর্তমানে তৎসম শব্দের ব্যবহার ৪০ শতাংশের বেশি না-হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ মা.চ.বা.-য় অতৎসম শব্দ ৬০ শতাংশের মতো। অথচ বানান নিয়ে বিভ্রান্তি, বিকল্প তথা মতপার্থক্য অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই বেশি। বিকল্প ও মতপার্থক্য আরো কমানো যায় কি না সেটা আমার এই রচনার একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

যেহেতু ইতিপূর্বে বাংলা বানান ও উচ্চারণ নিয়ে মাঝেমধ্যে দু-চার কথা লিখেছি সেহেতু বর্তমান রচনায়ও সেসবের কিছু প্রতিফলন ঘটতে পারে। পুনরুক্তিজনিত ত্রুটির জন্য আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। তবে ভরসা এই যে আমার আগেকার লেখাগুলির অধিকাংশই এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের নজরে আসেনি বলেই অনুমান করি।

বলে রাখা ভালো যে আমি ব্যাকরণে বেশ কাঁচা, উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ নই। তবে মাতৃভাষার সামান্য চর্চা যেমন করি তেমনই তার বানান ও উচ্চারণের ব্যাপারেও আগ্রহ রয়েছে। অল্পস্বল্প লিখেছি, তবে ভাবনাচিন্তাই করেছি বেশি। এই রচনায় নতুন কিছু বলতে পারব এমন দাবি করি না, বরং আমার আলোচনা পূর্বসূরিদের প্রদর্শিত পথেই চলবে। তাঁদের কিছু কিছু রচনা পড়েছি, একালের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও শিক্ষার্থীর মন নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে থাকি। এঁদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার ও সুভাষ ভট্টাচার্যের নাম (তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ক্রম অনুযায়ী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো অনেকের লেখা পড়েছি, তবে তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে খুব অল্পই কথা হয়েছে। একবার কয়েকটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ''এসব নিয়ে লিখুন-না, 'কবিসম্মেলন'-এই লিখুন।'' ইদানীং আমার বানান ও উচ্চারণ বিষয়ক চিন্তাভাবনা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় সুভাষবাবুর সঙ্গেই, এমন-কি দূরভাষেও। আর কলকাতায় গেলে সুযোগ পেলেই শঙ্খদার দ্বারস্থ হই। তিনি ও সুভাষবাবু এরকম একটি লেখার

ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁদের ওপর আমার অসীম আস্থা। এবং এই বিশ্বাসও রয়েছে যে কোনো-কোনো বিষয়ে সংকট কিংবা সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

ভরসা রাখছি পাঠক-পাঠিকাদের ওপরও। তাঁদের প্রতি অনুরোধ, আমার ভুলত্রুটি নির্দেশ করে এই আলোচনায় শামিল হোন। তার ফলে নিজের ভ্রান্ত মত ও সিদ্ধান্ত সংশোধনের সুযোগ পাব, অন্য কেউও উপকৃত হতে পারেন। বস্তুত আলোচনার অর্থ তো পারস্পরিক মতবিনিময়, একতরফা ভাষণ নয়। তা ছাড়া, বর্তমান রচনাটি এক বিশেষ পরিকল্পনার অন্তর্গত। আমি চাইছি, এই আলোচনার শেষে মীমাংসার মাধ্যমে বিকল্প যথাসম্ভব পরিহার করে বিভ্রান্তিমূলক কিছু বানান ও উচ্চারণের একটি অভিধান সংকলনের কাজে হাত দিতে। সেইসঙ্গে থাকবে এমন একটা ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো শব্দকে চিহ্নিত করলেই তার উচ্চারণটাও শোনা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণ লিখে বোঝানো যায় না। আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে (International Phonetic Alphabet বা IPA দিয়ে) বোঝানো সম্ভব হলেও বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে হুবহু প্রকাশ করা খুবই কঠিন। আইপিএ সাধারণ মানুষের কাছে সুপরিচিত বা সহজবোধ্য নয়। বিকল্প হিসেবে শোনানোর ব্যবস্থাই অধিকতর সন্তোষজনক সমাধান বলে মনে হয়।

‘বন’ ও ‘বোন’ এই দুটি শব্দেরই প্রথম বর্ণের উচ্চারণ ও-কারান্ত, যদিও প্রথমটি হ্রস্ব-ও। ‘প্রজ্বলন’ ও ‘প্রোজ্জ্বল’ শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অথচ বাংলা অভিধানে উভয় ক্ষেত্রেই ও-কার দিয়ে উচ্চারণ প্রদর্শন করা হয়। সমস্যা রয়েছে ঋ-কার আর হ্রস্ব ই-কার যুক্ত র-ফলার উচ্চারণের তফাত বাংলায় লিখিতভাবে বোঝানোর ব্যাপারেও। সে-কারণে ‘বিকৃত’ আর ‘বিক্রীত’ শব্দের উচ্চারণ কিছু-কিছু অভিধানে অভিন্ন হয়ে শোভা পায়। এরকম সামান্য পার্থক্য অনুধাবনের জন্য ইংরেজি ভাষায় একাধিক সিডি পাওয়া যায়, আমেরিকান উচ্চারণের সিডিও লভ্য। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিডি-তে ব্রিটিশ ও আমেরিকান উভয় উচ্চারণই শোনানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাংলা উচ্চারণ-নির্দেশক শ্রাব্য সিডি-র অস্তিত্বের কথা জানা নেই। কেউ-কেউ বলেছেন, বাংলাদেশে উচ্চারণের এরকম সিডি প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তা সংগ্রহ করতে পারিনি। সুতরাং সেটা নিছকই গুজব কি না বলা মুশকিল। তা ছাড়া, এপার বাংলা আর ওপার বাংলায় বেশ কিছু শব্দের মান্য উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকেও আমাদের আলাদা উচ্চারণের ব্যবস্থা থাকলে বাচিক শিল্পীদের অবশ্যই কাজে লাগবে বলে আমার ধারণা। কাজটা শেষ করে যেতে পারব কি না কিংবা পরিণামে কতটা সফল হব তা নিয়ে খানিকটা সংশয় থাকলেও চেষ্টা নিশ্চয় করা যেতে পারে।

যদি মনে রাখি যে গত দুই দশকে বাচিক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এরকম একটা প্রয়াসের প্রয়োজন অবশ্যই অনস্বীকার্য। আমাদের

যৌবনকালে নাটকের দলের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, আবৃত্তিশিল্পী ছিলেন অল্প কয়েকজন আর সংবাদপাঠকের অস্তিত্ব ছিল শুধু আকাশবাণীতে। ইতিমধ্যে টেলিভিশনের অনেকগুলি চ্যানেল এসে গেছে, সেখানে চলছে প্রচুর 'সিরিয়াল', নাটকের দলের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। প্রচলিত হয়েছে শ্রুতিনাটক, আবৃত্তিও এখন বেশ জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। (শুধু চলচ্চিত্রের সংখ্যায় বোধহয় খুব-একটা হেরফের হয়নি।) ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংবাদপাঠক-পাঠিকা, ঘোষক-ঘোষিকা, আবৃত্তিশিল্পী, সংগীতশিল্পীদের সংখ্যা যে বহুগুণ বেড়েছে তা নিশ্চয় বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেইসঙ্গে উচ্চারণের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি? পেয়ে থাকলে, প্রবীণ ও নামি বাচিক শিল্পীদের কণ্ঠেও 'অন্য' 'পক্ষ' 'দক্ষ' 'দক্ষতা' 'বক্তব্য' 'পথ্য' প্রভৃতি বহু শব্দের ভুল উচ্চারণ হামেশাই শোনা যায় কেন?

বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীদের মুখে যেমন প্রায়ই শুনি 'সৌজন্যতা' 'মৌনতা' তেমনই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদেরও একাধিক বার লিখতে দেখেছি 'উৎকর্ষতা' 'কৃচ্ছ্রতা' 'সখ্যতা' প্রভৃতি ভুল শব্দ। আর বিভিন্ন টেলিভিশনের পর্দায় যে অজস্র ভুল বানান ফুটে ওঠে তার সাক্ষী সকলেই। সেখানে ন ও ণ এবং ই-কার ঈ-কারের কোনো মাথামুন্ডু নেই। এমন-কি রেফের সঙ্গে দ্বিত্বও নির্বিকারে চালানো হচ্ছে। একই কথা বলা যায় বিজ্ঞাপনের বানান সম্বন্ধেও। বাংলা সাইবোর্ডগুলি তো বানান-বিশৃঙ্খলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ভাষা ও বানানের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাদের সচেতন ও সাহায্য করবার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাওয়া সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার খুব-একটা উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করা যাবে কি? সে-কারণে পুনরায় আলোচনার সূত্রপাতও জরুরি বলে আমার মনে হয়।

তা ছাড়া, জীবিত ভাষায় কিছু-কিছু পরিবর্তন নিয়তই ঘটতে থাকে। অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে চলে। আর সেসবের ভিত্তিতে নতুন করে ভাবতে হয়। স্বাগত জানাতে হয় যুক্তিসংগত পরিবর্তনকে। অনেক নতুন নতুন শব্দ ও উচ্চারণভঙ্গি এসে দ্বারে কড়া নাড়ে, ফাঁক গলে প্রবেশও করে। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু তৎসম শব্দের অর্থান্তর তো ঘটে গেছে নিয়মিত ব্যবহারের ফলেই আর অধিকাংশ তৎসম শব্দের সংস্কৃত-উচ্চারণ বাংলায় নেই বললেই চলে। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়াস প্রশংসনীয় হলেও অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা তার স্বাভাবিক স্রোতের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমার তাই মনে হয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবন করে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ বছর পর পর বিষয় দুটি নিয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনার পর যুক্তিসম্মত পরিবর্তনকে মান্যতা দেওয়া দরকার, ভাষার গতিশীলতার খাতিরেই।

আমার এই আলোচনায় বানান ও উচ্চারণের জন্য পৃথক বিভাজন রাখছি না। দুটো বিষয়ই প্রসঙ্গ অনুযায়ী পাশাপাশি চলবে। আর বানান ও উচ্চারণের নিয়মগুলি আলোচনার সূত্রে চলবে বিকল্প বর্জনের চেষ্টা। যেখানে একাধিক বানান বা উচ্চারণ প্রচলিত এবং সেগুলোর কোনোটাকেই অশুদ্ধ হিসেবে শনাক্ত করা অনুচিত সেখানে কোন্‌টা কী কারণে

অভিপ্রেত তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

এখানে আরেকটা বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়ে রাখতে চাই। মান্য বানান ও মান্য উচ্চারণই আমার আলোচ্য। যা সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও সর্বসম্মত। সাহিত্যে নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখে কথ্য, আঞ্চলিক ও বিকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয়ে থাকে। সেগুলো আমার আলোচনার বহির্ভূত। একই কাণ্ড ঘটে নাটকেও। কোন্ চরিত্রের সংলাপ কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে উচ্চারিত হবে, কোথায় বেশি ঝোঁক দিতে হবে, কোন্ শব্দকে একটু টেনে বা বিকৃতভাবে প্রকাশ করতে হবে সেগুলো নাট্যপরিচালকের বিবেচ্য বিষয়। একজন বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক, যিনি বাংলা উচ্চারণে স্পষ্টতা ও সূক্ষ্মতার অজস্র উদাহরণ রেখে গেছেন, একটি বিখ্যাত নাটকে এক অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর চরিত্রাভিনেত্রীকে দিয়ে 'সুন্দর' শব্দটিকে প্রায় 'সোন্‌দ-র্' উচ্চারণ করিয়েছিলেন, যা ছিল ইচ্ছাকৃত এবং অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। এটা ব্যতিক্রম। অনেক নাটকেই শিল্পের স্বার্থে এ-জাতীয় উচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কিন্তু সকলেই সর্বত্র এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শব্দের মান্য উচ্চারণ পালটে দেবেন সেটা নিশ্চয় কাম্য নয়। অজ্ঞতাপ্রসূত অশুদ্ধ উচ্চারণই আমার আলোচ্য।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রসংগীতে বহু ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ প্রচলিত এবং সেটা রবীন্দ্রসংগীতের গায়কির একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আবৃত্তি, সংবাদপাঠ বা ভাষ্যপাঠের ক্ষেত্রে, এমন-কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তিতে ওইরকম উচ্চারণ করা হয় কি? ফলে এই ব্যতিক্রমকেও আমি বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করছি না। যেমন বাদ রাখছি লোকসংগীতে ব্যবহৃত কিছু শব্দের পৃথক উচ্চারণ-পদ্ধতি।

আরো দু-তিনটে কৈফিয়ত দিয়ে রাখতে চাই। এই বইয়ের পুরোটা আমি নিজে কম্পোজ করেছি। সুতরাং লেখায় ছাপার ভুল কিংবা বানান ভুল থাকলে সে-ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। তবে যে-সব বানানের একাধিক রূপ প্রচলিত সেখানে আমার লেখা বানান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নির্দিষ্ট একটি রূপ গ্রহণ করার পিছনে আমার যুক্তি পেশ করব।

যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক লিপি সংস্কারের পরে যে-স্বচ্ছতা এসেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আর সাহিত্য সংসদের প্রকাশনায় ব্যবহৃত, এখানে তার প্রয়োগ করা যাচ্ছে না আমার কাছে যে-টাইপ-ফেস রয়েছে তা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের উপায় সুদূরপরাহত। কারণ যে-সব সংস্থা কম্পিউটারের বাংলা টাইপ-ফেস তৈরি করে তাদের অধিকাংশই এমন ব্যবস্থা রেখেছে যে কম্পোজ করার সময় যুক্তবর্ণের পুরনো রূপটাই ফুটে ওঠে। কিছুটা বেশি সময় নিয়ে আলাদাভাবে চেষ্টা করলে গু রু রূ শু হৃ গ্রু গ্রূ ধ্রু ধ্রূ প্রু প্রূ শ্রু শ্রূ প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণের স্বচ্ছ রূপ গু রু রূ শু হৃ গ্রু গ্রূ ধ্রু ধ্রূ প্রু প্রূ শ্রু শ্রূ যদিও-বা আনা যায় (যেমন এখানে করা গেল), যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সেরকম করা সম্ভব নয়। অথচ এই স্বচ্ছ রূপগুলো নতুন শিক্ষার্থীদের পক্ষেও সহজে বোঝা সম্ভব। যাঁরা নতুন রূপের বিরোধিতা করেছেন ও করছেন তাঁদের অদূর

অতীতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ জানাই। গত শতকের চল্লিশের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার ওই সংস্থার প্রতিটি পত্রিকায় বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন করেছিলেন রাজশেখর বসুর সহায়তায়। দু-তিনটি যুক্তব্যঞ্জন ব্যতীত সেই টাইপ সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত নতুন রূপের অনেকটাই কাছাকাছি। আমার সংগ্রহে বাবার কেনা এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত রাজশেখর বসুর মহাভারতের সারানুবাদ গ্রন্থটিতেও লাইনো টাইপই রয়েছে এবং আরো অসংখ্য বই তখন ওইভাবে ছাপা হতো। অথচ সে-সময়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া, সেই ১৯৩৩ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রুফরিডার অজরচন্দ্র সরকার 'প্রবাসী'-তে তিন কিস্তিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বাংলা টাইপ-কেসের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে বেশকিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন, গু রু রূ শু সহ যার অনেকগুলিই সমর্থন করেছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (ফাল্গুন ১৩৩৯)। যা-ই হোক, লিপি-সংস্কার আমার আলোচ্য বিষয় না-হওয়ায় এ-প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানছি।

তবে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। কোনো-কোনো বর্ণের বিকৃত তথা ব্যতিক্রমী উচ্চারণ নির্দেশের জন্য প্রচলিত প্রথার বাইরে কিছু করা যায় কি না তা নিয়ে একটা ভাবনা আমার ভিতরে-ভিতরে কাজ করছিল। আদ্য এ-কারের উচ্চারণ-পার্থক্য বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত দু-রকম এ-কার অর্থাৎ মাত্রাহীন এ-কার (ে) এবং মাত্রযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহারের কথা একসময়ে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, সেটা আংশিক সমাধান মাত্র, এভাবে অনেক প্রয়োজন মেটে না। প্রথমত, দুটো এ-কারের পার্থক্য ''এত সূক্ষ্ম যে এই পার্থক্য সকলের নজরে আসে না।'' দ্বিতীয়ত, শুধু ''আদ্যক্ষরেই ে-চিহ্ন দ্বারা বিকৃত এ'-র ধ্বনি বোঝানো যায়, মধ্য বা শেষ অক্ষরে তা সম্ভব নয়।'' উদ্ধৃতি দুটি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত (উক্ত লেখকের 'বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থের দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৬৫ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ শুধু দুটো এ-কার ব্যবহার করেই যে সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না সে-ব্যাপারে আচার্য মণীন্দ্রকুমার বহু পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কারণ শব্দের মধ্যবর্তী এ-কারের উচ্চারণ এ বা অ্যা যা-ই হোক, মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহার না-করলে দুটো বর্ণের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। তা ছাড়া, শব্দের আদিতে যেখানে এ-কার নেই অথচ অ্যা উচ্চারিত হচ্ছে সেখানে কী করা হবে?

সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজশেখর বসুকে অনুরোধও করেছিলেন মণীন্দ্রকুমার, চেয়েছিলেন আদি অ্যা উচ্চারণের জন্য একটি পৃথক বর্ণ ও তার যোজ্য রূপ। 'চতুষ্কোণ'-এ বৈশাখ ১৩৮৪ সংখ্যায় তাঁর 'রাজশেখর বসুর চিঠি' শীর্ষক রচনা থেকে আমরা জানতে পারছি, ''চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ যখন যন্ত্রস্থ, অভিধানকার রাজশেখর বসু মহাশয়কে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম। রাজশেখর বসু অনুগ্রহ করে সঙ্গে-সঙ্গেই তার জবাব

দিয়েছিলেন।” ওই চিঠিতে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে উক্ত অনুরোধও অন্তর্ভুক্ত ছিল, রাজশেখর যে-জবাব দিয়েছিলেন তা-ও ‘চতুষ্কোণ’-এ প্রকাশিত লেখাটিতে ছাপা হয়। দুটি চিঠিই মণীন্দ্রকুমারের প্রাগুক্ত গ্রন্থের সব ক-টি সংস্করণেই পুনর্মুদ্রিত (ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৬ ও ১০০ দ্রষ্টব্য)। ১৯৩৩ সালের ৫ জুলাই তারিখে লেখা জবাবি পত্রে রাজশেখর লেখেন, “Catএর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত।” প্রস্তাবিত রূপ দুটি হাতে লিখে দেখিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, “রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় লাগিবে। আমার মতে তত দিন ‘অ্যা ্যা’ চিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে।”

বলা বাহুল্য, রাজশেখর উদ্ভাবিত দুটি রূপের একটিও চলেনি। কেন চলেনি তার কারণ সহজবোধ্য। তার একটি ইংরেজি a-র অনুরূপ আর অন্যটি প্রচলিত এ-কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ— শুধু নীচের দিককার প্যাঁচটা একটু বড়, যা অনেকেই হাতের লেখায় ব্যবহার করেন। অর্থাৎ রাজশেখরের প্রস্তাবিত চিহ্ন ব্যবহার করলে act শব্দের বাংলা রূপ দাঁড়াবে aক্ট্ আর hat লেখা হবে হ-এর আগে এ-কারের সামান্য পরিবর্তিত রূপ বসিয়ে, অর্থাৎ ‘হেট’। একইরকম ভাবে bat হয়ে যাবে ‘বেট’, pat হয়ে যাবে ‘পেট’। অনুরূপভাবে, attorney admission প্রভৃতি শব্দ বাংলা লিপ্যন্তরে লেখা হবে aটর্নি aডমিশন। যা-ই হোক যে-প্রস্তাব কার্যকর হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও ধারণা করা যায় না তা নিয়ে বৃথা বাগ্‌বিস্তার অর্থহীন। সে-কারণে শব্দের মধ্যবর্তী এ-কারের অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য শঙ্খ ঘোষকে জিগ্যেস করি, উক্ত এ-কারের পেট কেটে (ে) লিখলে কেমন হয়? শঙ্খদা আমার প্রস্তাব সমর্থন করে জানান, তাঁর পিতা মণীন্দ্রকুমারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তখন আমার মনে হয়, শব্দের শুরুর এ-কারের অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্যও একইভাবে মাত্রাহীন এ-কারের পেট কাটলে (ে) রবীন্দ্রনাথের দু-রকম এ-কার ব্যবহারের ফলে ‘সূক্ষ্ম’ পার্থক্যজনিত যে-বিভ্রান্তি দেখা দেয় সেটাও দূর করা যেতে পারে। এইভাবে সমুদ্রের তট অর্থে বেলা বা বেলাভূমি শব্দের এ-কারের উচ্চারণ ‘এ’ হওয়ায় তা অবিকৃত রাখা যেতে পারে এবং সময়, সুযোগ, কাল আর আটা বা ময়দার রুটি বানানোর পদ্ধতি অর্থে বেলা শব্দের আদ্য অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ‘বেলা’-র পরিবর্তে লেখা হবে ‘বেলা’ এবং ছেলেখেলা উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হবে ‘ছেলেখেলা’।

শব্দের এ-কারবিহীন প্রথম বর্ণের অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য বহুদিন ধরে বহুপ্রচলিত অ্যা ও তার যোজ্য রূপেই কাজ চলবে, তা নিয়ে আপাতত চিন্তা করবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবে শুধু এ-কার নয়, বাংলা এ স্বরবর্ণটিরও এ ও অ্যা উভয় উচ্চারণ রয়েছে এবং এই বর্ণ প্রচুর শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক (অ্যাক্) একটা (অ্যাক্‌টা) কিন্তু একটি একটু, এমন (অ্যামোন্) এমনই (অ্যামোনি) কিন্তু এমনি। ভেবে দেখলাম, এরকম ক্ষেত্রেও আদি অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য প্রচলিত বানানে এ-র পেট

কেটে (এ) সমস্যার সমাধান করা যায়। যথা, এক, একাকার, এখন, এত, এমন, এমনই, এলানো, এড়ানো ইত্যাদি।

সমস্যা রয়েছে হ্রস্ব-ও-র উচ্চারণ দেখানোর ব্যাপারেও। ও-কার ব্যবহারের প্রচলিত পদ্ধতি আমার মনঃপূত নয়। তাতে বন আর বোন শব্দ দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ করেছি, সুভাষ ভট্টাচার্য তাঁর উচ্চারণ অভিধানের প্রথম সংস্করণে IPA ব্যবহারকালে দ্বিতীয়টি শব্দটিতে (অর্থাৎ বোন-এ) o রেখেছেন আর বন-এর হ্রস্ব-ও বোঝাতে o-এর উপরে উলটো রেফ চিহ্ন (`) চিহ্ন (অর্থাৎ ò) বসিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য এই চিহ্ন তিনি তুলে দিয়েছেন, ফলে বন ও বোন উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে আমার আপত্তি তাঁর গোচরে এনেছি এবং তিনি জানালেন যে আরো অনেকে ওই চিহ্নটির বিলোপ অনুমোদন করেননি। কিন্তু পরে আরো চিন্তাভাবনা করে ওই চিহ্ন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত আমিও পরিবর্তন করেছি। কারণ ওই চিহ্নটা কম্পিউটারে বাংলা ফন্টে নেই, ইংরেজি ফন্ট থেকে আনতে হয়। সেটা ঝামেলার ব্যাপার। আমি তাই হ্রস্ব-ও উচ্চারণের জন্য ইতিপূর্বে বহুল ব্যবহৃত ঊর্ধ্বকমা (’) সংশ্লিষ্ট বর্ণের সঙ্গে ব্যবহার করতে চাইছি। এই চিহ্নটি সুপরিচিত এবং এখনও অনেক সময় (বিশেষ করে কবিতায়) বেশ কিছু শব্দে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ— করে/ক’রে (কোরে), চড়ে/চ’ড়ে (চোড়ে), চলে/চ’লে (চোলে), ধরে/ধ’রে (ধোরে), বলে/ব’লে (বোলে), ভরে/ভ’রে (ভোরে), মরে/ম’রে (মোরে) প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, অতি, অরুণ, অপরাধ, আবহ, দনু, বন, প্রকার, ভ্রম প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অ’তি, অ’রুণ, অপ’রাধ, আবহ’, দ’নু, ব’ন, প্র’কার, ভ্র’ম প্রভৃতি ব্যবহার করছি। এই চিহ্নগুলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এ-কথাও মনে রেখেছি যে এগুলি যেন সব লেটার প্রেসে এবং কম্পিউটারেই পাওয়া যায় আর সকলেই সহজে প্রয়োগ করতে পারেন। অবশ্য এই লেখার সর্বত্র আমি চিহ্নগুলো ব্যবহার করছি না, করলে বহু শব্দেরই পরিচিত চেহারা পালটে যাবে এবং অনেকেই অনুমোদন না-ও করতে পারেন কিংবা আপত্তি জানাতে পারেন। সে-কারণে শুধু অভিপ্রেত উচ্চারণ নির্দেশের জন্যই এগুলো এই বইয়ে ব্যবহৃত হবে। ও-কারবিহীন স্বরান্ত উচ্চারণ যেসব ক্ষেত্রে অ সেখানে আলাদা কোনো চিহ্নের দরকার বোধ করছি না।

বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে কবিতার সঙ্গে উচ্চারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন, সেই ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই, যার সৃষ্টি মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। বেদের সূক্ত বা মন্ত্রগুলিকে কবিতাও বলা যায়। ছন্দোবদ্ধ ওইসব রচনার শুদ্ধ উচ্চারণের ওপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হতো। আর তার ফলেই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সেগুলি অবিকৃতভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। তার পর বৈদিক ভাষার সংস্কার করে পাণিনির (আনুমানিক ৩৫০ খ্রি. পূ.) অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ অনুসারী সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলো দুই মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারত। ওই দুই কাব্যের আখ্যান শ্রোতাদের কাছে পরিবেশনের সময়ও শুদ্ধ উচ্চারণের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত মানুষের লেখ্য ভাষা, সেকালে সাধারণ মানুষ তো আর সে-ভাষায় কথা বলতেন না। প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল প্রাকৃত এবং অঞ্চলভেদে তার আলাদা আলাদা রূপ ছিল। বাংলা ভাষার আদি রূপ-যে মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ সে-বিষয়ে প্রথমে আমাদের জানান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ১৯০৭ সালে তৃতীয় বার নেপাল সফরকালে তালপাতায় লেখা চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং পাঠোদ্ধারের পরে অর্থ ও ব্যাখ্যা সংবলিত তাঁর গ্রন্থটি ('হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা') ১৯১৬ সালে প্রকাশের আগে পর্যন্ত এরকম একটা ভ্রান্ত মতই প্রচলিত ছিল যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা।

এসব বৃত্তান্ত সকলেই জানেন, আমি এর উল্লেখ করছি দুটি কারণে। প্রথমত, চর্যাগুলিও একধরনের কবিতা আর তা গাওয়া হতো, অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপেও উচ্চারণের একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার জন্ম সম্পর্কিত সেকালে প্রচলিত বিশ্বাস যা-ই হোক, চর্যাপদ আবিষ্কারের আগেও কেউ কেউ আমাদের ভাষার পার্থক্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৮৭৭ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত বাংলা ভাষা সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এই ভাষার স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার এবং বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বেশ কয়েকটি বিধি মানার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিছুটা 'বাড়াবাড়ি' সত্ত্বেও তাঁর প্রবন্ধটি 'উৎকৃষ্ট' বলে মন্তব্য করেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, ইং ১৮৭৮) এবং বলেন, "তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।" অধিকন্তু উক্ত প্রবন্ধের প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্র এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে "প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, ... এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।"

আমাদের আলোচনা যেহেতু মান্য চলিত বাংলার (মা.চ.বা.) বানান ও উচ্চারণ

নিয়ে এবং এই ভাষায় অতৎসম শব্দের সংখ্যাই বেশি, সেহেতু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ আর বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিশিষ্টজনদের কিছু কিছু মত এই রচনায় উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা কোনো কোনো মহলে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে যে তিনি সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলাই পছন্দ করতেন, অন্তত তাঁর বহু রচনা সেই ইঙ্গিতই দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তখন বাংলা রচনায় তৎসম শব্দের বাহুল্য ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, 'সাধুভাষা'-র পরিবর্তে 'অপর ভাষা' অর্থাৎ যে-ভাষায় আমরা কথা বলি সেটাই সাহিত্যরচনায় প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' শীর্ষক রচনা দুটির বহু অংশে। তা ছাড়া, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ না-হলেও 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর তিনি প্রশংসা করেছেন এবং একইসঙ্গে অতিরিক্ত সংস্কৃত-নির্ভর বাংলা ভাষার নিন্দা করেছেন।

খানিকটা উদ্ধৃতি দিলেই সাহিত্যসম্রাটের ঝোঁক কোন্ দিকে তা বোঝা যাবে। ''বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

''এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।... তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় ''আলালের ঘরে দুলাল'' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'' (বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯)

তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ নির্বাসনের পক্ষপাতী ছিলেন তা-ও নয়। বরং এ-বিষয়ে তাঁর যুক্তিসংগত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য এবং এ-কালেও প্রাসঙ্গিক : ''আমরা এমন কথা বলি না যে, ''ঘর'' প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে ; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।... বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। ''হে ভ্রাতঃ'' বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা

করিতেছে ; ‘‘ভাই রে” বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। ‘‘ভ্রাতৃভাব” এবং ‘‘ভাইভাব”, ‘‘ভ্রাতৃত্ব” এবং ‘‘ভাইগিরি” এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।” (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৭২)

তৎকালীন কবিতায় শব্দব্যবহার সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ সঠিক। উল্লিখিত প্রবন্ধের এক স্থানে পাদটীকায় তিনি লিখেছেন : ‘‘আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত— এখনও হইতেছে। বোধ হয় আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে : চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।” (পৃ. ৩৬৯) এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কাব্যপ্রণেতারা ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক কবি। তবে মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় অতৎসম শব্দ ব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। (ওই প্রবন্ধে নাটকের ভাষার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো মন্তব্য করেননি, সে-কারণে মধুসূদনের নাটক, বিশেষ করে ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ এবং দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’-এ ব্যবহৃত কথ্য ভাষা ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলছি না।) অবশ্য ‘‘পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকরী।”— বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা অনেকেই সহমত পোষণ করি না। গদ্য মানুষের বুদ্ধির স্তরে ঘা দেয়, তাকে শানিতও করে, কিন্তু কবিতা-যে আমাদের বোধের গভীরে গিয়ে মর্ম্মমূলে নাড়া দেয়, কারো-কারো জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে-কথাও কি অস্বীকারের উপায় আছে? কবিতার মূল্য অনেক সময়েই হাতে-হাতে চুকিয়ে দেওয়া যায় না, আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে সেটা ক্রিয়া করতে থাকে, আনন্দ বা বেদনাঘন মুহূর্তে ঝলসে ওঠে তার বিশিষ্ট কিছু পঙ্‌ক্তির অপার মহিমা।

কবিতার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, সংস্কৃতবাদী বনাম বাংলার স্বাভাবিক রীতির পক্ষপাতী দুই তরফের মতামত নিয়ে আরো খানিকটা আলোচনার আগে সে-কালের কবিদের প্রবণতার বিষয়ে দু-এক কথা বলে নেওয়া যাক। মধু-হেম-নবীনচন্দ্র সেনের বাইরে বিহারীলালের কবিতার ধরন ছিল কিছুটা ভিন্ন এবং প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথও-যে সেই ধারার অনুসারী ছিলেন সে-বৃত্তান্ত সকলেরই জানা আছে। তার পর রবীন্দ্রনাথকে নিজের পথ নিজেই সৃষ্টি করতে হয়েছে, নানারকম বাঁক পেরিয়ে তিনি কবিতায় নিয়ে এসেছেন অতুলনীয় বৈচিত্র্য। তা সত্ত্বেও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন কবির শব্দব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের নিহিতার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর

বুদ্ধদেব বসুর কিছু কবিতায় তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক লক্ষণীয়। সেদিক থেকে সুকুমার রায়, জসীমউদ্‌দীন ও যতীন্দ্রনাথ বাগচী ব্যতিক্রমীদের তালিকায় পড়েন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও অনেকটা তা-ই। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই-বা নন কেন? আর দিনেশ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আটপৌরে ভাষা ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন না। নজরুলের কবিতায় বাড়ল আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ। অন্যদিকে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের মিশ্রণ সত্ত্বেও নিজের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করে জীবনানন্দ হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। অন্নদাশঙ্কর তাঁর ছড়ায় কথ্যভাষার আদলে নিয়ে এলেন সহজ ভঙ্গি। ইতিমধ্যে তব মম সনে প্রভৃতির মতো যে-সব শব্দ আগেকার দিনে শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হতো সেগুলো আধুনিক কবিরা বর্জন করলেন, ক্রমশ সাধু ক্রিয়াপদও কবিতায় বিলুপ্ত হলো। নীরেন্দ্রনাথ ও শঙ্খ ঘোষ ভিন্ন প্রকৃতির কবি হয়েও আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সব ধরনের শব্দকেই ঠাঁই দেওয়া যায়, কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাই আসল কথা। এ-যুগের অধিকাংশ কবির রচনায় আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বোধ হয় কিছুটা বেশি। এসবই আমার সামান্য পর্যবেক্ষণ, কোনো ধ্রুব সিদ্ধান্ত নয়। ভিন্নমত থাকলে যে-কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেন।

এই সূত্রে একটা ঘটনা বলি। সবুজসভার সদস্য হারীতকৃষ্ণ দেবের মুখে শোনা। একবার সবুজসভায় জনৈক সদস্য প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'অবলীলাক্রমে' শব্দটি কি চলিত বাংলায় চলবে? প্রমথ চৌধুরী কোনো জবাব না-দিয়ে অন্যরকম আলোচনা চালিয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি জানালেন যে ইতিমধ্যে নিজের কথার মধ্যে শব্দটি তিন বার ব্যবহার করেছেন, অথচ কারো কানে অস্বাভাবিক ঠেকেছে বলে অভিযোগ ওঠেনি। অর্থাৎ চলিত বাংলায়ও শব্দটি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করা যায়, তবে যে-কোনো শব্দই সুপ্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যা-ই হোক, পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই কেউ-কেউ বাংলা ভাষার পৃথক রূপ নিয়ে আলোচনায় রত হয়েছেন। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা এর আগে বলেছি। আরেকজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন সেখানে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন শ্যামাচরণ। হরপ্রসাদ ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং অনেকটাই গুরুর মতাবলম্বী। একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অসংকোচে নিজেকে 'শ্যামাচরণের চেলা' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১১ শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (ইং ২৭ জুলাই ১৯০১) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে (সে-বছরের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে) তিনি 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (তথ্যসূত্র : প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৭) প্রবন্ধটি পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির বিরূপ সমালোচনা করে সেগুলোর কিছু সংস্কৃতঘেঁষা, কিছু ইংরেজি ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত এবং কিছু

সংস্কৃত ও ইংরেজির জগাখিচুড়ি বলে মন্তব্য করেন। তাঁর আক্ষেপ, কেউই বাংলা ভাষার নিজস্ব গতিপ্রকৃতির দিকে নজর দেননি। প্রবন্ধপাঠের পর সেদিনের আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতানুসারীদের মুখপাত্র ছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সহ অনেকেই হরপ্রসাদের বক্তব্য সমর্থন করলেও সংস্কৃতের পক্ষাবলম্বীদের কিছু-কিছু মত অগ্রাহ্য করা যায়নি। ফলে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ : ''আজকের প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে কোনও ভাষার গতি পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায় ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না, গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্ধারণ ব্যাকরণের কর্তব্য।''

হরপ্রসাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে।'' স্মর্তব্য যে, ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (পৌষ ১৩০৫, ইং ১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং বিম্‌সের গ্রন্থের সমালোচনায় এমন কথাও বলেছিলেন, ''...সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসংগত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।'' সেইসঙ্গে তিনি লেখেন : ''কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।'' তাঁর আরো মন্তব্য : ''এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসংকুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।'' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', বিশ্বভারতী প্রকাশিত তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯১, পৃ. ৫২-৫৩)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উল্লিখিত অধিবেশনের কয়েক মাস পরেও, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : ''বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ

যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। ... তাহার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ কটা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১১)

এরও পনেরো বছর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (ইং ১৯১৭) 'ভাষার কথা'-য় রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানাচ্ছেন : "... বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩) নোবেল পুরস্কার পাওয়ার চার বছর পরে তাঁর সাতান্নতম জন্মদিনের প্রাক্কালে লেখা এই প্রবন্ধ, অর্থাৎ কবি তখন রীতিমতো পরিণতবয়স্ক। তখনো তিনি আগেকার মতই আঁকড়ে রয়েছেন।

তারও অনেক পরে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১২ জুন ১৯৩৭) দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে— "মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা আমার দেখা আছে। বানান সমিতির কাজ সহজ হত তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।" (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির তৃতীয় সংস্করণ (২০ মে ১৯৩৭) প্রকাশেরও প্রায় এক মাস পরে। মজার কথা হলো, তার পরেও ভূতের বোঝা বওয়া চলেছে প্রায় অর্ধশতক জুড়ে, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এখনও চলছে। তার প্রধান কারণ দুটি। এক. হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মত অনুযায়ী অতৎসম

শব্দে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না সংস্কার সমিতির সদস্যরা, ফলে স্বীকৃতি পেল প্রচুর বিকল্প বানান। দুই. ইতিমধ্যে সংস্কৃতবাদীদের আক্রমণাত্মক বিরূপ সমালোচনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উক্ত বিধি মানা বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী 'আইনের জোর' শেষ পর্যন্ত কার্যকর হলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব।

বেশ বোঝা গেছে, হরপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের যথেষ্ট মিল ছিল। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছেন সুনীতিকুমারও। পরে শাস্ত্রীমশায়ের বক্তব্য বিষয়ে আরো খানিকটা আলোচনার ইচ্ছে রইল। তার আগে অন্য একটা কথা সেরে নিই। ভাষার প্রশ্নে সুনীতিকুমারের মতামতের ওপর রবীন্দ্রনাথের আস্থার বিষয়ে সকলেই অবহিত, বহু বার বহু সমস্যার নিরসনের জন্য ভাষাচার্যের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কবি। এ-ব্যাপারে তাঁর লিখিত স্বীকৃতিও রয়েছে। দেবপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথের লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি : "...প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিত পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এত দিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও জোর। সেইজন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না।" ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', পৃ. ২৭৯-৮০)

বাংলা ভাষার উৎস, বিকাশ, স্বাভাবিক প্রকৃতি, লিপ্যন্তর, বানান প্রভৃতি নিয়ে সুনীতিকুমার সময়ে-সময়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। তাঁর বিশেষ কয়েকটি রচনার নাম এই সূত্রে উল্লেখ করতে চাই : ইংরেজিতে 'The Origin and Development of the Bengali Language' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এবং 'বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' বইটি ছাড়াও বাংলায় 'বাঙলা ভাষার কুলজী' ('সবুজ পত্র', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, এটি ১৯৭১ সালের শারদীয় অমৃত পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত), 'বাঙলাভাষা আর বাঙালীজাতের গোড়ার কথা' ('সবুজ পত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ), 'বাঙলা ভাষার শব্দ' (মূল বেতার ভাষণটি 'অর্চনা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে সংযোজন সহ মুদ্রিত), 'বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দ' (বেতার ভাষণ, 'রূপ ও রীতি' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত), 'বাঙলা উচ্চারণ' (বেতার ভাষণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'বেতার জগৎ' পত্রিকার বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৯-এ মুদ্রিত), 'বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা' ('শিক্ষক', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালা বানান-সমস্যা' ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ' ('দেশ', ২১ মাঘ ১৩৭৩

বঙ্গাব্দ), 'আধুনিক বাঙ্গলা বানান প্রসঙ্গে' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশিতম প্রতিষ্ঠাদিবসে ১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রদত্ত ভাষণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত এবং নেপাল মজুমদার সংকলিত ও সম্পাদিত 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থে মুদ্রিত) প্রভৃতি।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর তৎকালীন কর্মস্থল চন্দ্রহার (বরিশাল) থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র (ইং ১৯৩১)। চিঠিটির সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র কয়েক বছর আগে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ মণীন্দ্রকুমারের 'বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থের সাম্প্রতিকতম সংস্করণে (বিশে শ্রাবণ ১৪২০) সংযোজিত। ওই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ : ''বাংলা ব্যাকরণে আপনার দান অসামান্য। আপনি নিজে হয়তো তা' স্বীকার করেন না। যদিও এখন পর্য্যন্ত একখানাও খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি ব্যাকরণ-সম্বন্ধে যা'-কিছু সামান্য চর্চা আজকাল হইতেছে তাহার মূল উৎস ভাষার প্রকৃতি- ও গতি-সম্পর্কে এখানে সেখানে আপনার নানা ইঙ্গিত। আপনি নিজে যদি ব্যাকরণ আলোচনার জন্য আর একটু অধিক সময় দিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাষার বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকটা দূরীভূত হইত। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য হইলেও বাংলা ভাষার এটা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য যে ব্যাকরণ চিন্তা করিবার যথেষ্ট অবসর আপনার নাই। তা সত্ত্বেও দু'একটা বিষয়ে আপনাকে কিছু অনুযোগ না করিয়া পারি না। আশা করি, আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া পুত্রজ্ঞানে আমায় ক্ষমা করিবেন।'' (পৃ. ১৭২)

আচার্য মণীন্দ্রকুমার সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্য কোনো-কোনো সংস্কৃতজ্ঞের মতো রবীন্দ্রনাথের বিরোধী তো ননই, বরং কবির গুণগ্রাহী ছিলেন— এ-বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এবং এই চিঠিতে নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে মণীন্দ্রকুমার শালীনতা, সংযম ও বিনয়ের যে-পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। যা-হোক, আসল কথা, মণীন্দ্রকুমারের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির জবাব কবি নিজে না-দিয়ে চিঠিটির একপাশে লেখেন : ''এই চিঠির উত্তরের ভার সুনীতির উপর দিলেই ভালো হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ''

এরপর রবীন্দ্রনাথের সচিব অমিয় চক্রবর্তী উক্ত চিঠিটি সঙ্গে গেঁথে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে সুনীতিকুমারকে লেখেন : ''এই চিঠি গুরুদেব আপনাকে পাঠাতে বল্‌লেন। এর উপর Comment করে যদি আপনি কিছু লেখেন এবং ''প্রবাসী''তে দুই লেখাই পাঠিয়ে দেন তাহলে বাংলার জনসাধারণ উপকৃত হবেন। আপনার Comment-সহ চিঠিখানা এখানে ফেরৎ পাঠালে কবিও তাঁর বক্তব্য যোগ ক'রে দিতে পারেন।''

আশ্চর্যের বিষয়, প্রশ্নগুলির জবাবে ভাষাচার্য প্রবাসীতে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথকেও কিছু লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে কবি নিজে চার দিন পরে (১৯ ভাদ্র ১৩৩৮) মণীন্দ্রকুমারকে লেখা একটি চিঠিতে সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত পেশ করেছিলেন : ''চলতি বাংলা বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।

''যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক— আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।

''প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্তু ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাওয়াটা এলোমেলো ভাবেই বইবে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ সুনীতির নেওয়া উচিত— আমার বয়স হয়ে গেছে।

''প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে— সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত। সেই কারণেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই।'' (মণীন্দ্রকুমারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮)

সুনীতিকুমারের প্রতি বাংলা ভাষা চর্চাকারীমাত্রেরই ঋণ অপরিশোধ্য, নিয়ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেও আমরা কুণ্ঠিত নই। কিন্তু একটা ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের মাত্র দু-বছর আগে (১৯৩৯ সালে) প্রকাশিত 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের পরিবর্তে প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণই প্রধানত অনুসরণ করলেন ভাষাচার্য। অথচ তিনি নিজেই বাংলা ভাষার পৃথক ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা একাধিক বার স্বীকার করেছেন। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য—

''বাঙ্গালা ভাষার 'ব্যাকরণ', অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কী ছিল, তাহা প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়।... ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটি-ই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত 'সাধু' বা 'শুদ্ধ' রূপ উহার প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে ; ... বৈদিক যুগের চলিত কথাবার্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্য পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাঁহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অনুশীলন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonology-র সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।'' (''কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব'' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের পৃ. ১৬৩-৬৪)

উক্ত প্রবন্ধে বেশকিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেছেন : ''বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্য্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমেলে বিষয় সব-ই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন,

তাহা অতি অপূর্ব, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উহার বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,— ভাষার দখলের নয়, ভাষার ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য— ইউরোপে ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ- ও ধাতু-রূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা করা হয়, Phonology বা সেই ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কারণে তাহার ব্যাকরণের পরিবর্তন লইয়া তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়া-ই বেশি মাথা ঘামানো হইয়াছে; ৪০০ পাতার একখানি বইয়ে হয়তো ২৫০ পাতা Phonology লইয়া, বাকিটুকু Morphology ও Syntax লইয়া। কারণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিন্যাসের সমস্ত গুপ্ত রহস্য তাহার উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৫)

প্রথমে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় (৩য় সংখ্যা ১৩২৩, ইং ১৯১৬) প্রকাশিত ওই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার আরো বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, এখানে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে কোনো লাভ নেই। কিন্তু সমাধানের উদ্যোগ তো তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তির কাছেই প্রত্যাশিত ছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের সে-প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এমন-কি উল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের তেইশ বছর পরেও সংস্কৃতানুসারী প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণই উপহার দিলেন ভাষাচার্য। আর সেই ব্যাকরণই শেখানো চলল স্কুল-কলেজে। এখনও প্রধানত সেটাই চলছে। অবশ্য ওই ব্যাকরণ শিক্ষার উপকারিতাও ছিল, অন্তত তৎসম শব্দের বানানের নিয়মগুলো শেখা যেত। ইদানীং সে-পাটও চুকে গেছে। আজকাল ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং (এনসিইআরটি)-এর নির্দেশে রাজ্যস্তরে স্টেট কাউনসিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং (এসসিইআরটি) যে-পাঠ্যসূচি চালু করেছে সেখানে আলাদা ব্যাকরণ বইয়ের পরিবর্তে স্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে মূল রচনাগুলির সঙ্গে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে 'টেক্সচুয়াল গ্রামার'। ওইরকম বিক্ষিপ্ত উদাহরণ পেশ করে কতটা ব্যাকরণ শেখানো যাচ্ছে তা খোদায় মালুম। অতীতে অসমের বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির জন্য রচিত সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে কিছু উদ্ভট কাণ্ডও ঘটছে। আপাতত সেসবের উল্লেখ করছি না। শুধু এইটুকু জানাই, একসময়ে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের লেখা ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক আমাকে পুনরীক্ষণের জন্য দেওয়া হলে অবাক হয়ে লক্ষ করি, 'কোকিল' শব্দটি সর্বত্র 'কুকিল' হিসেবে শোভা পাচ্ছে। এরকম আরো কিছু দৃষ্টান্ত ছিল, বহু বছর আগেকার কথা, এখন আর সব মনে নেই। এটা অবশ্য শিক্ষকের আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রতি বশবর্তিতার নিদর্শন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এরকম শিক্ষকের কাছ থেকে কি বানান বা উচ্চারণ কোনোটাই ঠিক-ঠিক শেখা যাবে?

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সুনীতিকুমার যেমন যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন না তেমনই তাঁর পরবর্তী ব্যাকরণ-রচয়িতারাও পুরনো রীতিই অনুসরণ করলেন দীর্ঘকাল।

সুকুমার সেন খানিকটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বরং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করে তিনি যে-স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং একালের অন্যধারার অন্যতম ব্যাকরণকার জ্যোতিভূষণ চাকীও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য : ''বাংলা ব্যাকরণে শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকেরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘণ্ট পাক করে গেছেন তা এখনও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমি-ও, সুনীতিবাবুর মতো। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি এ কথাও জোর দিয়ে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমার নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনও উপায় ছিল না।'' (পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ ২য় খণ্ড : প্রাসঙ্গিক তথ্যে ১নং সূত্র।)

উপায় না-থাকার কারণ কি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি তথা পাঠ্যসূচি? সুনীতিকুমার কি তা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে পারতেন না? এসব প্রশ্নের সদুত্তর এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়, তাই আক্ষেপ করেই-বা কী লাভ? তবে এ-কথা সত্য যে একদা 'সবুজ পত্র'-এর আসরে শামিল হয়ে ওই পত্রিকায় 'বাঙলা ভাষার কুলজী' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আরো দুটি রচনা চলিত ভাষায় লিখলেও পরবর্তীকালে একমাত্র বক্তৃতা ছাড়া সমস্ত লেখায় সারাজীবন তিনি সাধুভাষাকেই প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। অতৎসম শব্দের বানানের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের পথে চলতে পারলেন না সুনীতিকুমার, তাঁর অজস্র লেখায় অতৎসম শব্দে তাই ঈ-কারের ছড়াছড়ি। তার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন যে ই-কারের চেয়ে ঈ-কার লিখতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। যুক্তি হিসেবে এটা যে খুবই দুর্বল তা তিনি নিশ্চয় জানতেন। অথচ অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না, ফলে বিলম্বিত হলো বানান সংস্কারের প্রক্রিয়া। প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনার জন্যও অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর রইল না।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ বলতে আমি মা.চ.বা.-র ব্যাকরণই বোঝাতে চাইছি। এমনিতে ব্যাকরণ বই প্রচুর লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ব্যাকরণ সম্ভবত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' যা ১৮৩৩ সালে প্রকাশ পায়। সেখানে এই ভাষার স্বরূপ অনুসন্ধানের একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু সে-ভাষাও তো সাধু বাংলা, মা.চ.বা. তখনও দূর অস্ত্। তার পর কাছাকাছি সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সহ যাঁরা ব্যাকরণ লিখেছেন তাঁরাও তৎকালীন প্রথারই অনুসারী ছিলেন। সুনীতিকুমারের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর চার বছর আগে (১৯৩৫ সালে) প্রকাশিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর ব্যাকরণে কিছু-কিছু নতুন কথা থাকলেও আমাদের বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। একই কথা বলা যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থের ব্যাকরণ বিষয়েও। অথচ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ওইসব বই পড়েই আমাদের ভাষাশিক্ষার পাট সেরে ফেলতে হয়। ইতিমধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই ভাষায় যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে, নিত্যই ঘটে চলেছে সেসবের পরিচয়াত্মক ব্যাকরণ কোথায়?

সুকুমার রায়, হরপ্রসাদ কথা

সুকুমার রায়ের কয়েকটি কবিতার দিকে নজর দেওয়া যাক। 'খিচুড়ি' কবিতায় তিনি লিখেছেন, ''হাঁস ছিল, সজারু (ব্যাকরণ মানি না),/হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।'' একই রকমভাবে সৃষ্টি হয়েছে 'বকচ্ছপ' 'হাতিমি', আর যেসব শব্দ তিনি লেখেননি তবে বর্ণনা দিয়ে ছবি এঁকেছেন সেগুলো থেকেও বানানো যেতে পারে 'গিরগিটিয়া' 'বিছাগল' 'জিরাফড়িং' 'মোরগরু' 'সিংহরিণ' প্রভৃতি শব্দ। তা তিনি ব্যাকরণ না-ই মানুন, আমরা কিন্তু এর পিছনে একটা নিয়ম কাজ করে বলে দেখতে পাচ্ছি। সব ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ আর দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণ অভিন্ন, খিচুড়ি শব্দটি তৈরি হচ্ছে প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ আর দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণকে মিলিয়ে এক করে দিয়ে। ইংরেজিতেও 'স্মোক' আর 'ফগ' যোগ করে 'স্মগ' শব্দ তৈরি হয়েছে, বানানো হয়েছে 'টাইগার' আর 'লায়ন' যোগ করে 'টাইগন', যেমন বাংলায় এসেছে 'সিংঘ্র' (সিংহ + ব্যাঘ্র)। কিন্তু শেষোক্তগুলোর পদ্ধতি পৃথক, একাধিক বর্ণ লোপ করতে হয়েছে। সুকুমার রায়ের উল্লিখিত আটটি রূপেরই সৃষ্টি হয়েছে একটা সুস্পষ্ট নিয়ম মেনে, 'ধোঁয়াশা' (ধোঁয়া + কুয়াশা) শব্দটিও প্রায় অনুরূপ, আর সেই নিয়ম আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করাই তো ব্যাকরণের কাজ। এটা একান্তই বাংলা ভাষার নিজস্ব।

এইরকম কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় সুকুমার রায়ের কবিতায়। 'শব্দ কল্প দ্রুম' কবিতায় আমরা পাচ্ছি— শুধু পটকাই ফোটে না, ফুলও 'ফোটে', তেমনই হিম 'পড়ে', চাঁদ 'ডুবে' যায়, রাত 'কাটে', ঘুম 'ভাঙে', মন 'নাচে', ব্যথা 'বাজে', বুক 'ফাটে', কোঁচা 'মারে' প্রভৃতি। এর সবগুলিই বাঙালির ভাব প্রকাশের নিজস্ব ধরন। আমরা কঠিন বা তরল বস্তু, খাদ্য বা পানীয় সবকিছুই 'খাই'। এ ছাড়াও খাওয়া শব্দটা যে কতরকম আলাদা-আলাদা মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়! সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' কবিতায় অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা জল-দুধ যেমন খাই, তেমনই খাই বিড়ি-সিগারেট। চিঁড়ে-দইয়ে ফলের অস্তিত্বই নেই, তবু তাকে ফলাহার (বা ফলার) বলে। জলযোগ বা জলখাবারে জল না-থাকলেও চলে। কলা খাওয়া কিংবা কাঁচকলা খাওয়া কি সবসময় ভালো? সুদখোরকে হেয় জ্ঞান করা হয় আর যে ঘুষ খায় সে নিন্দনীয়। আমরা হাওয়া খাই, অনেক কিছু খাপ খায়, কিন্তু তেলে-জলে মিশ খায় না। যুদ্ধে যে গুলি খায় সে কি গুলিখোর? খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন খাওয়ার আরো কত-না নমুনা— পাক খায়, ভয় খায়, খাবি খায়, বেত খায়, থতোমতো খায়, তাড়া খায়, চোট খায়, চুমু খায়, কিলচড় লাথিঘুষি খায়, গুঁতো খায়, চাবুক খায়, বাতাস খায়, হিমশিম খায়, আছাড় খায়, মোচড় খায়, কানমলা খায়, টোল খায়, টাল খায়, ঘোল খায়, ডিগবাজি খায়, ধাক্কা খায়, মাথা খায়, বিষম খায়, মুখঝামটা খায়, ভ্যাবাচ্যাকা খায়, হোঁচট খায়, সেইসঙ্গে খায় কচুপোড়া আর ঘণ্টা। সৈয়দ মুজতবা আলীর এক গল্পে কচু, হাতি, ঘণ্টার উদ্ভট বাংলা প্রয়োগ শুনে এবং শব্দগুলির প্রকৃত অর্থের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক খুঁজে না-পেয়ে জনৈক জার্মান

ব্যক্তির বিস্ময় প্রকাশ থেকেও বোঝা যায় যে এইসব অভিব্যক্তির পিছনে বাঙালির নিজস্ব জীবনধারা ও ভাবনাচিন্তা কাজ করে, যার ব্যাখ্যা প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণ দ্বারা সম্ভব নয়।

সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত সূত্রপাতের পরে একালে নতুন ধরনের বাংলা ব্যাকরণ রচনার কাজে যাঁরা হাত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পবিত্র সরকারের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। অন্যান্য কিছু প্রবন্ধে আলোকপাত ছাড়াও 'আজকাল' থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পকেট বাংলা ব্যাকরণ'-এ মা.চ.বা-কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে বইটা আকারে ছোট, পৃষ্ঠাসংখ্যাও মাত্র ১০৪। আর এ-বই তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না, ফলে মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎসু ছাড়া আর কারো হাতে বইটি পৌঁছবে না। অনেকদিন আগে অশোক মুখোপাধ্যায়েরও একটা ছোট ব্যাকরণ বই 'সাহিত্য সংসদ' থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু তারও সংস্কার হয়নি, এখন বোধ হয় পাওয়াও যায় না। সেদিক থেকে জ্যোতিভূষণ চাকীর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬) এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। সেখানে প্রথাগত ব্যাকরণের সঙ্গে নব্য ব্যাকরণ চিন্তাও স্থান পেয়েছে।

এই লেখা যখন চলছে তখন সুভাষ ভট্টাচার্য জানালেন, ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে রফিকুল ইসলাম আর পবিত্র সরকারের যুগ্ম সম্পাদনায় দুই খণ্ডে 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' নামে নতুন ধরনের একটি বই বেরিয়েছে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে, ইতিমধ্যে সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত। পরে তার প্রথম খণ্ডটি আমি সংগ্রহ করেছি, যাতে ভবিষ্যৎ কোনো আলোচনায় কাজে লাগে। তবে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এই বই এদেশে কতটা জনপ্রিয় হবে সে-বিষয়ে যেমন সংশয় রয়েছে, তেমনই সেটা কোনো ভারতীয় স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলে এদেশের অসংখ্য সাধারণ বাঙালির তেমন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না।

আগেই বলেছি, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার ব্যাপারে তাঁর নিজের কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কেন ব্যতিক্রম সেটা বোঝানোর জন্য তাঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। হরপ্রসাদের জন্ম নৈহাটি-ভাটপাড়ার সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরিবারে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুও ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবেও অধ্যাপনা করেছেন, সম্ভবত সেই সূত্রেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নন্দকুমারের সখ্য গড়ে উঠেছিল। নন্দকুমারের অকালপ্রয়াণের পরে অসহায় বালক হরপ্রসাদকে নিজের বাসভবনে রেখে সংস্কৃত কলেজে ভরতি করেন বিদ্যাসাগর। পরে হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজেও পড়েন। সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই-ই ছিল তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়। অথচ এই দুটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেও কোনোরকম গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। বরং মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

ইতিপূর্বে হরপ্রসাদের ওপর শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা বলেছি।

বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও তাঁর জীবন, চরিত্র ও কর্মোদ্যমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনুসন্ধিৎসা, স্পষ্টবাদিতা, আপসহীনতা। আর গবেষণাকর্মে হরপ্রসাদকে যিনি বিশেষভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনায় নিজের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না-এলে বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে হরপ্রসাদের নিরন্তর গবেষণা এবং তারই পরিণাম হিসেবে নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদ উদ্ধার আদৌ সম্ভব হতো কি?

শুধু চর্যাপদ নয়, ১৮৯৭ সালে প্রথম বার নেপাল সফরকালে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থটিও হরপ্রসাদই আবিষ্কার করেন এবং তাঁর ধারাবাহিক গবেষণা ও সন্ধানের ফলে প্রায় সাত হাজার পাণ্ডুলিপি/পুঁথি সংগৃহীত হয়। তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আর গবেষণায় অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পেয়ে নিজের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) প্রণয়নকালে শাস্ত্রী মশাইকে সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন রাজেন্দ্রলাল। শুধু পুঁথি সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করাই নয়, হরপ্রসাদ ওই বিখ্যাত বইয়ের যোলোটি পরিচ্ছেদ লেখেন এবং রাজেন্দ্রলাল অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রন্থটি সমাপ্তির দায়ও তাঁর ওপরেই বর্তায়। সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বইটির ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল লেখেন : "I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task and he did his work to my entire satisfaction."

শাস্ত্রীমশায় বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র থাকার সময়েই তাঁর 'ভারত মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেটা 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপেন। পরে হরপ্রসাদের 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধও বঙ্গদর্শন-এ (শ্রাবণ ১২৮৮) প্রকাশ পায়। ওইসব প্রবন্ধে তাঁর চিন্তাধারার স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। হরপ্রসাদকে আকর্ষণ করেছে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদের 'খাঁটি বাংলা'। তিনি বিশেষ প্রশংসা করেছেন তৎকালীন কথক ঠাকুরদের ভাষার। সংস্কৃত-প্রভাবিত ইংরেজি-মিশ্রিত বাংলা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জানবার আগে হরপ্রসাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক : ''প্যারী বাবুর ভাষায় খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে ''কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়'', ইহা সেই ভাষা— যেহেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দাই থাকে না।'' (রচনা সংগ্রহ-২, পৃ. ১৫০) সেকালে বাংলা প্রবন্ধে এইরকম সহজ-সরল ভাষার নিদর্শন বিরল বললেই চলে। তা ছাড়া, মনে রাখা দরকার, যে-সময়ে হরপ্রসাদ এইরকম বাংলা লিখছেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বিশ বছর এবং তিনিও কিছু চিঠিপত্র ও ডায়েরি ছাড়া অন্যান্য গদ্যরচনায় এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেননি।

অন্যান্য লেখকদের ভাষা খটোমটো কেন সে-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হরপ্রসাদ লিখেছেন : ''কথাটি এই যে যাহারা এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরাজী পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়াল ভাঙা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কী আছে না আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।" ('বাংলা ভাষা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১) এই প্রবন্ধেরও ভাষা এতই প্রাঞ্জল এবং দ্বিধাহীন বক্তব্য এতই স্বচ্ছ যে হরপ্রসাদের প্রবণতা কোন্ দিকে তা অত্যন্ত পরিষ্কার। অথচ মজার ব্যাপার এই যে তিনি নিজেও সংস্কৃত আর ইংরেজি ভালো করে পড়েছেন। তবু বাংলা ভাষার প্রশ্নে ওই দুই ভাষার অনুসরণ তাঁর না-পসন্দ।

'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন : ''আমরা বলি, 'সময় আর কাটে না', তাঁহারা বলেন, 'কাটে না ছি!—ইতুরে কথা'। বলেন 'সময় কর্তন হয় না'। আমরা বলি, 'ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল', তাঁহারা বলেন, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল'।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৮) অন্যদিকে, ইংরেজি স্টাইলের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি একটি বাক্য উল্লেখ করেছেন— ''দেখিলাম গরম পোলাও আর মাংস আমার আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" (পৃ. ৩৬৯)

এখানে বলা দরকার, এরকম ঘটনা যে শুধু সেকালেই ঘটেছে তা নয়, একালেও আমরা এ-জাতীয় অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে থাকি। 'অংশ নেওয়া' বা 'অংশগ্রহণ করা' যে ইংরেজি 'টু টেক পার্ট'-এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ সেটা বোধহয় আমরা অনেকেই খেয়াল রাখি না, ফলে সভাসমিতি বা আলোচনায় 'অংশগ্রহণ' বাংলা লেখায় ইদানীং খুবই প্রচলিত। অথচ ইংরেজিতে 'পার্ট' শব্দের একটা অর্থ 'অংশ' হলেও অন্য অর্থ যে 'ভূমিকা' সেটা আমরা ভুলে যাই, আর ভুলে যাই বলেই 'টু টেক পার্ট'-এর আসল অর্থ যে 'ভূমিকা গ্রহণ' তা-ও মনে রাখি না। তা ছাড়া বাংলার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে 'ভূমিকা গ্রহণ'-এর পরিবর্তে 'যোগ দেওয়া' বা 'যোগদান করা'-ই বেশি মানানসই। কেউ-কেউ অবশ্য এ-ব্যাপারে সচেতন এবং সেইভাবেই লেখেন, যেমন জ্যোতিভূষণ চাকীর লেখায় পাই ''...বক্তব্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যাঁরা আলোচনায় যোগ দেন..." ইত্যাদি। (তাঁর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইয়ের 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

একটি নামি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে পড়েছিলাম 'ধ্যান দেওয়া কর্তব্য'-এর মতো হিন্দি প্রয়োগ। বাংলায় ধ্যান শব্দটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চয় বলবার অপেক্ষা রাখে না। বাংলায় আমরা বলি 'ধ্যান করা' আর 'মনোযোগ দেওয়া'। আমার বক্তব্য, অন্য ভাষার শব্দ আমদানির মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা আর অন্য ভাষার প্রকাশভঙ্গির অনুকরণ এক কথা নয়। হরপ্রসাদও ইংরেজি ভাষার ভঙ্গির নকল যুক্ত উপরের বাক্যটির উদাহরণ দিয়ে আমাদের সে-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

শুধু ভাষাভঙ্গির অনুকরণ নয়, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির খিচুড়িভাষার নমুনাও

দেখিয়েছেন শাস্ত্রী মশায় : ‘‘আমি ল্যাণ্ডো গাড়িতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য টিকেট বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড করিয়া একটু শর্টন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেন ষ্টার্ট করিল।’’ (হরপ্রসাদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৯) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইদানীং ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষিত অথচ বাংলা পড়েনি এমন কিছু ছেলেমেয়ের মুখে ইংরেজি-মিশ্রিত কিংবা হিন্দি-মিশ্রিত এরকম ভাষা শোনা যায় বটে, তবে সাধারণভাবে লিখিত বাংলা এই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়নি।

রাজশেখর বসু তাঁর ‘চলন্তিকা’ অভিধানে (প্রথম প্রকাশ, ১৯৩১) বাংলায় অপ্রচলিত কয়েকটি স্বরবর্ণকে স্থান দেননি। উক্ত গ্রন্থের আলোচনায় হরপ্রসাদও সেটা সমর্থন করে লিখেছেন (‘প্রবাসী’, আশ্বিন ১৩৩৭) : ‘‘দীর্ঘ ‘ৠ’, হ্রস্ব ‘ঌ’, দীর্ঘ ‘ঌ’ এই তিনটি অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই। কারণ সংস্কৃতে দীর্ঘ ‘ঌ’ সকলে স্বীকার করেন না। পাণিনিও করেন না। সংস্কৃতে হ্রস্ব ‘ঌ’ ও দীর্ঘ ‘ৠ’ ব্যবহারও খুব কম। বাংলায় উঠিয়া যাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্তঃস্থ ‘ব’ তুলিলে চলিবে কি? সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ‘ব’ বর্গীয় ‘ব’ অপেক্ষা অনেক বেশী।’’

অন্তঃস্থ-ব আর বর্গ্য-ব অভিন্ন চেহারা নিয়ে বাংলা বর্ণমালায় বিরাজ করছে, তার ভিন্ন রূপ গ্রহণ কিংবা একটির বিলোপের সম্ভাবনা আপাতত নেই বললেই চলে। তার ফলে কিছু সমস্যাও অবশ্য দেখা দেয় বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে। এ-প্রসঙ্গটি পরে আলাদাভাবে আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু বলি, রাজশেখর বসু সেই ১৯৩১ সালেই তিনটি স্বরবর্ণ (আর সেগুলির যোজ্য রূপ) তুলে দিলেও এবং হরপ্রসাদ তা সমর্থন করলেও শিশুপাঠ্য বইগুলিতে কিন্তু তার প্রতিফলন ঘটেনি দীর্ঘকাল। আমরা তো পড়েইছি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও ওইসব বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে, বাস্তবে যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ কোনো বাংলা বইয়েই ছিল না। শুধু ‘ঌ-কার যেন ডিগবাজি খায়’— এটা জেনেই আমরা সন্তুষ্ট থেকেছি।

ইতিপূর্বে হরপ্রসাদের প্রবন্ধের ভাষার কিছু নমুনা তুলে ধরেছি। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনার ভাষাও অনুরূপ। ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তাঁর ‘তৈল’ শীর্ষক রচনার অংশবিশেষ এইরকম : ‘‘... যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। ... তাহার প্রমাণ, ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা আদায় করিতে পারিল না— একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলেও যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস-কলস ঢালিলেও তত হয় না।’’ এ ছাড়াও তাঁর রচনা-সংগ্রহের সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, হরপ্রসাদের দুটি উপন্যাস ‘কাঞ্চনমালা’ (১৮৮৩) ও ‘বেণের মেয়ে’ (১৯২০) যে-ধরনের ভাষায় লেখা সেখানেও তৎসম শব্দের আধিক্যের পরিবর্তে চলিত বাংলার নিজস্ব চরিত্রই বেশি করে ফুটে উঠেছে। সেকালের প্রচলন অনুযায়ী ক্রিয়াপদে অবশ্য সাধুভাষার রূপটাই স্থান পেয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোর-রামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী সংবাদ

ওই সময়কার আরো এক লেখকের সহজ-সরল বাংলার সঙ্গে আমরা পরিচিত। তিনি বয়সে হরপ্রসাদের চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোট উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনিও অবশ্য সাধু ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভাষার কাঠামোটা নিঃসন্দেহে চলিতের। তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর আদিকাণ্ড থেকে খানিকটা তুলে ধরলেই উপেন্দ্রকিশোরের প্রবণতা কোন্ দিকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে : ''ছেলে চারটি যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান, আর তেমনি তাহাদের মিষ্ট স্বভাব। ভালো ছেলের যতরকম গুণ থাকিতে হয় তাহার কিছুই তাঁহাদের কম ছিল না। অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহারা যারপরনাই বিদ্বান আর বীর হইয়া উঠিলেন। লেখায়, পড়ায়, যুদ্ধে, শিকারে কোন কাজেই তাঁহাদের মতন আর কেহ ছিল না।

''ভাইকে কেমন করিয়া ভালোবাসিতে হয়, তাহা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নকে দেখিলে বুঝিতে পারিতে। তাহার মধ্যে আবার রামকে লক্ষ্মণ আর ভরতকে শত্রুঘ্ন আরও বেশি করিয়া ভালোবাসিতেন।" ('উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী', সাহিত্যম্, পৃ. ২৩১)

যা-ই হোক, আসল কথা এই যে উপেন্দ্রকিশোর তো বটেই, হরপ্রসাদেরও বহু রচনার ক্রিয়াপদ পালটে দিলে তা উৎকৃষ্ট চলিত বাংলার নিদর্শন হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। হরপ্রসাদের কাছে বাংলা ভাষা চর্চাকারীদের কৃতজ্ঞতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য, তেমনই আমরা অবাক না-হয়ে পারি না যখন লক্ষ করি, শাস্ত্রী মশাই ছিলেন ভট্টাচার্য বংশীয় এমন সংস্কৃত পণ্ডিত পরিবারের সন্তান, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের সম্বন্ধ 'ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের' বলে মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর হরপ্রসাদ বয়সে কবির চেয়ে আট বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও ভাষার প্রশ্নে উভয়ের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। ইতিপূর্বে শাস্ত্রী মশায়ের 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক একটি উদ্ধৃতিতেও আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের মতোই হরপ্রসাদও মনে করতেন যে যাঁরা শুধু সংস্কৃত বা ইংরেজি পড়েই বাংলায় লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের কেউই ভালো করে বাংলা ভাষাটা শেখেননি।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, হরপ্রসাদ নিজেও তো টোল-চতুষ্পাঠী সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত আর ইংরেজিই শিখেছেন,তাহলে কোন্ প্রেরণায় তিনি বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ও নিজস্ব প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন এবং তার হালহদিশ জানতে আদাজল খেয়ে লাগলেন? এ এক পরম বিস্ময়। বেশ বোঝা যায়, তাঁর আরাধ্য বিদ্যাসাগরের মতোই হরপ্রসাদও নিজের সময়ের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন।

এই সূত্রে আরেকজনের কথাও একটু বলতে হয়। তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে-সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েন সেখানে রামেন্দ্রসুন্দরও উপস্থিত

ছিলেন এবং আলোচনায় যোগ দেন। একালে পশ্চিমবঙ্গের বা অসমের স্কুলপাঠ্য বাংলা বইয়ে তাঁর লেখা আর পড়ানো হয় না বলেই শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষ করে তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির কথা এখনও মনে আছে। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, বাংলাদেশে বিদ্যালয় ও প্রাক্-স্নাতক স্তরে তাঁর লেখা পড়ানো হয়।

যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু একাধিক বার রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলা ভাষা সহ অন্যান্য বিষয়েও ত্রিবেদী মশায়ের অবদান কম নয়। তিনি 'শব্দ-কথা' নামে একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। সেখানে ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দের উচ্চারণ-প্রসঙ্গের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত বইটির মুখবন্ধে (১লা বৈশাখ ১৩২৪) লেখক জানিয়েছেন : ''সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; প্রবন্ধগুলি এতকাল পরিষদ-পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল; শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম।''

আর বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য তথা বিশেষত্ব নিয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় নীচের বক্তব্যটিতে : ''বাঙ্গালা ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে, কিন্তু ইহা তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা নহে। অন্য ভাষাতে যেমন নিয়ম আছে, বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু সেই সকল নিয়মের এখনও কেহ আলোচনা করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সেই নিয়ম আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধীজনকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।''

এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সেকালে বাংলা ভাষার নিজস্ব নিয়ম খুঁজতে যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের নামটিও অবশ্যই যুক্ত হওয়া উচিত।

এ-পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তার কিছু-কিছু অংশ ধান ভানতে শিবের গীত বলে কারো-কারো মনে হয়ে থাকলে সবিনয়ে বলি, এই ভাষার বিশেষত্ব তথা বানান ও উচ্চারণ নিয়ে আজ আমরা যে-পথে চলতে চাইছি তার আভাস দিয়েই শুধু উল্লিখিত বিশিষ্টজনেরা ক্ষান্ত হননি, রূপরেখা অঙ্কন সহ সেই পথের প্রাথমিক সন্ধানও তাঁরাই দিয়ে গিয়েছেন। অনেকটা মসৃণ করে দিয়েছেন আমাদের যাত্রাপথ। ওই অগ্রপথিকদের অবদান অস্বীকার তাই পথটাকেই অগ্রাহ্য করার নামান্তর।

মান্য চলিত বাংলা (মা.চ.বা.) নামক যে-ভাষা আজকাল সাধারণত আমরা ব্যবহার করি এবং সাহিত্যেও বহুল প্রচলিত তা নিয়ে প্রথম সোচ্চার আন্দোলন শুরু হয় নিঃসন্দেহে

প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে 'সবুজ পত্র' পত্রিকায়, গোড়া থেকেই যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেটা ১৯১৪ সালের কথা, তার মাত্র মাস ছয়েক আগে কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইতিপূর্বে চলিত ভাষায় রচিত গোটাচারেক বইয়ের কথা জানা যায় — কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'। এ-ছাড়াও এখানে-সেখানে চলিত ভাষায় কিছু লেখা হয়ে থাকতে পারে, যেমন 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা, যা পরে 'পরিব্রাজক' শিরোনামে সংকলিত হয়।

এ-কথা স্বীকার্য যে প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের জন্য আমাদের আরো অন্তত তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ 'সবুজ পত্র'-এর আন্দোলন আশু সুফল প্রদান করেনি। চৌধুরী মশায় প্রথম থেকেই চলিত ভাষায় লিখলেও এবং এই ভাষার সপক্ষে যথেষ্ট ওকালতি করলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে শুরুর দিকে দ্বিধান্বিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় ওই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর তখনকার গদ্য রচনাগুলির দিকে নজর দিলেই। প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২১ অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের মে) একটি কবিতা ('সবুজের অভিযান') ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের দুটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়— 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (প্রবন্ধ) আর 'হালদার গোষ্ঠী' (গল্প), দুটোই সাধুভাষায় লেখা। শুধু তা-ই নয়, 'সবুজ পত্র'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম এগারো মাসে মোট আঠারোটি গদ্যরচনার মধ্যে পত্রাকারে রচিত বলে একমাত্র 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি ছাড়া বাকি সতেরোটিতেই রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। দ্বাদশ সংখ্যায় তাঁর দুটি নাটক ('বসন্তের পালা' ও 'ফাধনী') ছাপা হয়, যেখানে সংগত কারণেই কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের কাহিনিমূলক রচনায় চলিত ভাষার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে, যা 'সবুজ পত্র'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২২ অর্থাৎ ১৯১৫ সালের মে) থেকে প্রকাশ পায়, শেষ হয় সে-বছরের একাদশ সংখ্যায়।

এখানে বলা দরকার, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটিও রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষাতেই লেখা শুরু করেছিলেন। কবির জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন : ''ঘরে-বাইরে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তিনি এটি আরম্ভ করেছিলেন সাধুভাষায় : 'জীবনের একএকটা পর্ব্বে ভাগ্যক্রমে একএকবার বাঁশি শোনা যায়। প্রথম বাঁশি শুনিয়াছিলাম আমার মায়ের মধ্যে। সেই ভোরবেলাকার শিশিরে ধোওয়া সুরটি অনেক দিন পরে আজ মনে পড়িল' — কিন্তু এই তৃতীয় বাক্যটি শেষ করার আগেই 'পড়িল' কেটে লেখেন 'পড়চে' ও দ্বিতীয় বাক্যে পূর্ব-লিখিত 'শুনিয়াছিলাম' কেটে 'শুনেছিলুম' করেন, তার পরের অংশ চলিত ভাষাতেই লেখা। কিন্তু একে ভাষারীতির পরিবর্তন মনে করলে ভুল হবে। ডায়েরি-জাতীয় লেখা বলেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চিন্তায় চলিত রীতি গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলিত রীতি

গ্রহণে তিনি যে তখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তার প্রমাণ 'সোনার কাঠি' [সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ] প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লেখার পর 'ছবির অঙ্গ' [ঐ, আষাঢ়], 'কৃপণতা' [ঐ, ভাদ্র-আশ্বিন], 'শরৎ' [ঐ] প্রভৃতি প্রবন্ধ তিনি সাধুভাষাতেই লিখেছেন। 'সোনার কাঠি'ও ভাষণ-জাতীয় প্রবন্ধ বলে মনে করার কারণ আছে।" ('রবিজীবনী', সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৯৭)

প্রশান্তকুমারের বক্তব্যের যাথার্থ্যের প্রমাণ আমরা অন্যত্রও পাই। প্রবন্ধে তো বটেই, গল্পেও রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে লেখা 'তপস্বিনী' পর্যন্ত, পরের মাসে লেখা 'পয়লা নম্বর' (দুটি গল্পই 'সবুজ পত্র'-এর চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত) থেকেই তিনি নিয়মিত চলিত ভাষায় গল্প লিখতে শুরু করেন। তার পরিচয় মেলে পরবর্তী গল্প 'পাত্র ও পাত্রী'-তেও। কিন্তু মাঝখানে আখ্যানমূলক রচনায় চলিত ভাষা প্রয়োগ করেও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন 'সবুজ পত্র' প্রকাশের তিন বছর পরেও। তারই নিদর্শন 'ভাষার কথা' প্রবন্ধটি ('সবুজ পত্র', তৃতীয় বর্ষ, চৈত্র ১৩২৩)। একদা যিনি বারে বারে 'প্রাকৃত' বাংলার পক্ষে সওয়াল করেছেন তাঁরই কলমে সাহিত্যে চলিত ভাষার অবাধ ব্যবহার সম্পর্কে কুণ্ঠার প্রকাশ আমরা লক্ষ করি উক্ত প্রবন্ধে।

'ভাষার কথা'-য় রবীন্দ্রনাথের যে-বিচিত্র মনোভাব ফুটে উঠেছে তার মধ্যে নানারকম যুক্তিজাল বিস্তারের চেষ্টা যেমন দেখি তেমনই সংশয়ের প্রেক্ষাপটও গোপন থাকে না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কৃত্রিমতা বর্জন তাঁর কাঙ্ক্ষিত, তবে সমস্যার দিকেও আলোকপাতের কথা তিনি ভোলেননি, অনুভব করেছেন সতর্ক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা। বেশ বোঝা যায়, প্রাকৃত বাংলাকে যোগ্য আদরে বরণ করার দিকেই তাঁর প্রবণতা, বাংলার রাজধানী কলকাতায় প্রচলিত অন্যান্য অঞ্চলের 'মথিত একটি [কক্‌নি-বর্জিত] ভাষা'কেই তিনি চলিত ভাষার মর্যাদা দিতে চান। সেইসঙ্গে জোর দিয়ে বলেন, "...এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনোই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না?" ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯১, পৃ. ১০) আরো বলেছেন, "সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।... কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭) অথচ এই মন্তব্যের আগে তিনি এ-কথাও বলেছেন, "...নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। 'প্রার্থনা' সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ 'চাওয়া'। 'প্রার্থিত' 'প্রার্থনীয়' শব্দের ভাবটা যদি ওই খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫) তাহলে মানে কী দাঁড়াল, তখনও পর্যন্ত তিনি চলিত ভাষাকে অসংকোচে ছাড়পত্র দিতে রাজি নন?

আবার, রবীন্দ্রনাথ এটাও বলেন, "পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে

তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। ‘হইবে’র জায়গায় ‘হবে’, ‘হইতেছে’র জায়গায় ‘হচ্চে’ ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনারা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্বতাকে মানের খর্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাহাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে, আপদ গেছে।” (প্রাগুক্ত,পৃ. ৭) এর অর্থ, চলিত ভাষার ক্রিয়াপদকে তিনি স্বাগত জানানোরই পক্ষপাতী। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা তর্ক আছে, সেটাও তিনি ভেবে দেখতে চান : ‘‘আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশি। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব-কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্তমানে এই চল্‌তি ভাষার লেখা, পুঁথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক শক্ত।... ‘সবুজ পত্র’-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলাদেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করিয়া দেয় তবে সর্বপ্রথমে তাঁকেই কানে হাত দিয়া দেশছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২)

উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উপসংহার নিম্নরূপ : ‘‘আমাদের সাহিত্য যে-ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য ‘সবুজ পত্র’-সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট— এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে ‘পয়লা সামাল্‌না মুশকিল হ্যয়।’ স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনো তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)

উপরের দুটি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যাপক প্রয়োগের জন্য রবীন্দ্রনাথ আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে চাইছেন। ‘ভাষার কথা’ লেখার পরেও পাঁচ বছর ধরে ‘সবুজ পত্র’ প্রকাশিত হয়, চার বছর বিরতির পর অনিয়মিত ভাবে আরো দু-বছর বেরোয়। শেষ প্রকাশ ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বরে (ভাদ্র ১৩৩৪)। অর্থাৎ মোট ব্যাপ্তি প্রায় সাড়ে তেরো বছর। তা সত্ত্বেও গত শতকের বিশ, তিরিশ, এমন-কি চল্লিশের দশকেও বহু সাহিত্যিক-যে সাধুভাষাকেই আঁকড়ে ছিলেন তার কারণ কি রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত মন্তব্য ? কয়েকটা তথ্য আমাদের এই প্রশ্ন অবহেলা করতে দেয় না।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে পনেরো বছরের ছোট সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তার বছরখানেক পরেই ‘সবুজ পত্র’ আত্মপ্রকাশ করে। অথচ কয়েকটা লিখিত বক্তৃতা আর ‘ছেলেবেলার গল্প’-এর অধীন ছোট-ছোট ছয়টি স্মৃতিকথামূলক রচনা ছাড়া আমৃত্যু (১৯৩৮ খ্রি.) তিনি কার্যত

সাধুভাষা আশ্রয় করেই লিখে গেছেন। এমন-কি তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়'ও সাধুভাষায় রচিত। একটিমাত্র ব্যতিক্রম 'স্বামী'। উপন্যাসটি তার নায়িকা সৌদামিনীর জবানিতে লেখা— আত্মকথা বলেই এখানে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথ পরের দিকে চলিত ভাষা আশ্রয় করলেও শরৎচন্দ্র সে-পথে হাঁটতে পারলেন না কেন? গল্পগুলিতে তিনি যে-ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে চলিত ক্রিয়াপদই তো স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'সবুজ পত্র'-এর আন্দোলন দ্বারা শরৎচন্দ্র বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। সেটা কি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক দ্বিধারই পরিণাম?

অন্যদিকে, রবীন্দ্র-পরবর্তী তিন বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক) দীর্ঘকাল সাধুভাষার মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও মানিকের চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। তা সত্ত্বেও তিনি প্রথম থেকেই (অর্থাৎ বিশের দশকের শেষদিকে) চলিত ভাষায় লেখেন। আর তিরিশের দশকে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা, বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু চলিত ভাষার দিকে ঝুঁকলেন। তবু চল্লিশের দশক পর্যন্ত সাধুভাষার প্রভাব অনেকটাই ছিল। এমন-কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁর জন্ম 'সবুজ পত্র' প্রকাশের চার বছর পরে, তিনিও চল্লিশের দশকে প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' লিখেছিলেন সাধুভাষায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে। তার পরেও কোনো-কোনো প্রাবন্ধিক অবশ্য আজীবন সাধুভাষায় লিখেছেন। যেমন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তবে নীরদচন্দ্রের লেখায় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। আর কথাসাহিত্যে কমলকুমার মজুমদারের সাধুভাষা এতটাই অনন্য যে সেটাকে ব্যতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত করাই সংগত। একালে কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া সাধুভাষার ব্যবহার বিরল বললেই চলে। তবে হ্যাঁ, সরকারি স্তরে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এখনও সাধুভাষা চালানো হচ্ছে। ২০১৬ সালেও মুখ্যমন্ত্রী-সহ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার সদস্যদের সাধুভাষায় শপথ গ্রহণ করতে দেখা গেল। ব্যাপারটা অদ্ভুত, যদিও কারণটা অজ্ঞাত।

মা.চ.বা. — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার প্রসঙ্গ

আমাদের আলোচনা যে-ভাষার বানান ও উচ্চারণ নিয়ে সেই মান্য চলিত বাংলা (মা.চ.বা.) এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, এমন-কি বাংলাদেশেও। আলাপ-আলোচনায় তো বটেই সাহিত্যেও এই ভাষাই ইদানীং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ব্যবহার করে থাকে। অসংখ্য বাচিক শিল্পীদের আশ্রয়ও প্রধানত এই ভাষা। ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চললে আমাদের সকলেই লাভ। এই দুটি বিষয়ই অবশ্য চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, থাকতে পারে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের বানান সংস্কারের পরেও আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যে আরো কিছু সংস্কারকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, সেগুলোর অধিকাংশই প্রচলিতও হয়েছে। তবু অবিকল্প বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রেও যেমন সচেতনতার অভাবে ভুল করি তেমনই বিভিন্ন বিধিতে কিছু পার্থক্যও লক্ষ করা যায়, পার্থক্য লক্ষ করা যায় একই শব্দের বানান ও উচ্চারণে। আমার উদ্দেশ্য, ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে বর্তমান অবস্থায় যে-সব বানান ও উচ্চারণ প্রায়ই ভুলভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো শনাক্ত করে কবি-সাহিত্যিক ও বাচিক শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ আর বিকল্প কতটা কমানো যায় সেদিকেও নজর দেওয়া।

এখানে বলে রাখতে চাই, সাধুভাষার ক্রিয়াপদে যে ‘লাম’ ‘তাম’ বিভক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা সম্ভবত পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষা থেকে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির কথ্য ভাষার বিভক্তি ‘লুম’ ‘লেম’ ‘তুম’ ‘তেম’-এর ব্যবহার সাধুভাষায় কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। সাধুভাষায় বরাবর ‘লাম’ ‘তাম’ লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ-সহ অনেকেই চলিত ভাষায় সে-সময়ে ‘লুম’ ‘লেম’ ‘তুম’ ‘তেম’ লিখলেও ক্রমশ এইসব বিভক্তি চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ থেকে লুপ্ত হয়ে ‘লাম’ ‘তাম’-কেই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়েও একালে মা.চ.বা.-র ক্রিয়াপদে ‘লাম’ ‘তাম’-এরই জয়জয়কার। ‘লেম’ ‘তেম’ তো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন এখনও চলিত ভাষায় ‘লুম’ ‘তুম’ ব্যবহার করেন বটে কিন্তু তাঁদের লেখাতেও ‘করলেম’ ‘বলতেম’ পাওয়া যায় না। ওপার বাংলায় তো পুরোপুরি বটেই, এপার বাংলায়ও যাঁরা চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন তাঁদের অধিকাংশই ‘করলাম’ ‘বলতাম’ ইত্যাদিই লিখে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের সময়কার চলিত ভাষার তুলনায় বর্তমান কালের চলিত ভাষায় আরো দুটো পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেকালে পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার প্রভাবে ‘করলে’ ‘বললে’ প্রভৃতি শব্দ সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহৃত হতো, যেগুলো এখন অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ হিসেবেই চিহ্নিত। আর ‘করচি’ ‘হচ্চে’ ইত্যাদি শব্দেও স্বল্পপ্রাণ বর্ণের পরিবর্তে মহাপ্রাণ বর্ণই (যেমন ‘করছি’ ‘হচ্ছে’ ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ গত

একশো বছরে চলিত ভাষায়ও বেশকিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। কী কারণে ও কীভাবে ঘটেছে সেসব গবেষকদের বিচার্য বিষয়। আমার আলোচনায় শুধু এখনকার প্রচলন ও যৌক্তিকতাই স্থান পাবে।

ইতিপূর্বে বলেছি, সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী হয়েও 'সবুজ পত্র' আন্দোলনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। 'শক্তি যাদের অল্প' তাদের হাতে ভাষার সৌকর্য হানির আশঙ্কাই চলিত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর সংকোচের প্রধান কারণ ছিল বলে মনে হয়। সেটা গত শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। এই প্রাথমিক সংকোচ কাটিয়ে তৃতীয় দশকে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে চলিত ভাষাই যখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল (যদিও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রজন্মের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক আরো প্রায় দুই দশক ধরে সাধুভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন) তখন তিনি 'প্রাকৃত বাংলার' বানানে শৃঙ্খলার প্রয়োজনও অনুভব করলেন। বিধি প্রণয়নের জন্য আবেদন জানালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করে। প্রায় দুশো বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা সহ কয়েকটি বৈঠকে সমিতির সদস্যরা মিলিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিয়মাবলি প্রকাশ করা হয় ১৯৩৬ সালের ৮ মে। তার পরেও দুই দফায় কিছু সংশোধন সহ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২০ মে ১৯৩৭ তারিখে।

গত শতকের নব্বই-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-প্রস্তাবিত বানানবিধির সমালোচনা করতে গিয়ে 'বানান সংস্কার : সমস্যাটা থেকেই গেল' শীর্ষক প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের প্রায় এগারোশ' বছর পরে বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।... 'বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' বলেছিলেন যে এই সংস্কারনীতিতে তাঁরা 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করেছেন। তাই *সেই সংস্কারপ্রচেষ্টা সেদিন কাউকে বিচলিত করেনি*।'' ('থির বিজুরি' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যা, পৃ. ৬১) শেষদিকের কয়েকটি শব্দ বর্তমান লেখক বাঁকা অক্ষরে চিহ্নিত করেছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য হলো, চিত্তরঞ্জনবাবুর বক্তব্য-যে ঐতিহাসিক ভাবে ভ্রান্ত সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রচিত নিয়মাবলি *সেদিন* বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে শুধু *বিচলিতই* করেনি, অনেকের তীব্র প্রতিবাদ রীতিমতো ঝড় তুলেছিল। পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর বিতর্ক হয়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায় উভয় পক্ষের চাপান-উতোর। আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বীরেশ্বর সেন, সুধীর মিত্র, জ্যোতির্ময় ঘোষ, রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, রাজশেখর বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, বিমলনারায়ণ চৌধুরী, মঞ্জু ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলার গায়ে সংস্কৃতের পোশাক!

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারেরও দশ বছর আগে সুনীতিকুমার ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'চল্‌তি ভাষার বানান' শীর্ষক এক 'প্রস্তাবনা' পেশ করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, যা 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমোদন পেয়েছিল বলে জানানো হয়। সেখানে মূল সূত্র হিসেবে আমরা পাই— ''সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের মনে দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছে।... এ-ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নহে।'' সেইসঙ্গে প্রথম বিধিতেই বলা হয়, ''সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অনুযায়ী লেখা হবে, অর্থাৎ প্রচলিত বানান বজায় থাকবে।'' অতৎসম শব্দেও বহু ক্ষেত্রে স্বরচিহ্নের বাহুল্য লক্ষ করা যায়, যা পরবর্তীকালে বর্জিত হয়েছে। তবে ওই বিধি সকলের ব্যবহারের জন্য রচিত হয়নি। টীকায় বলা হয়েছিল, ''এখন থেকে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখা এই পদ্ধতি অনুসারে ছাপা হবে।'' তা ছাড়া, দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি মেনে নিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দেও রেফযুক্ত শব্দে দ্বিত্ব বর্জন সহ অধিকাংশ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে বলেছিলেন, হাতের লেখায় দীর্ঘকালের অভ্যাস ছাড়তে না-পারলেও 'ছাপার অক্ষরে' পারবেন। অর্থাৎ বিশ্বভারতীও তখন পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিল। ফলে, উক্ত সংস্থার বিধি আমাদের বর্তমান আলোচনায় তেমন প্রাসঙ্গিক নয়।

তৎকালীন রিপন কলেজের (যার নাম বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬-৩৭ সালের সংস্কারের ঘোর বিরোধীদের শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা। তিনি একদিকে রবীন্দ্রনাথকে কঠোর ভাষায় বড় বড় চিঠি লিখেছেন কবি উক্ত বিধি মেনে নেওয়ায়, অন্যদিকে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বানানবিধির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে দেবপ্রসাদ সহ মোট কুড়ি জন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় (১লা বৈশাখ ১৩৪৪), যেখানে বলা হয়, ''...আমরা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার উপর এই প্রকার অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়, এবং বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা অবিলম্বে এবিষয়ে অবহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাটের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।'' ওই ইস্তাহারে দেবপ্রসাদ ছাড়াও কয়েকজন সুপরিচিত স্বাক্ষরকারীর নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য : অনুরূপা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, সজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি),

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বসুমতী), সুকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী), অশোকনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ।

তাঁদের বিরোধিতা এতেই সীমাবদ্ধ রইল না। এক সপ্তাহ পরে আরো ছয় জনের (অর্থাৎ মোট ২৬ জনের) স্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি প্রকাশ পায় আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১ এপ্রিল ১৯৩৭), যেখানে দু-মাস আগেকার গেজেট ঘোষণার প্রতিবাদে বলা হয় : ''...আমরা বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। এই কুপরামর্শ প্রসূত হঠকারিতা পরিচায়ক প্রস্তাবগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত হয় এবং বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় একটা গোলযোগের সৃষ্টির পথ যাহাতে বন্ধ হয়, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকেও অনুরোধ করিতেছি।''

ওই পত্রিকায় একই দিনে একই বিষয়ে আরো একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যার লেখক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তৎকালীন প্রেক্ষপটে চিঠিটি অত্যন্ত মূল্যবান, সে-কারণে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য : ''কয়েকজন বন্ধুর কাছে শুনিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বাংলা বানানে বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, শুনিয়া দুর্ভাবনা হইল, সুতরাং খোঁজ লইলাম ব্যাপারটা কি। বাংলা বানানের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর তৃতীয় সংস্করণের খসড়া পড়িলাম, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই নজরে পড়িল না। বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই নিয়ম রচিত হইয়াছে, বানানে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইয়াছে, মাত্র দুই এক স্থলে সরলতর বানান বিহিত হইয়াছে, যেমন রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন। ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই, প্রচলিত অভ্যাসেও বিশেষ আঘাত দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার সমর্থন করিয়াছেন। নিয়ম রচনার ভার যাঁহাদের উপর দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, বিদ্যারও অভাব নাই। তাঁহাদের প্রস্তাব এতই সংযত ও সহজ যে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার অনুমোদন করিবেন।

''সকলেরই মনঃপূত হয় এমন নিয়ম রচনা অসম্ভব এবং অভ্যস্ত রীতির সামান্য পরিবর্ত্তনেও প্রথম প্রথম কিছু বাধিতে পারে। কিন্তু এই কারণেই যদি গতানুগতিক পন্থা ধরিয়া থাকিতে হয় তবে উন্নতি অসম্ভব। আমার বিশ্বাস বানানের প্রস্তাবিত নিয়মগুলি ভালই হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্র শিক্ষক লেখক সকলেরই উপকার হইবে।''

প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে ওই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের বিরোধীরা যথেষ্ট অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। সেই প্রচার এতটাই ব্যাপক ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর সহায়ক ছিল যে তৃতীয় সংস্করণের খসড়া পড়ার আগে পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্রও দুর্ভাবনার শিকার হয়েছিলেন। অন্য অনেকেরও তখন বিস্তারিত না-জেনেই বিরূপ ধারণা হয়ে থাকতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্র সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। কিন্তু যিনি বা যাঁরা সংস্কৃতের চোখ দিয়ে বাংলা ভাষাকে দেখতে চান তাঁরা এসব কথা মানতে নারাজ। দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁদেরই প্রধান প্রতিভূ। তাঁর মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা আক্রমণাত্মক চিঠিগুলিতে। বিভিন্ন রচনায় ঘোষ মহাশয়ের শানিত

ব্যঙ্গবিদ্রুপের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাবও যথেষ্ট প্রকট। বানান নিয়ে যাঁরা ভাবেন বা আলোচনা করেন তাঁরা এ-সম্বন্ধে অবহিত আছেন। আমরা বরং দেবপ্রসাদের 'বাণান কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক' শীর্ষক প্রবন্ধের (ফাল্গুন, ১৩৪৩-এ রচিত, 'থির বিজুরি' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) কিছু অংশ থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিতে পারি। তিনি অব্যয় শব্দগুলি থেকে বাংলায় বিসর্গলোপের প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় ''রাজশেখর বাবু বলিলেন, ''... কিন্তু 'প্রাতঃ' ত আর অব্যয় নয়। সেখানে ত আপনার এ নিয়ম চলবে না।''

''আমি ত একেবারে স্তম্ভিত। ''চলন্তিকা''-নামক অভিধান যিনি সম্পাদনা করিয়াছেন, বাণান-কমিটিতে দেড় বৎসর ধরিয়া যিনি সভাপতিত্ব করিতেছেন, ভাষার বাণানের নয়া নয়া রুল যাঁহারা জারী করিতেছেন তাঁহাদের যিনি কর্ত্তা, তিনি বলেন কিনা '' 'প্রাতঃ' ত আর অব্যয় নয়!'' আমি বলিলাম, ''বলেন কি রাজশেখর বাবু? 'প্রাতঃ' ত অব্যয়ই।''

''উত্তর হইল, '' 'প্রাতঃ' কি করে অব্যয় হল দেব বাবু? 'প্রাতঃ' মানে ত morning!''

''আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, মানে ত morning ঠিকই বলেছেন; কিন্তু সংস্কৃতে ত শুধু মানে দিয়ে অব্যয় ঠিক হয় না। সংস্কৃতে ' প্রাতঃ' 'সায়ং' 'নক্তং' 'দিবা' এসব বেবাক্ই যে অব্যয় — ব্যাকরণকৌমুদীতে লেখা আছে।''

প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাকরণকৌমুদীতে কী লেখা আছে আর সংস্কৃতে কোনো শব্দকে অব্যয় হিসেবে শনাক্ত করার মাপকাঠি কী, সেসব কি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক? ইংরেজিতে যেমন morning evening night day প্রভৃতি শব্দ noun হিসেবে চিহ্নিত, বাংলায় তেমনই সকাল (প্রাতঃ) সন্ধ্যা (সায়ং) রাত্রি (নক্তং) দিন বা দিবা *বেবাক্ই* বিশেষ্যপদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সংস্কৃতের কুঠারাঘাতে সেগুলোকে বাংলায় আর অব্যয় বানানো যাবে না, তা দেবপ্রসাদবাবু যতই সংস্কৃতের দোহাই পাড়ুন কিংবা রাজশেখরকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে চান-না কেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের এক জায়গায় দেবপ্রসাদবাবু লিখেছেন, ''আচ্ছা, চারু বাবু,... আপনারা বলছেন যে রেফের পরে দ্বিত্ব বানান চলবে না। চলবে না কথাটার মানে কি? ধরুন আমি একখানা বই University-র কাছে পেশ করি approval-এর জন্যে, এবং তাতে লেখা থাকে 'পূর্ব্ব', 'সর্ব্ব', ইত্যাদি। তাহলে সে বাণান আপনার কাটবেন?

''চারু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ''হ্যাঁ, কাটব।''

চারুবাবুর এই মন্তব্যে দেবপ্রসাদবাবুর প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা পরে বলছি। তার আগে দেখে নিই অতৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহার সম্বন্ধে ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্য কী। তিনি একবার বলেন, ''স্ত্রীলিঙ্গে যে ঈ-কার ছাড়া হতেই পারে পারবে না, এমন কথা কে বল্লে?'' এবং 'দিদি' 'ঝি' 'বিবি' প্রভৃতি বানান অনুমোদন করেন, অন্যদিকে সংস্কৃতে 'মেসোপিসে' না-থাকলেও বাংলায় ঈ-কার যুক্ত 'মামী' 'খুড়ী' 'মাসী' 'পিসী' বানান রাখার পক্ষপাতী। দেবপ্রসাদবাবুর লেখায় পাচ্ছি, ''এবার চারু বাবু মরীয়া হইয়া বলিলেন, ''কিন্তু রবি বাবু যে হ্রস্ব-ই-কার দিয়ে 'মাসি' 'পিসি' লেখেন। কোন ছেলে যদি রবি বাবুর

বাণান লেখে তা হলে সেটা কাটি কি করে?"

"আমি আর প্রতিশোধ লইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিয়া ফেলিলাম, "এ কি কথা বল্লেন চারু বাবু, আপনি পাণিনি কাটতে সাহস পান, আর রবি ঠাকুর কাটতে পারবেন না? ঘ্যাচ্ করে কেটে দেবেন।" এ-ক্ষেত্রে পাণিনি কাটার মানে হলো রেফ যুক্ত বর্ণের পূর্বোক্ত দ্বিত্ব কাটার সিদ্ধান্ত।

দেবপ্রসাদবাবুর এই বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন কি না কিংবা জবাবে কে কী বলেছিলেন সেসব তিনি লেখেননি। তবে তাঁকে বলা যেতেই পারত, 'দেখুন, পাণিনি কাটার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে পাণিনির ফোড়া কাটা নিয়ে। কারণ পাণিনি স্বয়ং বিধান দিয়েছেন যে রেফের পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ। আর এই বিকল্পরূপ ফোড়াটা হিন্দি মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় যাঁরা সংস্কৃত শব্দ লেখেন তাঁরা বহু আগেই কেটে ফেলেছেন। বাংলায় কাজটা একটু দেরিতে করা হচ্ছে, এই-যা পার্থক্য। তা ছাড়া, রেফযুক্ত বর্ণমাত্রেরই দ্বিত্ব রাখতেই হবে, নইলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলে যদি আপনারা মনে করেন, তাহলে অর্ক মূর্খ বর্গ অর্ঘ নির্ঝর অর্থ বর্ণ অর্পণ গর্হিত প্রভৃতি এবং এইরকম অসংখ্য শব্দ বিনা দ্বিধায় দ্বিত্বহীন ভাবে লেখেন কেন?'

প্রকৃতপক্ষে সেকালে অন্ধ সংস্কৃতভক্তরা কেউই রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন মেনে নিতে পারেননি। এমন-কি রবীন্দ্রানুরাগী এবং অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মণীন্দ্রকুমার ঘোষেরও একসময়ে দ্বিত্ব বর্জনে আপত্তি ছিল। সেটা জানা যাচ্ছে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা বানান' শীর্ষক লেখা থেকে। মণীন্দ্রকুমারের এ-সম্পর্কিত বক্তব্য নিম্নরূপ : "এই সংস্কারটি না হলে সেকালে বানান-সংস্কার-সমিতির বিরুদ্ধে এতটা প্রবল আন্দোলন হত না। অসংখ্য লেখক (তন্মধ্যে একজন ছিলেন সুনীতিকুমারেরই বৃদ্ধ পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়), প্রায় সমস্ত ইংরেজী বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রের সম্পাদক, এমনকি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ধীরবুদ্ধি রবীন্দ্রানুরাগী মনীষীও এই নিয়মের উপর এমন বিরূপ হলেন যে তৎকালীন বাংলা সরকার এবং খোদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বলতে বাধ্য হলেন যে এই বানান-বিধি অবশ্য-পালনীয় নয়।" ('বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থ, দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২১)

সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তখন যা-ই বলা হোক, ওই লেখার সময়ে অবশ্য মণীন্দ্রকুমার রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে? "তৎকালে আমরা শুনেছিলাম সংস্কার-সমিতি কয়েকজন মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শও গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসেরই অন্যতম কর্মী অজরচন্দ্র সরকার। রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন প্রস্তাবে এই অজরচন্দ্রই নাকি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একথার কোন ভিত্তি আছে কিনা ঠিক বলতে পারব না।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩) প্রকৃতপক্ষে রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাব অজরচন্দ্রই প্রথম করেন 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে লেখা একটি প্রবন্ধে (পৌষ, মাঘ, চৈত্র ১৩৩৯)। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির বিধি প্রণয়নেরও তিন বছর আগে প্রকাশিত ওই প্রবন্ধের (‘বাঙ্গালা টাইপ ও কেস’) প্রথম কিস্তিতেই অজরচন্দ্র লেখেন: ‘‘আর যদি এ কথা খাঁটি সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত হয় যে, রেফের খাতিরে যে ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়, তাহা কেবল মাত্র বিকল্পে, তবে সংস্কৃতের সেই বিকল্প ব্যবস্থাটিকে বাঙ্গালায় জোর করিয়া অবশ্যপ্রতিপালিত বিধি বলিয়া এখনও চালাই কেন? যদি সংস্কৃতের এই বিকল্প বিধান বাঙ্গালা হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়— যেমন সংস্কৃতে ও হিন্দীতে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে— তাহা হইলে সার্চ্চ লাইট জ্বালিয়া সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইবে না...। এই ভাবে নানাবিধ মহোপকার সংসাধিত হইয়া বাঙ্গালা কেস অনেক হাল্কা হইয়া যাইবে, ছেলেমেয়েরা গুরুভার বাণান-মুখস্থর দায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইবে, কম্পোজিটাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে আর আমরা, প্রুফরিডাররা, একটু-বা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব। এই ভাবে টাইপের একটু-আধটু সংস্কার করিবার আশা কি একান্তই দুরাশা?” (নেপাল মজুমদার সম্পাদিত ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত ‘বানান বিতর্ক’ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭)

বেশ বোঝা যায়, অজরচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা কেসের ভার লাঘব। কিন্তু বানান- ও লিপি-সংস্কার না-হলে তো টাইপের সংখ্যা কমানো যাবে না, সেজন্যই তাঁর উক্ত প্রস্তাব। পণ্ডিত বা লেখকরা লিখেই খালাস, সেকালে তাঁরা তো আর জানতেন না যে ইংরেজিতে যেখানে একটি কেসে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৬০টি টাইপ থাকে সেখানে বাংলা ছাপার জন্যে দরকার হয় ৫৬৩টি টাইপ-সংবলিত কেস! মণীন্দ্রকুমারের উল্লিখিত মন্তব্য থেকে মনে হয় যে ইতিপূর্বে ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত অজরচন্দ্রের প্রবন্ধটি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বানান সংস্কার সমিতির অন্যতম সদস্য বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের এক প্রবন্ধের (যা ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকার ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এবং উল্লিখিত ‘বানান বিতর্ক’ গ্রন্থের ১৫৯-১৭৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত) একাংশ (‘‘দ্বিত্ব-বর্জন সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানমতে শুদ্ধ। বস্তুত হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ববর্জিত বানানই সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত। বাংলায় এই রীতি প্রবর্তন করিলে লেখা ও ছাপা সহজ হইবে অথচ ব্যাকরণের দিক্ দিয়াও বানান অশুদ্ধ হইবে না।”) উদ্ধৃত করে মণীন্দ্রকুমার যখন মন্তব্য করেন ‘‘আমাদের মনে হয় রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জনের মূলে যা ছিল তা ঠিক বানান-সংস্কার নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রণ-সৌকর্য।” তখনও তিনি মূল বিষয়টা এড়িয়ে যান। কারণ, প্রথমত, মুদ্রণ-সৌকর্য আর টাইপের সংখ্যা কমানো এক কথা নয়। দ্বিতীয়ত, ওই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রথমে বানান-সংস্কার এক অত্যাবশ্যক শর্ত।

আবার দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য শব্দে দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে নিমরাজি হয়েও কৃত্তিকা শব্দজাত ‘কার্ত্তিক’ বানানই ছিল মণীন্দ্রকুমারের অভিপ্রেত। সংস্কার সমিতির প্রথম সুপারিশে (৮ মে ১৯৩৬) দ্বিত্ব যুক্ত ‘কার্ত্তিক’ ‘বার্ত্তা’ ‘বার্ত্তিক’ বানান ছিল, যা দ্বিতীয় সংস্করণে (২ অক্টোবর ১৯৩৬) প্রত্যাহার করা হয়। এ-সম্বন্ধে বিজনবিহারীর প্রবন্ধে কৈফিয়ত ছিল নিম্নরূপ: (যা মণীন্দ্রকুমারও উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ২৩ দ্রষ্টব্য) ‘‘ ‘কার্ত্তিক বার্ত্তা বার্ত্তিক’ এই তিনটি শব্দের জন্যই দ্বিত্ব-বর্জনের সূত্রটা নির্বিকল্প

হইতে পারিল না বলিয়া রাজশেখরবাবুর মনে একটা অস্বস্তি রহিয়া গেল। এমন সময় বৈয়াকরণ গোবর্ধন শাস্ত্রী মুশকিল আসান করিয়া দিলেন। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন— 'অর্চনা মূর্ছা অর্জুন কর্তা' আদি শব্দে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব যেমন বিকল্পে সিদ্ধ তেমনই 'কার্তিক বার্তা বার্তিক' আদি শব্দেও তা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন।... পাণিনির ব্যাকরণ এই কথাই বলে।" (এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত গোবর্ধনদাস শাস্ত্রীর 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থের ৮০-৮৪ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত।)

এর পরও মণীন্দ্রকুমার সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি লিখেছেন : ''সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর এই প্রবন্ধের লেখক সাক্ষাৎ করেছিল সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসুর সঙ্গে। সসঙ্কোচে রাজশেখরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''কার্ত্তিক শব্দ যখন কৃত্তিকা শব্দজাত তখন 'কার্তিক' বানান কি যুক্তিসঙ্গত?" রাজশেখরবাবু কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন, ''মশাই, সংস্কারই করলাম একটা। আপনারা ইস্কুলমাস্টাররা কিছুই করতে দেবেন না! 'কার্তিক' শব্দ সংস্কৃত অভিধানে আছে। ছেলেরা 'কার্ত্তিক' লিখলে কেটে দেবেন, শূন্য দেবেন, 'কার্তিক'ই একমাত্র বানান।" ('বাংলা বানান', পৃ. ১৮)

রাজশেখরের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন তিনি ছিলেন স্বভাবশান্ত, মিতবাক, মৃদুভাষী, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ধৈর্যের অধিকারী। অকারণে বা অপ্রয়োজনে একটি বাক্যও তিনি ব্যয় করতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি 'কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেই' মণীন্দ্রকুমারের কাছে নিজের মত ব্যক্ত করেছিলেন। অনুমান করতে অসুবিধে নেই যে বসু মহাশয়ের এই স্বাভাবিক চরিত্র-বিরোধী আচরণ নিতান্ত অকারণে নয়, সংস্কার সমিতির প্রথম সূত্রটি নিয়েই প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা সেকালে সবচেয়ে বেশি জল ঘোলা করেন এবং ক্রমাগত অযৌক্তিক বিরূপ সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়েই রাজশেখরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে থাকবে। এটাও বেশ বোঝা যায়, চিত্তরঞ্জনবাবুর যে-মন্তব্যের আধারে এবারকার আলোচনা তার মধ্যে তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় ফুটে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই, আচার্য মণীন্দ্রকুমার উল্লিখিত প্রবন্ধে সংস্কার সমিতির সিদ্ধান্তের শুধু বিরূপ সমালোচনাই করেননি, বরং সুচিন্তিত ব্যাখ্যা দ্বারা বেশকিছু সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন, ইতিবাচক প্রস্তাব-সহ দিয়েছিলেন সমাধানের ইঙ্গিতও, যার কয়েকটা অত্যন্ত যুক্তিসংগত হওয়া সত্ত্বেও একালের বানান-বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। বারান্তরে সেদিকে আলোকপাত করব।

মাত্রাহীন এ-কার, মাত্রাযুক্ত এ-কার : একটি বিকল্প প্রস্তাব

অনেকটা বকবক করা হলো, এখন মূল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। তার আগে আরো দু-একটা কথা সেরে নিই। এই লেখা শুরু করার সময় বলেছিলাম, আমার উদ্দেশ্য আলোচনা, মত বিনিময়, একতরফা ভাষণ দান নয়। যে-পথে চলতে চাইছি সেখানে খানাখন্দ কম নেই। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা একচোখোমি থাকাও অস্বাভাবিক নয়, ফলে প্রতিবন্ধকতাগুলো নজর এড়িয়ে যায়, অনেক সময় চিন্তার অস্বচ্ছতার কারণেও কিছু কিছু বিষয় থেকে যায় অধরা। সচেতন মহলের আলোকপাত সেখানে সহায়ক হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু-চারজনের মৌখিক সমর্থন ছাড়া ত্রুটি নির্দেশের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাইনি। তাই কবির পরামর্শ অনুযায়ী একলাই চলতে হচ্ছে।

অন্তত একটা বিষয়ে মতামত জানতে পারলে সুবিধে হতো। সেটা এ-কার ও এ বর্ণের অ্যা উচ্চারণ-নির্দেশক আমার প্রস্তাবিত দুটি চিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে। এই লেখা শুরু করার সময় দু-একজনের সঙ্গে কথা বলার পর চিহ্ন দুটি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিই। একটা পেট-কাটা এ-কার (শব্দের শুরুতে ে আর মাঝখানে ে) এবং অন্যটা পেট-কাটা এ। তার সাত-আট মাস পরে পলাশ বরন পালের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি পেশায় বিজ্ঞানী হয়েও বাংলা ভাষা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছেন, অনেকগুলো প্রবন্ধও লিখেছেন, তাঁর গোটা চারেক বইয়ে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত। বইগুলো জোগাড় করে পড়ে দেখি, তিনিও বাংলা শব্দে এ-কার ও এ-র অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য নিজের লেখায় সর্বত্র অনুরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। চিহ্ন দুটো দেখতে আমার প্রস্তাবিত চিহ্নগুলোর মতোই। সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। শব্দের শুরুতেও এ-উচ্চারণের জন্য তিনি সব জায়গায় মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহার করেছেন আর অ্যা-উচ্চারণের জন্য পেট-কাটা মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) রেখেছেন। এমন হতে পারে যে টাইপের সংখ্যা না-বাড়ানোর বিবেচনা থেকেই পলাশ বরন বাবু মাত্রাহীন এ-কার বর্জন করে তার জায়গায় ে আমদানি করেছেন, যাতে ওই একটা চিহ্নই শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে ব্যবহার করে এ-কারের অ্যা-উচ্চারণ বোঝানো যায়। আমি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শব্দের শুরুতে মাত্রাহীন এ-কারই ব্যবহার করেছি এবং অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য সেখানে মাত্রাহীন এ-কারের পেট-কাটা চিহ্ন দিয়েছি, মাত্রাযুক্ত এ-কারের পেট-কাটা চিহ্ন ব্যবহার করেছি শুধু শব্দের মাঝখানের অ্যা বোঝানোর জন্য। এরকম করার কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আদ্য এ-কারের অ্যা উচ্চারণ নির্দেশক মাত্রাযুক্ত এ-কারের সঙ্গে কেউ যাতে গুলিয়ে না-ফেলেন। তা ছাড়া, শব্দের শুরুতে বরাবরই মাত্রাহীন এ-কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে, আলাদা মাত্রাযুক্ত এ-কার তৈরি করা হয়েছিল শুধু শব্দের মধ্যে ব্যবহারের জন্য, নইলে এ-কার আর তার আগের বর্ণের মাঝখানে ফাঁক থেকে যায়। আমি এই রীতি অযথা পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই।

দ্বিতীয়ত, পলাশ বরন বাবু নিজের উদ্ভাবিত টাইপ-ফেস ব্যবহার করেছেন। আমার সে-যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই। তা ছাড়া, আমি যে-চিহ্নগুলো ব্যবহারের

প্রস্তাব করেছি তা যাতে সব কম্পিউটারেই পাওয়া যায় এবং সকলেই সহজে কাজে লাগাতে পারেন সেটাও খেয়াল রেখেছি। আমি যেটা করেছি তা হলো, এ-কারের পরে হাইফেন দিয়ে দুটোকে সিলেক্ট করে তারপর 'কন্ট্রোল প্যালেটে' যেখানে উপর-নীচ-ডান-বাঁয়ের চিহ্ন রয়েছে সেখানে বাঁয়ের চিহ্নে কয়েকবার ক্লিক করে হাইফেনটা এ-কারের ঠিক মাঝখানে জুড়ে দেওয়া। একইরকম ভাবে এ-র পরে হাইফেন দিয়ে তার পর সে-দুটো সিলেক্ট করে জুড়লেই এ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ পলাশ বরন বাবুর উদ্ভাবিত টাইপ-ফেস আর আমার অনুসৃত পন্থার পরিণাম মোটামুটি একই দাঁড়াবে। এখানে আরেকটা কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। হাতের লেখায় কোনো সমস্যা না-হলেও উল্লিখিত পদ্ধতিতে কম্পিউটারে যোজন-প্রক্রিয়ায় প্রতিটি চিহ্ন ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় লাগে। চিহ্নগুলো ঘন ঘন ব্যবহারের প্রয়োজন হলে যিনি কম্পোজ করবেন তাঁর মোট সময়ও তাই অনেকটাই বেশি লাগতে পারে। এই সমস্যার একটাই সমাধান— ে, ে, এ চিহ্ন তিনটে একবার তৈরি করে নিয়ে কম্পিউটারের পৃষ্ঠার মার্জিনে রেখে দিয়ে যখন যেখানে যেটা দরকার সেখানে কপি করে বসিয়ে দেওয়া। তাহলে আর বাড়তি সময় লাগবে না।

তৃতীয়ত, পলাশ বরন বাবুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে টাইপ-ফেস প্রস্তুতকারক বিভিন্ন সংস্থা অদূর ভবিষ্যতে হাইফেনযুক্ত এ-কার ও এ-র জন্য দুটো নতুন টাইপ প্রবর্তন করবে এমনটা এই মুহূর্তে আশা করা যায় না। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। এটা নেহাতই কাকতালীয় যে, পলাশ বরন বাবুর উদ্ভাবিত দুটি চিহ্ন আমার প্রস্তাবিত রূপগুলির সঙ্গে মিলে গেছে। এবং তিনি নিজের বইগুলিতে সর্বত্র চিহ্ন দুটি ব্যবহার করায় আমি এখন আগের চেয়েও বেশি উৎসাহ বোধ করছি, দুটি চিহ্নেরই ব্যাপক ব্যবহারও চাইছি। কিন্তু এটা এমন এক বিষয় যা দু-একজনের ইচ্ছায় কার্যকর হওয়া অসম্ভব। সে-কারণে এই লেখায় শুধু উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য চিহ্ন দুটি ব্যবহার করে আমি বলেছিলাম, অনেকের সমর্থন পেলে তবেই এগুলো লেখার সব জায়গায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমাদের অনুরোধ, বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং যাঁরা লেখালিখি করছেন তাঁদের একাংশ যদি উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করেন তাহলে দয়া করে সেটা জানান, যাতে দীর্ঘকালীন সমস্যা থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে।

আর-একটা কথা বলা দরকার। এ-ব্যাপারে আমরা-যে অভিনব কিছু করতে চাইছি তা-ও নয়। আগে খেয়াল হয়নি (কিংবা অনেক বছর আগে পড়েছি বলে ভুলে গিয়েছিলাম), এই লেখার সময় হঠাৎ নজরে এল যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'লিপিসংস্কার বিষয়ে গঠিত উপ-সমিতি' প্রস্তাব করেছিল, ''প্রয়োজনবোধে এ অক্ষরটিকে 'অ্যা' স্বর-এর জন্য রাখা চলতে পারে। স্বরচিহ্ন হিসেবে ে থাকতে পারে। অ্যাসিড = এসিড ; ক্যালকুলেশন = কেলকুলেশন।'' অথচ, কী কারণে তা জানা নেই, আকাদেমির

পরবর্তী ‘লিপি-বিষয়ে সিদ্ধান্ত’ ঘোষণার সময় ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি আর বিবেচিত হয়নি, তাদের বানান অভিধানে এর অনস্তিত্বই তার প্রমাণ। ইতিপূর্বে এই লেখায় জানিয়েছি, অ্যা উচ্চারণের জন্য রাজশেখর বসুর প্রস্তাবিত বর্ণ চলেনি এবং সম্ভবত চলবে না অনুমান করেই তিনি প্রচলিত অ্যা ব্যবহার অব্যাহত রাখার কথা বলেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, পবিত্র সরকারও একসময়ে ‘বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ বইয়ে অ্যা-র জন্য একটা নতুন বর্ণের রূপ পেশ করেছিলেন, সেটাও চলেনি। যা-ই হোক, আপাতত যা মনে হচ্ছে তাতে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরে বহুদিন ধরে প্রচলিত অ্যা-তে (অ্যাকশন অ্যাকাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার প্রভৃতি) এবং সেইসঙ্গে ্যা-যুক্ত বানানে (ক্যালকুলেশন ক্যাটারিং ব্যাটারি প্রভৃতি) আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া না-করাই ভালো। বিশেষ করে ওইসব শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখেই যখন অ্যা আর ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে। আকাদেমির শেষতম সিদ্ধান্তেও সেটাই ঘোষিত। কিন্তু বাংলা শব্দের এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ অ্যা) বোঝানোর জন্য শব্দের শুরুতে ৻ (যেমন ৻বলা), মধ্যে ৼ (যেমন ছেলেৼবলা বা ছেলেৼখলা) আর এ-র বক্র উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এ (যেমন এক একা বা একটা) ব্যবহার করলে সেটাকে একদিকে যেমন দারুণ ‘বৈপ্লবিক’ সংস্কার বলা যাবে না, অন্যদিকে তেমনই নতুন টাইপ-ফেস না-বানিয়েও এখনকার কম্পিউটারে প্রয়োগ করা সম্ভব। এভাবে বাংলা আকাদেমির উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-পূর্ববর্তী ‘প্রস্তাব’ও অনেকটাই বাস্তবায়িত হতে পারে। তা ছাড়া, অনেক সময় নতুন ধ্বনি প্রকাশের জন্য নতুন হরফ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, যেমন ইংরেজি st-র উচ্চারণ বাংলায় প্রতিফলিত করার জন্য স্ট বানানো হয়েছিল। কিন্তু এ-কার ও এ-র বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় নতুন নয়, কয়েক শতাব্দ ধরেই চলে আসছে, অবশ্য এই উচ্চারণের পার্থক্য লিখিতভাবে বোঝানোর সর্বজনমান্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখন সেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং ৻ ৼ ও এ ব্যবহার করাই সহজতম পন্থা বলে আমাদের মনে হয়।

আকাদেমি, সংসদ অভিধান প্রকাশের তিন দশক পর

এবার বানানের রাজ্যে প্রবেশ করা যাক। গত একশো বছর ধরে বিষয়টা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন, ধাপে ধাপে সংস্কারও হয়েছে। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' আর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বই দুটো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, আমাদের পথপ্রদর্শকও বটে। তিনি যেভাবে এই ভাষার স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন, প্রথাগত ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ভাষার অন্দরমহলে প্রবেশ করেছেন এবং শ্রমাক্ত কর্ষণের ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা এককথায় নজিরবিহীন। এত বছর পরেও তাই আমাদের বারেবারেই তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়। আর তিনি উদ্যোগ না-নিলে তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক.বি.) প্রথম বানান সংস্কারটাই হতো না। ইতিমধ্যে ৮৭ বছর পার হয়ে গেছে, ফলে ভাষার ব্যবহার, বানান ও উচ্চারণেও নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে। গত শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় একটি বানান-সমিতি গঠন করে (ক.বি.-২) সংগত কারণেই আরো একবার বানান সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েছিল। ওই সমিতির ১৯৮০ সালের কয়েকটি প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং একালেও অনুসরণযোগ্য, অথচ ক.বি.-২ মাঝপথেই বিদায় নিল।

এই প্রেক্ষাপটে নব্বইয়ের দশকে একক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নতুন করে বানান সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়, এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত আশির দশকের শেষদিকে। ওই সময়ে একটা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ার পর আধুনিক বানানের অভিধানের অভাব আমি বিশেষভাবে অনুভব করি। তার কারণ, প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলির কালোপযোগী সংস্কার হয়নি, অতৎসম শব্দের বানানে সেখানে আগের মতোই ঈ-কার ও ঊ-কারের ছড়াছড়ি। এমন-কি রবীন্দ্রনাথ অতৎসম শব্দে যে-ধরনের বানান চেয়েছিলেন এবং তাঁর রচনাবলিতে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তারও কোনো প্রতিফলন ঘটেনি ওইসব অভিধানে। সুতরাং একালের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন বিধি রচনা আর তার ভিত্তিতে আলাদা করে শুধুই বানানের অভিধান প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি ছিল বলেই আমার মনে হয়। সুখের বিষয়, অনেকেই তখন এ-কাজে এগিয়ে এলেন। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে সাহিত্য সংসদ (এর পর সংক্ষেপে সংসদ হিসেবে উল্লেখ করা হবে) থেকে প্রকাশ পায় রমেন ভট্টাচার্যের 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম'। মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার বই, তার মধ্যেই কিছু নিয়ম ও শব্দের বানান দেওয়া হয়েছে। সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং সূত্রপাত বলা যেতে পারে, তবে তখনও একটা বড়সড় বানানের অভিধানের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার (আ.বা.প.) পক্ষ থেকে এপ্রিল ১৯৯১-এ বেরোল 'কী লিখবেন কেন লিখবেন'। সেটাও আকারে ছোট, অল্প কিছু শব্দ সংবলিত। অধিকন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কী লিখবেন' নির্দেশ দেওয়া হলেও 'কেন লিখবেন' তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে পাওয়া গেল অরুণ সেনের 'বানানের অভিধান/বাংলা বানান

ও বিকল্প বর্জন'। সেখানে বানান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং বেশকিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ না-হলেও বইটিতে সন্নিবিষ্ট শব্দের সংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রকৃতার্থে এটাই বাংলা বানানের প্রথম অভিধান। ওই বইয়ের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হয়। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণে (এপ্রিল ১৯৯৬) সমালোচকদের কিছু-কিছু বক্তব্য লেখক মেনে নেন, কয়েকটি বিষয়ে নিজের প্রস্তাবের সপক্ষে কৈফিয়ত ও যুক্তি পেশ করেন। তার এক বছর পরে (এপ্রিল ১৯৯৭) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (এর পর প.বা.আ. বা আকাদেমি হিসেবে উল্লেখ করা হবে) প্রকাশ করল মাঝারি মাপের একটা বানানের অভিধান। ধাপে ধাপে ওই সংস্থার বানানবিধি ও অভিধানের সংস্কার হয়েছে, শেষতম ষষ্ঠ সংস্করণে প্রয়োজনীয় প্রায় সব শব্দই স্থান পেয়েছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে সংসদ থেকে প্রকাশিত হলো অশোক মুখোপাধ্যায়ের বানান অভিধান। সেটাও আকারে বেশ বড়, আকাদেমির অভিধানের বানান আর সংসদের অভিধানের বানানে পার্থক্যও বেশি নয়। কিন্তু দু-তিনটি বিষয় ওইসব সংস্থার বিধিতে অনুপস্থিত, ফলে বানানেও তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। আগেকার কিছু যুক্তিসংগত প্রস্তাব তথা পরামর্শও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তা ছাড়া, আ.বা.প., অরুণ সেন, আকাদেমি ও সংসদের অভিধানগুলি প্রকাশের পরে পঁচিশ-তিরিশ বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ভাষার স্বাভাবিক নিয়মেই আরো কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটে চলেছে এবং সেইসব পরিবর্তনকে মান্যতা দেওয়ারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বেশকিছু বানানের ক্ষেত্রে বিকল্প বর্জন করা যায় কি না সেটাও বিবেচনা করতে চাইছি। আর আমরা যদি মনে রাখি যে বাংলা ভাষায় নিয়ত নতুন নতুন শব্দ যোগ হয়ে চলেছে, বানান ও উচ্চারণেও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে তাহলে তার গতিশীলতার স্বার্থে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ বছর পর পর বানান ও উচ্চারণ সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন করে আলোচনাও নিশ্চয় জরুরি।

বলা বাহুল্য, এ-সম্পর্কিত আলোচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক.বি.) বানান সংস্কারের ১৯৩৫-৩৬ সালের প্রথম উদ্যোগকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যাবে না, কারণ পরবর্তী সংস্কারগুলিরও ভিত্তি সেটাই। এ-কথাও সত্যি যে সেকালে ওই সংস্কারের যতই বিরোধিতা করা হোক, সেখানে শুধু 'মধ্যপন্থা' অবলম্বনই নয়, যথেষ্ট সমঝোতাও করা হয়েছিল। বিশেষ করে অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে। অতৎসম শব্দে ই-কার সুপারিশ করেও প্রচুর শব্দে বিকল্পে ঈ-কার ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছিল। এমন-কি ''অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে'' বলেও ''যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে'' জানানো হয়েছিল (৭ নং বিধি)। শুধু তা-ই নয়, একালে 'রানি' বানান প্রচলিত হলেও তখন ঈ-কার যুক্ত 'রানী' অনুমোদন করে বলা হয়েছিল ''বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।'' সুনীতিকুমার এই শেষোক্ত বিকল্পটি সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে জানিয়েছিলেন, ''নচেৎ পণ্ডিতমশায়রা আত্মহত্যা করতেন।'' (মণীন্দ্রকুমারের 'বাংলা বানান' গ্রন্থের পৃ. ৩৮) অর্থাৎ পণ্ডিতমশায়দের আত্মহত্যার হুমকিতে বিচলিত হয়েই ক.বি.-র বানান সমিতির সদস্যগণ বহু বিকল্প রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। আক্রমণ

আগের মতোই চলেছিল, যার কিছু-কিছু এই রচনায় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সূত্রে আরেকটা কথা বলা দরকার। সংস্কৃতপ্রেমী প্রতিবাদকারীরা যতই প্রচার করে থাকুন যে সেকালে তৎসম শব্দের বানানে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না, বাস্তব অবস্থা তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে কি? খোদ মণীন্দ্রকুমার জানিয়েছেন যে সংস্কৃতে 'ভ্রুকুটি' শব্দটির আটরকম বানান পেয়েছেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪১)। আবার, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী ম্-এর সঙ্গে অন্তঃস্থ্-ব যুক্ত হওয়ায় যেসব শব্দে অনুস্বার দেওয়ার কথা সেরকম বহু শব্দে তখনকার বহু সংস্কৃতজ্ঞ অবলীলায় ম্ব ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ— অবিসম্বাদিত অসম্বৃত কিম্বদন্তী কিম্বা প্রিয়ম্বদা বশম্বদ বারম্বার সম্বরণ সম্বৎ সম্বৎসর সম্বর্ধনা সম্বলিত সম্বাদ সম্বিৎ সম্বৃত প্রভৃতি অশুদ্ধ বানান। (একালেও-যে কেউ-কেউ 'সংবর্ধনা'-র পরিবর্তে 'সম্বর্ধনা' লেখেন তার প্রমাণ তো 'কবিসম্মেলন' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধেও তুলে ধরা হয়েছে।) অধিকন্তু, সংস্কৃতে প্রায় শ-দুয়েক শব্দে ই-কার ও উ-কারের বিধান থাকলেও সেকেলে পণ্ডিতদের অধিকাংশই বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতি উপেক্ষা করে নির্বিচারে ঈ-কার ও ঊ-কার চালিয়েছেন। ওই ধরনের পণ্ডিতদের একাংশ একালেও সরব। তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বানান সমিতির (ক.বি.-২) ১৯৭৮-৭৯ সালের প্রস্তাবে এবং পরে আকাদেমি আর সংসদ তাদের বিধিতে যেসব তৎসম শব্দে সংস্কৃতেই হ্রস্বস্বরের বিধান রয়েছে সেগুলিতে হ্রস্বস্বর অনুমোদন করায় প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ। ওইসব শব্দের কয়েকটিতে (অন্তরিক্ষ কিংবদন্তি গাণ্ডিব প্রভৃতি) আ.বা.প.-ও ই-কার অনুমোদন করেছে, অথচ ওই সংস্থার পত্রপত্রিকায় অন্যান্য বহু শব্দে সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরের বিধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘস্বরই ব্যবহার করা হয়। যেমন, অবনি আবলি ধমনি ধরণি প্রভৃতির পরিবর্তে অবনী আবলী ধমনী ধরণী। তা ছাড়া, বানানের ক্ষেত্রে আ.বা.প.-র ব্যবহারবিধির অন্তর্ভুক্ত বেশকিছু বানান তাদের পত্রপত্রিকায় আদৌ অনুসরণ করতে দেখা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে সে-দৃষ্টান্ত পেশ করব।

রেফযুক্ত বর্ণে দ্বিত্ব বর্জন সংক্রান্ত ক.বি.-র বিধি (১ নং) নিয়ে এখন বোধহয় আর কোনো দ্বিমত নেই। তবে এটা লক্ষ করা গেছে যে টেলিভিশনের পর্দায় এবং বিজ্ঞাপনে একালেও প্রচুর ভুল বানান সহ রেফের সঙ্গে দ্বিত্বযুক্ত বানান চালানো হচ্ছে। তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে, আমাদের প্রজন্মে তো বটেই, পরবর্তী প্রজন্মেরও বহু পাঠ্য বইয়ে কর্ম্ম ধর্ম্ম ইত্যাদি বানানই শোভা পেত। ফলে শিক্ষার্থীরাও সেইভাবেই শিখেছে। ক.বি.-র সুপারিশপত্রে বলা হয়েছিল, ''সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে... এখন কয়েক বৎসর... কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।'' কিন্তু সেটা-যে কয়েক বৎসরের পরিবর্তে বেশ কয়েক দশক ধরে চলবে তা বোধহয় বিধানকর্তারা ভাবতেও পারেননি। যা-ই হোক, আপাতত এ-ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করবার আছে?

ক.বি.-র (সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে) দ্বিতীয় নিয়মে 'সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার' শিরোনামে বলা হয়েছিল, ''যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা

বিকল্পে ঙ্ বিধেয়।" অর্থাৎ অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগত, সংগম, সংগীত, সংঘটন, হৃদয়ংগম ইত্যাদির সঙ্গে অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, শুভঙ্কর, সঙ্খ্যা, সঙ্গত, সঙ্গীত, সঙ্ঘটন, হৃদয়ঙ্গম প্রভৃতি লেখারও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। এখন আমাদের মনে হয়, এত বিকল্প যদি রাখতেই হয় তাহলে আর নিয়ম রচনার কী দরকার ছিল? অথচ যুক্তবর্ণের পরিবর্তে সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত অনুস্বার অনুমোদন করার ফলেও ("ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।") সেকালে ক.বি.-কে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। মজার কথা হলো, 'সঙ্খ্যা'-র পরিবর্তে 'সংখ্যা' বহুদিন ধরেই লেখা হয়ে আসছিল, তা সত্ত্বেও অহংকার, শংকর, সংকট, সংগীত প্রভৃতি শব্দে অনুস্বার দেওয়ার বিধান থাকলে এর পর নাকি সকলেই যেখানে-সেখানে যুক্তাক্ষর ভেঙে অনুস্বার দেওয়া শুরু করবে, অংক অংগ গংগা পংক বংগ শংকা সংগ (বা সংগে) এসব তো লিখবেই, সেইসঙ্গে অণ্ড পণ্ড পণ্ডিত প্রভৃতির পরিবর্তে 'অংড' 'পংড' পংডিত' প্রভৃতিও লিখবে— এটাই ছিল বিরোধী পক্ষের যুক্তি।

এই যুক্তি ধোপে টেকে না তিনটি কারণে। এক. ক.বি.-র বিধিতেই পরিষ্কার করে এ-কথাও বলা হয়েছিল, "'গংগা, সংগে' ইত্যাদি হইবে না, কারণ শব্দের পূর্বে ম্-কারান্ত পদ নাই।" অর্থাৎ যেসব শব্দে ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসেবে অনুস্বার আসেনি সেখানে যুক্তবর্ণ ভাঙার প্রশ্নটাই অবান্তর। দুই. উক্ত বিধিতে আরো বলা হয়েছিল, "সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা— 'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম-অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে," আর ঠিক এই কারণে উচ্চারণভিত্তিক 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'-ই অনুমোদন করা হয়েছিল। বাংলায় ঙ্ ও ং-এর উচ্চারণ অনুরূপ হলেও ঞ ও ম্-এর পরিবর্তে অনুস্বার উচ্চারিত হয় না। সেজন্যই সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অনুস্বার প্রয়োগ শুদ্ধ হলেও সম্বন্ধ সম্বল সম্বোধন প্রভৃতি শব্দে বাংলায় উচ্চারণ-অনুসারী ম্ব যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তিন. হিন্দিতে শুধু 'অংক, শংকা'-ই নয়, অণ্ড খণ্ড পণ্ড পণ্ডিত প্রভৃতি বানানও ং দিয়ে লেখা হয়। কিন্তু বাংলায় সেরকম করা অসম্ভব, কারণ 'ন' (বা ণ)-এর উচ্চারণের সঙ্গে অনুস্বারের উচ্চারণের কোনো মিল নেই।

ক.বি.-২ এবং আরো কেউ-কেউ অবশ্য সমতার খাতিরে অঙ্ক, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি বেশকিছু শব্দে অনুস্বারযুক্ত অংক, অংগ, বংগ প্রভৃতি বানান সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু ওইসব তৎসম শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করে বলে পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত হয়নি। আকাদেমি, সংসদ-এর বানানবিধি ও অভিধানে সেগুলো 'পরিহার্য' বলা হয়েছে। অঙ্কুশ আকাঙ্ক্ষা কঙ্কাল পঙ্ক ভঙ্গ রঙ্গ শঙ্কা সঙ্গ প্রভৃতি বানানেও তাই অনুস্বারের স্থান নেই। পক্ষান্তরে অনুমোদন করা হয়েছে অহংকার ভয়ংকর শংকর সংকট সংকর প্রভৃতি ব্যাকরণসম্মত তথা যুক্তাক্ষর বর্জিত সরল বানান। অরুণ সেনও একই মতাবলম্বী এবং তাঁর অভিধানেও দুটি ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটেছে। মজার কথা হলো, আ.বা.প.-র

ব্যবহারবিধির অন্তর্গত ‘লেখক ও সম্পাদকের অভিধান’-এও সংকট সংকর সংকীর্ণ, সংকোচ সংকুচিত সংকোচন সংকুলান সংকেত সংগত সংগতি প্রভৃতি বানান অনুমোদিত এবং ‘ঙ্ক’ ‘ঙ্গ’ বর্জনীয় বলা হয়েছে, কিন্তু ওই সংস্থার পত্রপত্রিকায় শব্দগুলির যুক্তবর্ণ সংবলিত বানানই বেশি চোখে পড়ে। অর্থাৎ আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিয়ম তথা বানান নিজেরাই অনুসরণ করছেন না। সাফাই হিসেবে কেউ-কেউ বলার চেষ্টা করেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সঙ্কট সঙ্কর সঙ্কেত সঙ্গত সঙ্গীত ইত্যাদি বানান তো ভুল নয়, বিকল্পে চলতে পারে। আমাদের বক্তব্য, একই যুক্তিতে তো রেফের সঙ্গে দ্বিত্বযুক্ত কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রভৃতি বানানও লেখা যায় (যেহেতু বিকল্পে সিদ্ধ), আ.বা.প. এবং আরো কয়েকটি পত্রিকা তাহলে সেগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না কেন? শুধু সংকট সংকেত ইত্যাদির ক্ষেত্রেই তাদের এখনও যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারের কারণ কী? সেটা কি পেছন ফিরে চলা নয়? শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনায় সর্বত্র ‘সংগীত’ বানান থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকেই সেইভাবে লিখলেও কোনো-কোনো পত্রিকা ছাপার সময় ‘রবীন্দ্রসংগীত’-কে ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ বানিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না।

বানানবিধিগুলিতে এ-জাতীয় তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে দুটো বিষয়ই পরিষ্কার করে বলা আছে। (১) সন্ধির পরিণাম হিসেবে ম্-এর স্থানে ঙ্ এলে শুধু ক-বর্গে যুক্তব্যঞ্জনের পরিবর্তে অনুস্বার দেওয়া হোক, যেহেতু ঙ্ ও ং-এর উচ্চারণ এক এবং বানানও সরল হয়। (২) যদি পূর্বপদে ম্-র সঙ্গে সন্ধি না-হয়ে থাকে তাহলে যুক্তাক্ষর ভেঙে ঙ্-র স্থানে ং বসানো যাবে না। কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে, উক্ত দুটি বিষয়ে সাম্প্রতিক কালের চারটে বানানবিধিতে অনুমোদিত এবং বানানের অভিধানগুলিতে সন্নিবিষ্ট বানান এখনও অনেকেই মেনে চলেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন্ কোন্ শব্দে ব্যাকরণসম্মত হওয়ার কারণে অনুস্বার অভিপ্রেত আর কোন্ কোন্ শব্দে যুক্তবর্ণ ব্যবহারই সংগত সেটা সবসময় জানা না-থাকলে কী করা হবে? জানা না-থাকতে পারে, লেখার সময় সংশয় দেখা দেওয়াও স্বাভাবিক, সেসব ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান— আধুনিক বানানের অভিধানের সাহায্য নেওয়া।

তৎসম শব্দে যুক্তবর্ণের পরিবর্তে অনুস্বার ব্যবহারের প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা দরকার। রাজশেখর বসুর অভিধান ‘চলন্তিকা’য় বলা হয়েছে, ‘‘সন্ধির নিয়ম অনুসারে ম্+অন্তঃস্থ ব = ংব, ... সেজন্য ংব শুদ্ধ, ম্ব অশুদ্ধ’’। এইরকম শব্দের তালিকায় রয়েছে— অসংবৃত কিংবদন্তি কিংবা প্রিয়ংবদা বশংবদ বারংবার সংবৎ সংবৎসর সংবরণ সংবর্ধনা সংবলিত সংবাদ সংবিৎ সংবিধান সংবেদন স্বয়ংবর প্রভৃতি। মণীন্দ্রকুমার ঘোষও জানিয়েছেন, ‘‘‘কিম্বা, কিম্বদন্তী, এবম্বিধ, প্রিয়ম্বদা, বশম্বদ, বারম্বার, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বর্ধনা, সম্বাদ, স্বয়ম্বর’ প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ, কারণ এইসমস্ত শব্দের ব অন্তঃস্থ; ...’’ আর তার পর শব্দগুলির অনুস্বারযুক্ত শুদ্ধ বানানগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। (‘বাংলা বানান’, পৃ. ৬১) এই নিয়ম এখনও সকলেই মেনে চলেছেন এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে আকাদেমি, সংসদ ও অরুণ সেনের বানানের অভিধান এবং আ.বা.প.-র ‘লেখক ও

সম্পাদকের অভিধান'-এও। অথচ ঘটনা এই যে, অতীতে তো বটেই, একালেও কেউ-কেউ ওইরকম কয়েকটি শব্দের বানানে অনুস্বারের পরিবর্তে স্ব ব্যবহার করেন। এ-বিষয়ে তাই সচেতনতা কাম্য।

বানানবিধির প্রথম দুটি সংস্করণে ক.বি.-১ প্রস্তাব করেছিল— ''বাংলা বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে ; যথা— আয়ু, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, প্রধানত, বিশেষত ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে হইবে ; যথা— আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, সদ্যোজাত ইত্যাদি।'' কিন্তু সমিতির ১৯৩৭ সালের তৃতীয় সংস্করণে নিয়মটি স্থান পায়নি। এই বিসর্গ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সেকালে সংস্কৃতজ্ঞদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালের বিভিন্ন বানানবিধিতেও সেটাই অনুমোদিত, সেইসঙ্গে মাঝখানের বিসর্গ অবিকৃত আর বিসর্গ-সন্ধির নিয়ম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্তত, বস্তুত, সম্ভবত, সাধারণত প্রভৃতি শব্দ বিসর্গহীন হয়েই একালে সর্বত্র শোভা পাচ্ছে। সুনীতিকুমার এরকম কয়েকটি শব্দে শেষের বিসর্গের পরিবর্তে ও-কার দিতেন, কিন্তু সেটাও গৃহীত বা প্রচলিত হয়নি।

একই রকম ব্যাপার ঘটেছে বেশকিছু সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য হসন্তের ক্ষেত্রেও। ক.বি.-১ নীরব থাকলেও ক.বি.-২ এবং রবীন্দ্রনাথ সহ আধুনিক লেখকরা আপদ্ বিপদ্ মহান্ ভগবান্ গুণবান্ বুদ্ধিমান্ দিক্ পৃথক্ বণিক্ বিরাট্ সম্যক্ প্রভৃতি শব্দের হসন্তবর্জিত রূপই ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-ক্ষেত্রেও সংস্কৃত পণ্ডিতদের আপত্তি ছিল এবং হসন্ত বাদ দিলে সন্ধি-সমাসে ভুল হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তী বানান-বিশেষজ্ঞগণ তাই শেষের হসন্ত বর্জন করেও বিসর্গের ক্ষেত্রে যা অনুমোদিত ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত হসন্তযুক্ত শব্দগুলির সন্ধি-সমাসে ব্যাকরণসম্মত রূপই বজায় রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্তরিন্দ্রিয় পৃথগন্ন বিপদুদ্ধার প্রভৃতিকে আমরা আস্ত শব্দ হিসেবে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত, সন্ধি-সমাসের কথা বিশেষ ভাবি না, যেমন আবিষ্কার তিরস্কার বিপজ্জনক মনোযোগ সদ্যোজাত ইত্যাদি শব্দের বেলায় সাধারণত করে থাকি। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে ব্যাকরণের নিয়মগুলো জেনে নিলে কিছুটা বাড়তি সুবিধে হয়। না-জানলে কী হয় তার উদাহরণ মণীন্দ্রকুমার দিয়েছেন : ''হস্-চিহ্নের অমনোযোগিতায় 'ষড়্যন্ত্র, ষড়্দর্শন, ষড়্বিধ, ষড়্রিপু' প্রভৃতি শব্দ পণ্ডিতেরাও ভুল উচ্চারণে পড়েন।'' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪) ভুল উচ্চারণে পড়ার কারণ, এইসব শব্দ থেকে মাঝখানের হসন্ত লেখায় বিলুপ্ত হওয়া, কয়েকটি অভিধানে এগুলোর হসন্তবর্জিত বানানই দেখা যায়, ফলে ড়-এর উচ্চারণ স্বরান্ত হয়ে গেছে। আমরা এখন ষড়যন্ত্র, ষড়রিপু লিখি আর উচ্চারণ করার সময় ড়-তে হ্রস্ব-ও প্রয়োগ করি।

অভিধানে হসন্ত বিলোপের ফলে ড়-এর উচ্চারণ স্বরান্ত, না কি স্বরান্ত উচ্চারণের অভ্যাসের পরিণামে অভিধানে হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে— সে-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিভিন্ন অভিধানে কী লেখা আছে সেদিকে একটু নজর দেওয়া যাক। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো অভিধান এ-ব্যাপারে আমাদের

বিশেষ সহায়ক হবে না, কারণ সেগুলোতে হসন্তযুক্ত সংস্কৃত বানানই স্থান পেয়েছে। ‘চলন্তিকা’য় ‘ষড়্যন্ত্র’ বা ‘ষড়যন্ত্র’ শব্দ নেই, তবে অনুরূপ অন্যান্য কয়েকটি শব্দ (ষড়্ঋতু, ষড়্জ, ষড়্দর্শন, ষড়্ধা, ষড়্বিধ, ষড়্ভুজ, ষড়্রস, ষড়্রিপু) হসন্তযুক্ত (নতুন সংস্করণ ১৪২১, পৃ. ৬৬৪)। একালের অভিধানগুলির মধ্যে অরুণ সেনের বানানের অভিধানে ষড়ঋতু, ষড়জ, ষড়দর্শন, ষড়বর্গ, ষড়ভুজ, ষড়যন্ত্র, ষড়রিপু প্রভৃতি বানান সুপারিশ করে ‘ড়্’ বর্জন করতে বলা হয়েছে (দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ২৪২)। সংসদ থেকে প্রকাশিত সুভাষ ভট্টাচার্যের ‘বাংলা উচ্চারণ অভিধান’-এ ‘ষড়যন্ত্র’ই একমাত্র বানান আর তার উচ্চারণ ‘শড়োজন্ত্রো’, কিন্তু ওইজাতীয় অন্য কয়েকটি শব্দের হসন্তহীন ও হসন্তযুক্ত দুরকম বানান এবং সেইসঙ্গে দুরকম উচ্চারণ প্রদর্শিত (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৩৭০)। আ.বা.প.-র বানানবিধির অন্তর্গত সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা ‘লেখক ও সম্পাদকের অভিধান’-এ ‘ষড়্ঋতু, ষড়্দর্শন, ষড়্রিপু, ষড়্বর্গ’ প্রভৃতি বানানের পরে ‘ষড়্যন্ত্র, ষড়যন্ত্র’ লিপিবদ্ধ করে মন্তব্য দেওয়া হয়েছে, ‘‘ব্যাকরণমতে প্রথমটি শুদ্ধ হলেও দ্বিতীয়টি বাংলায় বহুলপ্রচলিত।’’ (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ১৭০) আকাদেমির বানান অভিধানে ‘ষড়যন্ত্র’-কে ‘প্রচলনে সিদ্ধ’ বলা হয়েছে এবং সেই কারণে হসন্তহীন ষড়যন্ত্রকারিণী ষড়যন্ত্রকারী ষড়যন্ত্রমূলক ষড়যন্ত্রী প্রভৃতি বানান সুপারিশ করা হয়েছে। ‘ষড়দর্শন’ বানানও হসন্তহীন, কিন্তু তার কারণ অনুপস্থিত, যদিও এই বানানেও প্রচলনকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তবে সেখানে অনুরূপ অন্য কয়েকটি শব্দ হসন্তযুক্ত, যথা— ষড়্ঋতু, ষড়্গুণ, ষড়্জ, ষড়্ধা, ষড়্বর্গ, ষড়্বিধ, ষড়্বিন্দু, ষড়্ভুজ/ষড়্ভুজা (পঞ্চম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৪৬২)। অশোক মুখোপাধ্যায় সংকলিত সংসদ-এর বানান অভিধানে ষড়দর্শন, ষড়যন্ত্র (এবং সেইসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী, ষড়যন্ত্রমূলক, ষড়যন্ত্রী), ষড়রিপু সহ এই ধরনের কোনো শব্দেই হসন্ত নেই (তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃ. ৬৫৫)। পক্ষান্তরে দে’জ পাবলিশিং (কলকাতা) প্রকাশিত জামিল চৌধুরীর ‘শব্দসংকেত’ অভিধানে ষড়্দর্শন, ষড়্যন্ত্র (এবং সেইসঙ্গে ষড়্যন্ত্রমূলক, ষড়্যন্ত্রী) সহ এ-জাতীয় সব ক-টি শব্দেই হসন্ত রয়েছে, উচ্চারণেও হসন্ত দেখানো হয়েছে (প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪১৬, মে ২০০৯, পৃ. ১১৬০-৬১)। আর নরেন বিশ্বাস ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘বাঙলা উচ্চারণ অভিধান’-এ ‘ষড়্দর্শন, ষড়দর্শন’ ও ‘ষড়্যন্ত্র, ষড়যন্ত্র’ সহ এই ধরনের সমস্ত শব্দে হসন্তযুক্ত ও হসন্তহীন বানান যেমন রেখেছেন, তেমনই উচ্চারণও দুরকম দেখানো হয়েছে (দ্বিতীয় সংস্করণের ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৮/নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৪৪৭)। এ-ছাড়া, পবিত্র সরকারের ‘বানান-বিবেচনা’ বইয়ে ষড়্ঋতু, ষড়্গুণ, ষড়্জ, ষড়্দর্শন, ষড়্দারুক, ষড়্ধা, ষড়্বিধ ইত্যাদি শব্দের পরে ‘ষড়যন্ত্র, ষড়রিপু’ বানান রেখে বন্ধনীর মধ্যে ‘হসন্ত ছাড়াই প্রচলিত’ বলে মন্তব্য দেওয়া হয়েছে (‘কারিগর’ প্রকাশিত প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৬, পৃ. ১৬৮)। পক্ষান্তরে, ‘লতিকা প্রকাশনী’ থেকে প্রকাশিত পবিত্রবাবুরই ‘ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান’-এ ‘ষড়যন্ত্র’-কে ‘প্রচলনে সিদ্ধ’ আখ্যা

দিয়ে 'ষড়রিপু'-র পরিবর্তে 'ষড়্‌রিপু' অনুমোদন করা হয়েছে (প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, ২০১৮, পৃ. ৬১৭)

আরো একটা কথা মনে পড়ছে। 'দর্শন' থেকে কবিতায় বা গানে 'দরশন' প্রচলিত। রামপ্রসাদের একটা গানের প্রথমদিকটা এইরকম— 'কে জানে কালী কেমন/ষড়দরশনে না-পায় দরশন।' মূল লেখায় 'ষড়দরশনে' বানানে হসন্ত ছিল কি না জানা নেই। তবে গানটি 'রামকৃষ্ণায়ন' নামক রেকর্ডে স্থান পেয়েছে এবং সেখানে বিশিষ্ট শিল্পী মান্না দে সুস্পষ্টভাবে ড়-এর হসন্তবিহীন স্বরান্ত উচ্চারণে 'শড়োদরোশনে' গেয়েছেন।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয়, ষড়দর্শন, ষড়যন্ত্র, ষড়রিপু বানানগুলির হসন্তবিহীন বানান ও উচ্চারণ বেশ আগে থেকেই বাংলায় প্রচলিত। আর সেই প্রচলনের মূলে হয়তো রয়েছে আচার্য মণীন্দ্রকুমার-উক্ত পণ্ডিতদের ভুল উচ্চারণ। ''হস্‌-চিহ্নের অমনোযোগিতায় 'ষড়্‌যন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌বিধ, ষড়্‌রিপু' প্রভৃতি শব্দ পণ্ডিতেরাও ভুল উচ্চারণে'' পড়ার ফলেই সম্ভবত একসময়ে বানান থেকে হসন্ত খসে পড়েছে। হতে পারে, অরুণ সেনের 'বানানের অভিধান' এবং অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'সংসদ বানান অভিধান'-এ যেমন দেখানো হয়েছে এবং সুভাষ ভট্টাচার্য আর নরেন বিশ্বাস তাঁদের উচ্চারণ অভিধানে যেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন সেইভাবে ওই ধরনের বাকি শব্দগুলিতেও বাংলা ভাষায় উচ্চারণে ও বানানে হসন্ত ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

রেফ, দ্বিত্ব, অনুস্বার, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি

ক.বি.-১ সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেছিল। একটি রেফের সঙ্গে দ্বিত্ব বর্জন সম্পর্কিত আর অন্যটি কয়েকটি ঙ-যুক্ত বর্ণে যুক্তাক্ষর ভেঙে ঙ্-এর জায়গায় ং-এর ব্যবহার। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়মটিতে যেমন বিকল্পও রাখা হয়েছিল তেমনই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত না-হওয়ায় অঙ্ক গঙ্গা সঙ্গে শঙ্কা প্রভৃতি বহু শব্দে যুক্তবর্ণ ভাঙার প্রস্তাব আদৌ বিবেচিত হয়নি। সেকালের পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়। কারণ সংস্কৃত শব্দের বানানে মাত্র দুটি সংস্কার-প্রস্তাব আর সেইসঙ্গে বিকল্পের বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত বানান-সমিতির সদস্যরা-যে কী পরিমাণ বিরূপ সমালোচনা ও আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। তবে সেকালেও কোনো-কোনো সংস্কৃতজ্ঞ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তেমনই একজন শ্রীমঞ্জু ঘোষ।

তাঁর 'বাংলা শব্দের নূতন বানান' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশ পায় 'পরিচয়' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সংখ্যায়। মনে হয়, তিনি এটি লিখেছিলেন ক.বি.-১-এর তৃতীয় সংস্করণ (২০ মে ১৯৩৭) প্রকাশের কয়েকদিন আগে। কারণ রেফের সঙ্গে দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাব করেও বানান-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণে (অক্টোবর ১৯৩৬) ব্যুৎপত্তির জন্য 'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক' প্রভৃতি শব্দে দ্বিত্ব অবিকৃত রাখার বিধান ছিল। গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী পাণিনির সূত্র উদ্ধার করে সংস্কৃতেও ওইসব শব্দে দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করার পরে তৃতীয় সংস্করণে সমস্ত তৎসম শব্দেই রেফযুক্ত বর্ণে দ্বিত্ব বর্জনের বিকল্পহীন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্ভবত ওই সংস্করণ না-পড়ার ফলেই শ্রীঘোষ লিখেছিলেন : ''সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'কার্তিক, বার্তা, বার্তিক' প্রভৃতি বানান অশুদ্ধ নহে। 'বার্তা, বার্ত্তা' উচ্চারণেও এক। যেখানে সর্বত্র রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ববর্জন শাস্ত্রানুমোদিত, সেখানে ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য ব্যতিক্রম-বিধান কেন?'' এই উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যটির শেষে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখা হয়, ''সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 'কার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য' প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত রেফাক্রান্ত মৌলিক বর্ণদ্বয়ের প্রথমটির বিলোপ-সাধন ঐচ্ছিক ; যথা,— 'কার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য' বিকল্পে 'কার্তিক, বার্ধক্য' ইত্যাদি। (''ঝরোঝরিসবর্ণে''। ৮।৪।৬৫ — পাণিনি।)'' এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি প্রথম থেকেই রেফযুক্ত সমস্ত তৎসম শব্দেই দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষপাতী এবং অন্যান্য কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতের অযৌক্তিক অতিরিক্ত রক্ষণশীলতারও বিরোধী ছিলেন।

সংগত কারণেই ক.বি.-১-এর বিকল্প-বাহুল্যেরও বিরোধিতা করেছেন শ্রীঘোষ। বিশেষত যুক্তবর্ণে ক-বর্গে ঙ্-এর পরিবর্তে ং সুপারিশ করেও দ্বিতীয় নিয়মে ঙ্ক ঙ্গ ইত্যাদি বিকল্পও অনুমোদিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ যে বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন সে-কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। বস্তুত সেই বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি। সেজন্যেই 'ভয়ংকর, সংকট, সংগত, সংগীত' এবং 'ভয়ঙ্কর, সঙ্কট, সঙ্গত, সঙ্গীত' দুরকম

বানানই একালেও চলছে। তা ছাড়া, যে-ঙ্ সংস্কৃত শব্দে ম্ স্থানে সন্ধির পরিণাম হিসেবে আসেনি সেখানেও অনুস্বারের বিরোধিতা করা হয়েছিল ওই নিয়মে। বলা হয়েছিল, অংগ গংগা বংগ শংকা সংগ ইত্যাদি চলবে না। সংস্কৃত ব্যাকরণ ভালো করে না-শিখলে এসব ক্ষেত্রেও সংশয় হয় এবং অভিধান দেখে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে গত সংখ্যায় জানিয়েছি। কিন্তু শ্রীঘোষ লিখেছেন, "'সংখ্যা, সংগীত' প্রভৃতির সাদৃশ্যে 'সংগ, বংগ' প্রভৃতি লেখা চলে। এ-কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সেইহেতু বলিতে চাই, সমিতি সর্বত্র ংক, ংখ, ংগ, ংঘ লিখিবার একটি ব্যবস্থা দিতে পারেন, নতুবা ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ লিখিতে আমাদের কষ্ট হইবে না। এই বানান দেখিতে এবং লিখিতে আমরা অভ্যস্ত।

"যদি সমিতি মনে করিয়া থাকেন, সাধারণকে উপস্থিত এক মাত্রা বিধান সেবন করাইয়া দেখা যাক, সুবিধা বুঝিলে কালক্রমে সকল শব্দেই ং চালাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে ; তাহা হইলেও এ-নিয়ম সার্থক হয় নাই। কারণ, এ-নিয়মের বৈকল্পিক বিধান। এত সংশয়, সন্দেহ ও গোলমালের মধ্যে কেহই যাইতে চাহিবেন না, সকলেই বিকল্প-বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঙ্ক, ঙ্গ প্রভৃতিই লিখিতে থাকিবেন।" এই বক্তব্য-যে একাংশের ক্ষেত্রে এখনও প্রযোজ্য তা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। আর সেই কারণেই শ্রীঘোষ প্রস্তাব করেছিলেন— "বরঞ্চ সমিতি ঙ্ স্থানে ং লিখিবার বিধান না দিয়া ঙ্ পৃথক্ লিখিবার বিধান করিতে পারিতেন। ইহাতে সকল দিক্ রক্ষা করা হইত। ক, খ, গ, ঘ পরে থাকিলে সকল শব্দেই, অর্থাৎ যে-সকল শব্দে ম্ নাই সে-সকল শব্দেও, কালক্রমে ঙ্ স্থানে ং চলিয়া যাইত। 'বাঙ্গলা' কালক্রমে 'বাংলা' হইয়াছে, 'অঙ্ক, গঙ্গা, শঙ্কর, সঙ্গম'-ও কালক্রমে 'অংক গংগা ; শংকর, সংগম' হইতে পারিত।"

এ থেকে বোঝা যায় যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তৎসম শব্দেই ঙ্-যুক্ত বর্ণে অনুস্বারই অভিপ্রেত ছিল শ্রীঘোষের। একই ব্যবস্থা তাঁর কাম্য ছিল অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও। তিনি লিখেছেন, "অসংস্কৃত শব্দের বেলায় সমিতি নীরব। সাধারণের পক্ষে সংশয় ও দ্বিধার ইহাও আর এক কারণ হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন,— যখন সংস্কৃত শব্দেই পারতপক্ষে ঙ্ স্থানে ং লেখার চেষ্টা চলিতেছে, তখন অসংস্কৃত শব্দে যে সহজেই তাহা করা চলিবে, এ-কথাও কি আর বলার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আমরা স্পষ্ট কথাটি জানিতে চাই। 'বঙ্কিম, শিঙ্গা' না লিখিয়া 'বংকিম, শিংগা' লিখিতে পারি? লিখিতে পারি কি,— 'ধিংগি, কুলংগি, চাংগা, ডংকা, দংগল'?" (শ্রীঘোষের উদ্ধৃতিগুলি আকাদেমির 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ থেকে গৃহীত, পৃ. ২০৮-০৯)

ক.বি.-২ সেইরকম প্রস্তাবই করেছিল। ওই সমিতির ২ নম্বর নিয়মে তৎসম-অতৎসম নির্বিশেষে যুক্তবর্ণে ঙ্-কে বিসর্জন দিয়ে সর্বত্র ং ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অনেকেরই আনুগত্য এখনও এতটাই বেশি যে ক.বি.-১ যে-বিধান দিয়েছিল সেটার বাইরে যাওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। রেফের সঙ্গে দ্বিত্ব বর্জন করতেই তো প্রায় দেড়শো বছর লেগে গিয়েছিল এবং সেটা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মেনে করা সত্ত্বেও প্রাচীনপন্থীরা তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন। (অথচ হিন্দিতে

তো বহু আগে বটেই, অসমিয়াতেও কয়েক বছর আগে তৎসম-অতৎসম নির্বিশেষে ওই জাতীয় সমস্ত শব্দ অনুস্বার দিয়ে লেখার বিধান দেওয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারেও আমরা পিছিয়েই রয়েছি।) হয়তো সেই কারণেই আকাদেমি ও সংসদ-এর সংস্কারকগণ আর এগোতে সাহস করেননি। বলা প্রয়োজন, তা সত্ত্বেও তাঁরা একাংশ সংস্কৃতভক্ত এবং অতি-আধুনিক মতাবলম্বীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, অযথা বিতর্কের সূত্রপাত করা হয়েছিল তাঁদের বেশকিছু যুক্তিসংগত ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিয়েও। আকাদেমির প্রস্তাবের বিরোধীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগে বলেছি। এইসূত্রে ক্ষুদিরাম দাসের নামও উল্লেখযোগ্য, যদিও তাঁর কিছু-কিছু প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য এবং প্রসঙ্গক্রমে আমরা তুলে ধরব। বিরোধিতা করা হয়েছিল আ.বা.প, 'বর্তমান', 'স্টেটসম্যান', 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত বিভিন্নজনের কয়েকটি লেখায়। ওই ধরনের অধিকাংশ রচনায় ইতিবাচক ও নিরপেক্ষ আলোচনার পরিবর্তে আকাদেমির ছিদ্রান্বেষণের লক্ষ্যই বেশি প্রকট। আকাদেমিকে সমর্থন করে কিছু-কিছু আপত্তির রসালো জবাব দিয়েছিলেন আ.বা.প.-র ব্যবহার বিধির অন্তর্গত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইয়ের লেখক জ্যোতিভূষণ চাকি। তাঁর 'সেইখানেই তো ভূত / কী হবে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আকাদেমির 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৫৭-৬০) এটা লেখা হয়েছিল প্রধানত দুটি প্রবন্ধের সূত্রে— ১) 'যুক্তাক্ষর চলবে না'..., বিশ্বজিৎ রায়, (আ.বা.প., ১১.২.২০০৪) ; ২) 'যে যার নিজের মুদ্রাদোষে', মিলন দত্ত, (আ.বা.প., ১৫.২.২০০৪)।

জ্যোতিভূষণের রচনা থেকে কিছুটা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ''নতুন বানান প্রবর্তনার সঙ্গেই লিপিসংস্কার (মূলত স্বচ্ছ করা) ভাবা হয়েছে। এই চিন্তা হঠাৎ 'হুলিয়া' দিয়ে চাপানো হয়নি। বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৯৮৬) থেকেই এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে বড়োরকমের সেমিনার হয়েছিল তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়।... এই গ্রন্থেই তখনকার ভাষাভাবুকদের বহু নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল। এরই সূত্র ধরে বানানসংস্কার ও লিপি -বিষয়ে একটি ভিত্তিপত্র রচিত হয়। তা নিয়ে তুলকালাম (তুল-ই-কালাম) আলোচনা হয়। কয়েকটি সভায় আমি আমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি 'কাম-অন-ফাইট' মনোভাব শেষে 'ভেরি ভেরি সরি মশলা খাবি'তে নেমে এসেছিল।...

''ভিত্তিপত্রের পরে মান্য পরামর্শ বিবেচনা করে রচিত হল সুপারিশপত্র। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম, ত্রিপুরার বিদ্বজ্জন— সবাইকে এটি পাঠানো হল। সুপারিশপত্র পেয়ে মনসুর মুসা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, '...আপনাদের এ উদ্যোগকে আমরা অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছি।' (১১/১২/৯৫) সুভাষ মুখোপাধ্যায় ... জানান, 'আপনাদের সুপারিশপত্র পড়লাম। আমার খুব ভাল লেগেছে। যথাসাধ্য মেনে চলব।... কিন্তু তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে গেলে বোধহয় আইন আর সরকারের শিলমোহরের দরকার।' (১৪/১২/৯৫)।...

''...বানানের ব্যাপারে নতুন চিন্তাকে অনেকেই মনে মনে মেনে নিলেন। এ ব্যাপারে

প্রতিবাদী কণ্ঠ একটু স্তিমিত হল, দেখা গেল কৃষ্টি রসাতলে যায়নি, কলকাতাও আছে কলকাতাতেই। এখন শুরু হয়েছে স্বচ্ছকরণের ব্যাপার। এই স্বচ্ছকরণ-বানানসংস্কার বিদ্যাসাগরই শুরু করেছিলেন। তিনিই নাটের গুরু। অতএব, আইন মোতাবেক তাঁকেই অভিযুক্ত করা সমীচীন। বিধবাবিবাহ নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকলেই পারতেন, বর্ণ সহজ করার ক্ষেত্রে এলেন কেন?...

''সাগরদর্শনে আসন্ন দিনের ছায়া দেখেই স্বচ্ছতা আনবার ব্যাপারে লাইনোর প্রবর্তন হল। প্রজ্ঞাবান সুরেশচন্দ্র মজুমদার রাজশেখর বসুরা এই উদ্ভাবন করলেন। আনন্দবাজার সগৌরবে লাইনো গ্রহণ করল। এই পত্রিকার বিক্রি তো কমলই না বরং অনেক বেড়ে গেল। কিশলয় লাইনোতে ছাপা হওয়াতে মাতৃকুল শিশুশিক্ষা দিতে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।...

''মুসাভাই বললেন, 'ঙ্গ'-র জায়গায় ঙ-র নীচে গ কেন? অথচ ঢাকা, বাংলা একাডেমীর অভিধানে ঙ-র নীচে গ-ই গৃহীত হয়েছে। তিনি আরও বললেন, 'যুক্তাক্ষর শেখার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামনে যে রহস্যের উন্মোচন হয় সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরে শিশুর সেই আনন্দ কি ছিনিয়ে নেওয়া উচিত?' আমাদের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্যরকম। শিশু মাস্টারমশাইয়ের কাছে যুক্তাক্ষর শিখতে গিয়ে রক্তকর্ণমূল হয়ে মা-র কাছে এসে কাঁদতে থাকল। মা বললেন, 'কান্দস ক্যান্? আমরাও তগো বয়েসে কত-যে কানছি।' এই বলে তার কানে হাত বোলাতে লাগলেন।

''আসলে আনিসভাই (আনিসুজ্জামান) ঠিকই বলেছেন, আমরা পরস্পর অসহিষ্ণু, কেউ কাউকে মানছি না। আর-একটা ব্যাপারও আছে, আমাদের একটা মৃদু ঈর্ষাও এখানে কাজ করছে:

''—চটিস ক্যান্ রে বাই, পরাইন্যা তো হক কথাই কইছে।

''—কউক, আমার প্যাটের কথা হে আগে কইবার কেটায়।

''এ কথা জোর দিয়েই বলব, কোনো সংস্থায় এমন 'মাতব্বর' কেউ নেই যে খেয়ালখুশিমতো কিছু চাপিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখাবে। মুগ্ধা জননী যতই সহিষ্ণু হোন তিনি তাকে সহ্য করবেন না।

''হ্ম না লিখে হ-এর নীচে ম লিখলে যিনি ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপের কোনো হানি হয়? এ কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে ইন্টারনেটে (অবশ্য তিনি যদি সাকার হন)। আর, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, তুমি তো আঙুলে গোবর্ধন ধারণ করলে, তোমার পিঠের পুঁটুলিটা সরিয়ে একটু স্বস্তি নাও-না। 'ণ'-কে শ্রীচরণে রাখো। ক্ষতি কী?'' জ্যোতিভূষণের বক্তব্য এতই স্বচ্ছ ও তথ্যপূর্ণ-যে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শঙ্খ ঘোষও 'ভাষার কথা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকার মার্চ, ২০০৬ সংখ্যায়। সেখানে 'লিপিপ্রসঙ্গ', 'বানানপ্রসঙ্গ' ও 'ভাষাপ্রসঙ্গ' নিয়ে আকাদেমির কয়েকটি সিদ্ধান্তের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। সেটি সুস্থ, নিরপেক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি লিপিসংস্কার অর্থাৎ প্রস্তাবিত স্বচ্ছ

রূপগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন, বানানবিধির অধিকাংশই সমর্থন করেছেন, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মৃদু আপত্তি সহ ইতিবাচক পরামর্শও দিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, ''প্রবর্তিত নতুন বানানের কোনো একটি দুটি শব্দে কারও কারও এসব দ্বিধা কাজ করতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর মধ্যে এমনকিছু নেই যাকে প্রবলভাবে আপত্তিযোগ্য বলা যায়। একটি দুটি দোলাচল যে এই বিধির প্রণেতাদের মধ্যেও আছে তা বোঝা যায় এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে বানানপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এটা অসম্ভব নয় যে সম্পূর্ণ সুস্থিতি পেতে এ-অভিধানের আরও দু-একটি সংস্করণ লেগে যাবে।" ('বানান বিতর্ক', পৃ. ২৬৫) খুবই সংগত মন্তব্য। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে আকাদেমির একাধিক সংস্করণ প্রকাশের নিন্দা করেছেন তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে ক.বি.-১ মাত্র একবছরের মধ্যে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে এপ্রিল ১৯৯৭ থেকে আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত আট বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে আকাদেমির বানান অভিধানের পাঁচটি সংস্করণ মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। (পরে ষষ্ঠ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে, সেটা হাতের কাছে নেই) বরং শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আড়াই দশক পার হয়ে যাওয়ায় একালের উপযোগী আরো একটি সংস্কারের প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি।

রাঁচির 'পদক্ষেপ' এবং অশোকনগর থেকে 'থির বিজুরি' পত্রিকা বানান নিয়ে প্রায় কাছাকাছি সময়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সমীর সেনগুপ্ত ও সমীর বসুর সম্পাদনায় 'পদক্ষেপ'-এর 'বাংলা বানান বিতর্ক ও সমাধান' শীর্ষক সংখ্যা প্রকাশ পায় জানুআরি ১৯৯৭-এ আর অপূর্ব সাহার সম্পাদনায় 'থির বিজুরি'-র 'বাংলা বানান / চাপান উতোর' সংখ্যা বেরোয় ১৪১১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দুটি পত্রিকার তরফ থেকেই সেকাল ও একালের বানান-ভাবনা তুলে ধরা হয়। তাতে অবশ্যই বিভিন্নজনের ভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু সম্পাদকদের পক্ষপাতশূন্যতা আর বিকল্পবিহীন বানানের প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছে। লিপিবদ্ধ হয়েছে কয়েকটি বানানবিধিও। তবে 'থির বিজুরি'-তে শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের একটি ছোট্ট (মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা) লেখা পড়ে আমি অবাক হয়েছি। তাঁর লেখার শিরোনাম : 'যুক্তাক্ষর ভেঙে ভেঙে গ্রন্থ মুদ্রণে কিন্তু অনেকটা জায়গা লেগে যাবে' আর প্রথম দুটি বাক্যই নিম্নরূপ— ''আমি আকাদেমির বানানবিধি চোখে দেখিনি। লোকমুখে শুনেছি তাতে সব যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া হবে।"

বলা বাহুল্য, এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আকাদেমির প্রস্তাবের কোনো সংস্করণেই 'সব যুক্তাক্ষর বাদ' দেওয়ার কথা নেই। বিধি না-পড়ে শুধু লোকমুখে শুনেই এ-জাতীয় অভিযোগ উত্থাপনও বিস্ময়কর। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কয়েকজন বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন যে ক.বি.-১ নাকি বাংলা বানানে 'বিপ্লব' আনবার চেষ্টা করছেন, শুনে তাঁর 'দুর্ভাবনা' হয়, ''সুতরাং খোঁজ লইলাম ব্যাপারটা কি। বাংলা বানানের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর তৃতীয় সংস্করণের খসড়া পড়িলাম, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই নজরে পড়িল না।" (আ.বা.প., ২১ এপ্রিল ১৯৩৭) অর্থাৎ আচার্য রায় শুধু পরের মুখে ঝাল খেয়েই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। শ্রীমতী দেবসেনেরও উচিত ছিল জনশ্রুতির

ওপর নির্ভর না-করে বিধিটি পড়ে নিয়ে ত্রুটি নির্দেশের জন্য কলম ধরা। হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো মানে নেই, তাতে নিজের গাত্রে ব্যথা ছাড়া কারো লাভ হয় না। বরং তাঁর বিখ্যাত মাতাপিতা রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'চলিত ভাষার সংস্কার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সেকালের তুলনায় আধুনিক, এমন-কি তাঁদের কিছু-কিছু প্রস্তাব একালেও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। দেব কবি-দম্পতি এমন কথাও বলেছিলেন, ''অতএব আমাদের অভিমত এই যে— বিশ্ববিদ্যালয় আগে বর্ণ সংক্ষেপ করে নিয়ে, যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জ্জন করে চলিত ভাষার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করুন, ...।'' ('বানান বিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৯) তাঁরা ৮৭ বছর আগেই 'ঐ'-এর পরিবর্তে চলিত বাংলায় 'ওই' যেমন চেয়েছিলেন তেমনই মন্তব্য করেছিলেন, '''খই', 'দই', ঐ'কারের পরিবর্তে ই দিয়ে লিখলে ফলারের কোনো অসুবিধা হবে কি? 'ঔষধ'কে চলিত বাংলায় 'ওষুধ' বানান করলেও আশা করি তা' সেবনে রোগ সারবে।'' (ওই, পৃ. ৬০) তা ছাড়া, শ্রীমতী দেবসেন নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন যে আকাদেমি বা সংসদের অভিধানে স্থান পাওয়ার আগে থেকেই অনেকে 'আস্কারা' 'মস্করা' 'মুস্কিল' 'রিক্সা' প্রভৃতির পরিবর্তে যুক্তাক্ষর ভেঙে উচ্চারণ-ভিত্তিক 'আশকারা' 'মশকরা' 'মুশকিল' 'রিকশা' বানান লিখছেন।

যা-ই হোক, শ্রীমঞ্জু ঘোষের উত্থাপিত অতৎসম শব্দে যুক্তবর্ণ ভেঙে ঙ্-র জায়গায় ং ব্যবহারের প্রশ্নে ফিরে যাই। তৎসম শব্দে ক.বি.-১-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করলেও আধুনিক বানান-সংস্কারকগণ অসংস্কৃত শব্দে ক.বি.-২-এর প্রস্তাব অনুযায়ী অনুস্বার ব্যবহারের বিধান দিতে পারতেন। তাতে ব্যাকরণের নিয়মও লঙ্ঘিত হতো না। কিন্তু সংসদের বানানবিধিতে এ-বিষয়ে কোনো নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং তাদের অভিধানে 'কুলংগি (বা কুলুংগি) চাংগা ডংকা দংগল ধিংগি' প্রভৃতি শব্দের 'কুলঙ্গি (বা কুলুঙ্গি)', 'চাঙ্গা', 'ডঙ্কা', 'দঙ্গল', 'ধিঙ্গি' প্রভৃতি বানানই শোভা পাচ্ছে। আকাদেমিও ওইসব বানানে যুক্তবর্ণই রেখেছে। সেইসঙ্গে তাদের বানানবিধির ১৬.২ নিয়মে বলা হয়েছে— ''যেখানে সাধারণত ঙ্গ উচ্চারণ হয়, সেখানে গ্-যুক্ত ঙ অর্থাৎ ঙ্গ-ই লিখতে হবে, যেমন : চুঙ্গি জঙ্গল জঙ্গি দাঙ্গা ভঙ্গি লুঙ্গি হাঙ্গামা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত ২.১ এবং ৮.১ সূত্র দ্রষ্টব্য।'' ২.১ সূত্রে বলা হয়েছে— ''ঙ্গ, ... প্রকৃতপক্ষে যুক্তবর্ণ (ঙ্+গ)। সুতরাং তার বিকল্পে কেবল ঙ্ অথবা ং হতে পারে না, যদি তাতে গ-এর উচ্চারণ থাকে। যথা, দাঙ্গা শব্দে গ-এর উচ্চারণ আছে। কিন্তু ভাঙ্গা/রাঙ্গা বানান সঠিক নয়, কারণ তাতে গ-এর উচ্চারণ নেই। তাই সে দুটি হবে ভাঙা রাঙা।'' আর ৮.১ সূত্রে রয়েছে ক.বি.-১-এর ''তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণমতে সন্ধি-পরিণামে শব্দের পূর্বপদের শেষ বর্ণ ম্ হলে, পরবর্তী বর্ণ ঙ্ এবং ং উভয়ই শুদ্ধ'' এ-কথা মনে করিয়ে অলঙ্কার/অলংকার, শঙ্কর/শংকর, সঙ্গত/সংগত, সঙ্গীত/সংগীত প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ''এক্ষেত্রে কেবল ং-যুক্ত বানান ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়।'' এখানে শেষোক্ত নিয়মটির পুনরাবৃত্তি করা

হলো একটি বিশেষ কারণে।

মা.চ.বা.-য় ভাঙা রাঙা শব্দে গ-এর উচ্চারণ না-থাকায় ঙ্গ-এর পরিবর্তে শুধু ঙ ব্যবহার অবশ্যই যুক্তিসম্মত। কিন্তু গ-এর উচ্চারণ আছে বলেই 'দাঙ্গা'-র পরিবর্তে ং দিয়ে দাংগা লেখা যাবে না কেন? তৎসম শব্দেই যখন গ-এর উচ্চারণ থাকা সত্ত্বেও 'সঙ্গত' বা 'সঙ্গীত'-এর পরিবর্তে অনুস্বার দিয়ে সংগত বা সংগীত লেখা যায় তখন অতৎসম চুংগি জংগি দাংগা লুংগি হাংগামা প্রভৃতি কী দোষ করল? (উক্ত শব্দগুলির প্রথমটি হিন্দি এবং বাকি চারটে ফারসি থেকে আগত।) আর এগুলি যদি সমর্থনযোগ্য মনে না-হয় তাহলে অলংকার/অলঙ্কার, শংকর/শঙ্কর, শুভংকর/শুভঙ্কর প্রভৃতি শব্দে "কেবল ং-যুক্ত বানান ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়" বলা হয় কোন্ বিবেচনা থেকে? 'জঙ্গল' 'ভঙ্গি' না-হয় তৎসম শব্দ বলে যুক্তাক্ষর ভাঙলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, কিন্তু অতৎসম শব্দে তো সে-নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সুতরাং অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সম্ভবস্থলে ক-বর্গে যুক্তাক্ষর ভেঙে ঙ-র পরিবর্তে ং প্রয়োগই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

জঙ্গল শব্দটি সংস্কৃত (যদিও শব্দটি ফারসিতেও একই অর্থে রয়েছে), এই যুক্তিতে তার যুক্তবর্ণ অবিকৃত রেখে সেটা থেকে আগত 'জংলা' 'জংলি' বানান অনুস্বার দিয়ে অনুমোদন করা হয়েছে সংসদ ও আকাদেমির অভিধানে। অথচ দুটো অভিধানেই 'জংগুলে'-র পরিবর্তে 'জঙ্গুলে' কেন? এই শব্দটিও তো 'জংলি'-র মতোই অতৎসম। আবার, সংসদ 'ব্যাঙ্ক' সুপারিশ করলেও আকাদেমির বানান 'ব্যাংক'। তাহলে 'ট্যাংক' 'র‍্যাংক'ই-বা কী দোষ করল? হয়তো অসংস্কৃত শব্দে অপ্রয়োজনীয় যুক্তাক্ষর বর্জনের বিষয়ে আকাদেমি অভিন্ন নিয়ম প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। অন্যদিকে, অরুণ সেনের বানানের অভিধানে 'ডংকা' 'ব্যাংক' 'ট্যাংক' অনুমোদন করা হলেও 'জঙ্গি' 'দাঙ্গা' 'লুঙ্গি' 'হাঙ্গামা' প্রভৃতি অতৎসম শব্দে ং ব্যবহারে আপত্তি জানানো হয়েছে। সুভাষ ভট্টাচার্য 'লেখক ও সম্পাদকের অভিধান'-এ 'ডংকা' 'ব্যাংক' বানান সুপারিশ করে 'কুলঙ্গি' 'জঙ্গি'-তে অনুস্বার দিতে বারণ করেছেন। আমাদের মনে হয়, এ-জাতীয় সমস্ত অতৎসম শব্দে যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারের পরিবর্তে ং দিয়ে লিখলে সেটাই হবে যুক্তিসংগত ও সময়োচিত সংস্কার।

শঙ্খ, পবিত্র, সুভাষ, পলাশ বরন কী বলেছেন

মূল আলোচনা থেকে একটু সরে গিয়ে এখন এ ও এ-কারের অ্যা উচ্চারণসূচক আমার প্রস্তাবিত চিহ্নগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করতে হচ্ছে বিশেষ কারণে। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আমি মতামত আহ্বান করেছিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজনের মন্তব্য পাওয়া গিয়েছে। আগস্ট মাসে প্রকাশিত দুটি চিঠিতে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন গৌতম ঘোষদস্তিদার এবং রণধীরকুমার দে। গৌতমবাবুর চিঠিতে অবশ্য অন্য কিছু প্রসঙ্গও ছিল। সেসবের জবাব দিয়েছি 'সবিনয় নিবেদন' বিভাগে।

পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করেছেন শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, সুভাষ ভট্টাচার্য এবং পলাশ বরন পাল, বাংলা ভাষার চর্চায় যাঁদের প্রত্যেকের বিশেষ অবদানের কথা নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের বক্তব্য জানার ব্যাপারে অনেকেরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক— এই বিবেচনা থেকে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

শঙ্খ ঘোষ ১৭/৮/১৭ তারিখে লিখেছেন : ''আমার জন্ম ১৯৩২ সালে। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৩১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৯ সালে বাবার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমাগত উনি বানানগত যে-সব সমস্যার কথা বলে গেছেন তার মধ্যে প্রধান একটি ছিল, আমাদের লেখায় অ্যা চিহ্নের অভাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — এঁদের মতো মানুষজনের কাছে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলত। ফলে, খুব ছোটোবেলা থেকেই, সে-সব চিঠি পড়ার মধ্য দিয়ে আমারও এ-বিষয়ে একটা ভাবনা তৈরি হয়েছিল যে এই চিহ্নটি প্রসঙ্গে একটা মীমাংসা অবশ্যই দরকার।

''এর কোনো মীমাংসা হচ্ছে না দেখে একেবারে শেষজীবনে বাবা আমাদের বন্ধু শিশিরকুমার দাশের সঙ্গে মিলিতভাবে ছোটো একটি লেখা প্রকাশ করেন, আর একটি লিফলেট আকারে তার প্রচার চান। প্রচার অবশ্য হয়নি তেমন। সেখানে অ্যা-ধ্বনি এবং অ্যা-কারের (্যা) জন্য বিশেষ দুটি রূপের কথা বলা হয়েছিল। সেইসঙ্গে এও বলা ছিল যে এই দুটি রূপের বিষয়েই তাঁরা-যে বিশেষভাবে আসক্ত, এমন নয়। অন্য যে-কোনো রূপ প্রস্তাবিত হতে পারে।

''আমার মনে হয়, সম্প্রতি-প্রস্তাবিত ৎ এ রূপ দুটি বাবারও হয়তো মনোমতো হতো। আমি অন্তত এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।''

এই বক্তব্য এতই প্রাঞ্জল যে কোনোরকম ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি না।

পবিত্র সরকারের চিঠিটি এসেছে ই-মেলে, ১২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে। তাঁর মন্তব্য নিম্নরূপ : ''আমি বাংলা 'অ্যা' ধ্বনির পূর্ণ বর্ণপ্রতীক এবং তার স্বরচিহ্ন (allograph) হিসেবে অন্যান্যদের সঙ্গে পলাশবরন পাল ও সুকুমার বাগচির প্রস্তাবিত যথাক্রমে

পেটকাটা এ এবং পেটকাটা এ-কারকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাচ্ছি। এই সব সংস্কার কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বলবৎ হয়ে থাকে, সকলেই তা গ্রহণ করেন। এখন এই সব ব্যক্তিগত প্রস্তাব কে কীভাবে গ্রহণ করবেন জানি না। শ্রীবাগচি কীভাবে কম্পিউটারে প্রতীকগুলি লেখা যায় তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফলে আমি একটু অভ্যাস করে তা লেখার চেষ্টা করব। কিন্তু বাংলা মুদ্রণ-জগৎ তা কবে গ্রহণ করবেন জানি না। গ্রহণ করলে বাংলা লিপি-সংস্কারে অনেক দিনের একটি প্রত্যাশিত বিপ্লব সমাধা হবে।"

আমি পবিত্রবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এরকম প্রস্তাব কোনো মান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এলেই ভালো হতো। একসময়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেছিল। কিন্তু কী কারণে তা প্রত্যাহৃত হয় এবং তাদের লিপিবিষয়ক সংস্কারে অনুমোদিত হয়নি সে এক রহস্য। সাহিত্য সংসদ যুক্তবর্ণের স্বচ্ছরূপ প্রবর্তন করলেও এ-ব্যাপারে আগাগোড়াই নীরব। ক.বি.-২ অকালে বিদায় নেওয়ার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বানান বা লিপিসংস্কারের কোনো উদ্যোগই আর লক্ষ করা যায়নি। অন্যদিকে, যেসব সংস্থা যুক্তবর্ণের স্বচ্ছরূপই সমর্থন করে না তারা-যে এ ও এ-কারের অ্যা উচ্চারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হবে না তা বলাই বাহুল্য। তারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েই তৃপ্ত। আমার মতো সাধারণ মানুষকেও তাই ভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে এরকম একটা কাজে ব্রতী হতে হয়।

সুভাষ ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের আকারে রচনাটি পাই ১২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে পাঠানো একটি চিঠির সঙ্গে। 'বাংলায় অ্যা-ধ্বনির জন্যে নতুন বর্ণচিহ্নের প্রস্তাব' শিরোনামাঙ্কিত উক্ত প্রবন্ধে তিনি লেখেন : ''মান্য কথ্য বাংলায় যে সাতটি স্বরধ্বনি আছে তার মধ্যে অ্যা / ae / ধ্বনির একটা বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকা আছে। এ নিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর আগে 'অমৃতলোক' পত্রিকায় 'বাংলায় অ্যা-ধ্বনি ও তৎসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। সেই নিবন্ধের শেষে এই ধ্বনির জন্য একটি নতুন বর্ণচিহ্নের জন্য রাজশেখর বসুর প্রস্তাবের কথা বলেছিলাম। একটি নতুন বর্ণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও, যদিও কোনো নতুন বর্ণের প্রস্তাব তিনি করেননি।

''সম্প্রতি নতুন একটি বর্ণচিহ্নের কথা আবার উঠেছে। দু-একটা চিহ্ন ব্যবহৃত হতেও দেখা যাচ্ছে। সে বিষয়ে পরে বলছি।

''বললাম বটে, রবীন্দ্রনাথ কোনো নতুন বর্ণের প্রস্তাব বা উদ্ভাবন করেননি, তবে স্বরবিতানে উচ্চারণের বিভ্রান্তি এড়াবার জন্যে দু-রকম এ-কার ব্যবহার করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এ-কারের জন্যে মাত্রাহীন ে (সেদিন, মেঘ, দেশ), আর অ্যা-কারের জন্যে মাত্রাযুক্ত ে (খেলা, দেখা)। এগুলো নতুন কিছু নয়। মুদ্রণে শব্দের গোড়ায় মাত্রাহীন ে, আর শব্দের মধ্যে মাত্রাযুক্ত ে ছিলই— দেওয়ানেওয়া। কিন্তু স্বরবিতানে 'এ' বর্ণটিতে কোনো হেরফের করা হয়নি। এখন আর এখুনি-তে কোনো তফাত নেই সেখানে।

“দ্বিতীয় প্রস্তাব রাজশেখর বসুর। তিনি অ্যা-কারের জন্যে এ-র ল্যাজটাকে মুড়িয়ে ডান দিকে আনার কথা বলেছিলেন। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ রাজশেখর বসুকে এ-নিয়ে প্রশ্ন করলে রাজশেখর লিখলেন— “Cat এর a-র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি— a ɕ (act = aক্ট্, hat = ɕহট্)। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন।” এই চিঠির তারিখ মণীন্দ্রকুমার বলছেন ৫ জুলাই ১৯৩৩।

“মণীন্দ্রকুমার তখন এই প্রস্তাব সমর্থনই করেছিলেন, তবে অনেক পরে তিনি পেট-কাটা এ এবং ে এই দুটি চিহ্ন মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন। এ-নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে একাধিকবার। রাজশেখর বসুর প্রথম বর্ণচিহ্নটি (a) একটু জটিল, ছোটো পয়েন্টে ছাপতে গেলে একটু অস্বচ্ছ দেখাবে বলে মনে হয়।

“এদিক থেকে পলাশ বরন পাল তাঁর নিজের বইপত্রে কিছুকাল যাবৎ যে-দুটি চিহ্ন ব্যবহার করছেন সেগুলো যথেষ্ট স্বচ্ছ। পলাশ বরন অ্যা-ধ্বনির জন্যে এ এবং অ্যা-কারের জন্যে ে ব্যবহার করেন— েবেলাবেলি, এখন, একেবলা, েদেখাদেখি ইত্যাদি।

“আর একটি প্রস্তাব সম্প্রতি পাওয়া গেল সুকুমার বাগচির কাছ থেকে। একটি ক্ষেত্রে ছাড়া তাঁর প্রস্তাবিত চিহ্ন পলাশ বরনের চিহ্নেরই মতো, যদিও পলাশ বরনের চিহ্নের কথা তিনি জেনেছেন পরে। তার মানে এমন নয় যে, তিনি পলাশ বরনের চিহ্ন দেখে তাকে সমর্থন করছেন। আসলে পলাশ বরনের চিহ্ন দেখে তিনি জোর পেয়েছেন। যে একটা ক্ষেত্রে সুকুমার বাগচির প্রস্তাবে ভিন্নতা রয়েছে তা হল, তিনি শব্দের ভিতরের-বাইরের জন্যে তফাত করতে চেয়েছেন।

“আমি মনে করি, পলাশ বরন পালের ব্যবহৃত এবং সুকুমার বাগচির প্রস্তাবিত এ এবং ে এই চিহ্নদুটি এ ব্যাপারে সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য। কেবল মনে হয় সুকুমারবাবুর শব্দের গোড়ায় আর মাঝের ধ্বনির জন্যে পৃথক চিহ্ন ব্যবহারে জটিলতা বাড়বে। তাঁর আশঙ্কা এই তফাতটা না-রাখলে স্বরবিতানের চিহ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা থাকবে। আমার অবশ্য মনে হয় না তা। কেননা, স্বরবিতানে মাত্রাহীন আর মাত্রাযুক্ত এই দু-রকম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, পেট-কাটা চিহ্ন নেই সেখানে।

“শেষ কথা বলি। পলাশ বরন তাঁর উদ্‌ভাবিত চিহ্ন নিজের বইয়ে ব্যবহার করেন। কী করবেন অন্য প্রকাশকেরা? সকলে এই চিহ্ন ব্যবহার করতে রাজি না-হলে, বা ব্যবহার করতে শুরু না-করলে সুকুমারবাবুর প্রস্তাব কার্যকর হবে না। কীভাবে কার্যকর করা যায়, সে হদিশও দিয়েছেন সুকুমার বাগচি। প্রকাশকেরা বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবলে একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেই মনে হয়।”

সুভাষবাবুর বক্তব্যও যথেষ্ট পরিষ্কার। তবে দু-একটি ব্যাপারে আমার কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। প্রথমত, আচার্য মণীন্দ্রকুমারকে লেখা রাজশেখর বসুর উক্ত চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ আমার লেখার দ্বিতীয় কিস্তিতে (অর্থাৎ জুলাই ২০১৬ সংখ্যায়) উদ্ধৃত

হয়েছিল। তিনি নিয়মিত এই পত্রিকার ('কবিসম্মেলন', যেখানে এই লেখা প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত) কপি পান না বলে সেটা তাঁর চোখে পড়েনি। রাজশেখরের প্রস্তাবিত চিহ্ন দুটি কেন চলেনি তা-ও বলেছিলাম। একটা ইংরেজি a বর্ণটির প্রায় অনুরূপ, বাংলা হরফের চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না। আর দ্বিতীয়টা প্রচলিত এ-কারেরই রকমফের, নীচের দিকের বাড়তি পুঁটুলিটা অনেকেরই হাতের লেখায় দেখা যায়। ফলে পার্থক্য করা মুশকিল। যা-ই হোক, মণীন্দ্রকুমার-যে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবিত রূপ দুটিই সমর্থন করেছিলেন তা শঙ্খদার বয়ান আর সুভাষবাবুর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট।

আমি সুভাষবাবুর সঙ্গে একমত যে আমার প্রস্তাবিত চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের শব্দের শুরুর মাত্রাযুক্ত এ-কারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনার কথা লেখা ঠিক হয়নি। আমি পেটকাটা এ-কারের মাত্রাহীন ও মাত্রাযুক্ত রূপ দুটি রাখার পক্ষপাতী ভিন্ন কারণে, যা একটু পরে ব্যাখ্যা করছি। তবে সুভাষবাবু স্বরবিতানের কথাই শুধু উল্লেখ করেছেন। যতদূর জানি, শুধু স্বরবিতানে নয়, নিজের গান, কবিতা, নাটকে তো বটেই, এমন-কি উপন্যাস-ছোটগল্প-প্রবন্ধেও বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলির সর্বত্র শব্দের আদ্য এ-কারের অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যা ওই প্রতিষ্ঠানে এখনও পালন করা হচ্ছে।

আমি আদ্য এ-কারের অ্যা উচ্চারণের জন্য মাত্রাহীন পেটকাটা এ-কার (€) আর শব্দের মাঝখানের জন্য মাত্রাযুক্ত পেটকাটা এ-কার (€) ব্যবহারের প্রস্তাব করায় সুভাষবাবু মনে করেন, ''শব্দের গোড়ায় আর মাঝের ধ্বনির জন্যে পৃথক চিহ্ন ব্যবহারে জটিলতা বাড়বে।'' এ-ব্যাপারে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ : এ-কারের মাত্রাহীন ও মাত্রাযুক্ত পৃথক রূপ তো বরাবরই রয়েছে। শব্দের মধ্যে যাতে কোনো ফাঁক না-থাকে সেজন্য মাঝখানে মাত্রাযুক্ত আর প্রথমে মাত্রাহীন এ-কার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমিও ঠিক সেটাই রাখতে চাইছি, সেইসঙ্গে অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এ-কারের পেট কাটার কথা বলেছি। তা সেটা শব্দের শুরুতেই হোক বা মাঝখানেই হোক। আর মাঝখানের এ-কারের উচ্চারণ এ বা অ্যা যা-ই হোক সেখানে তো মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেজন্যই আমি যেটা চাইছি তা হলো, এ-কারের অবিকৃত এ উচ্চারণের জন্য শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে বর্তমানে যেমন ে আর ে চলছে তেমনই চলবে, শুধু অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর দরকার হলেই যথাক্রমে € আর € ব্যবহৃত হবে। এতে জটিলতা কোথায়? শুধু মাত্রাহীন এ-কারের পেট কাটলে তো সেটা শব্দের মাঝখানে ব্যবহার করা যাবে না। এবং এতকাল ধরে দুটো এ-কার নিয়ে ছাপাখানায় যদি কোনো সমস্যা না-হয়ে থাকে (বরং মাত্রাযুক্ত এ-কার তৈরি না-করলেই কম্পোজ করতে অসুবিধে হতো) তাহলে ঠিক ওই দুটো এ-কারেরই পেট কাটলে জটিলতা দেখা দেবে কেন? আসল কথা অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এ-কারের পেটকাটা চেহারা নিয়ে, সেটার মাত্রা আছে কি নেই তা নিয়ে পাঠকের সচেতন থাকার দরকারই পড়ে না, প্রয়োজন শুধু লেখকের আর যিনি কম্পোজ করবেন তাঁর। সেটাও শব্দের মধ্যে ব্যবহারের সময়ে। তখন হাতের লেখায়

যেমন এ-কারের উপরদিকে একটা ছোট দাগ দিয়ে পূর্ববর্ণের সঙ্গে জুড়তে হয়, তেমনই টাইপ করতে গিয়েও মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহারের বিকল্প নেই। এই পদ্ধতি যথেষ্ট পুরনো, প্রচলিত এবং আমাদের অভ্যাসের অন্তর্গত। পেটকাটা এ-কারও সেভাবেই ব্যবহৃত হবে। ফলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সুভাষবাবু যথার্থই বলেছেন যে পলাশ বরনের দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে আমি অনেক বেশি জোর পেয়েছি। পলাশ বরনের মতো জবরদস্ত সেনাপতি এখন আমার মতো সামান্য ভাষাসৈনিকের পাশে। তিনি আমার প্রস্তাবের কথা জানতে পেরে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ই-মেলে লিখেছেন : ''বাংলায় আমরা যেভাবে 'অ' উচ্চারণ করি, হিন্দিতে তা ছিলো না, ইংরিজি থেকে নেওয়া কিছু কিছু শব্দের লিপ্যন্তর করতে তাই অসুবিধে হচ্ছিলো। গত দু-তিন দশকে হিন্দিতে তাই নতুন একটি স্বরবর্ণ যোগ করা হয়েছে, যার চেহারা 'আ' এবং 'আ-কারের' ওপরে অর্ধচন্দ্রের মতো। মারাঠীতে এই অর্ধচন্দ্র চিহ্নও চালু হয়েছে, 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝানোর জন্য। এরা সবাই পারে, আর আমরা পারবো না? বাংলায় নতুন একটা স্বরবর্ণের প্রয়োজন আরো বেশি, কেননা 'অ্যা' উচ্চারণ শুধু যে বিভাষী শব্দে সীমাবদ্ধ তা নয়, নিজেদের ঘরের শব্দের উচ্চারণেও এই ধ্বনির ব্যবহার আছে। তাহলে একটা আলাদা বর্ণ হবে না কেন ?

''রবীন্দ্রনাথ থেকে এই ভাবনার শুরু, তাঁর পরেও অনেকে এ নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে পেটকাটা-এ লিখে এই বর্ণটি লেখার, এবং এ-কারের পেট কেটে এর ব্যঞ্জনলগ্ন রূপটি লেখার। আমি গত পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার বিভিন্ন বইয়ে এই চিহ্ন ব্যবহার করে চলেছি। বাংলা লেখার জন্য যে হরফ আমি বানিয়েছিলাম তাতেও এই বাড়তি বর্ণ আছে। সুকুমার বাগচি মশাই বলেছেন, আমার তৈরি হরফ না থাকলেও এই চিহ্নটি লেখা সম্ভব কম্পিউটারে, 'এ' বা 'এ-কার', যেটা যখন দরকার সেটা লিখে একটি হাইফেন দিয়ে তার পেটটি কেটে দিয়ে। চমৎকার প্রস্তাব। তাহলে আর বাধা কোথায়? এ চিহ্ন যতো তাড়াতাড়ি চালু হবে, ততোই মঙ্গল।''

পলাশ বরনের সমর্থন মোটামুটি প্রত্যাশিতই ছিল, বিশেষ করে তিনি যখন ইতিমধ্যেই আমার প্রস্তাবিত চিহ্নের অনুরূপ টাইপফেস উদ্ভাবন আর নিজের বইয়ে ব্যবহার করেছেন। সেইসঙ্গে একটা সংশয়ের জায়গাও ছিল। সেটা আমার ভিন্ন পদ্ধতি সংক্রান্ত। যা-ই হোক, তিনি এবং সেইসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার আর সুভাষ ভট্টাচার্যের মতো বিখ্যাত বিদ্বজ্জন আমার প্রস্তাব অনুমোদন করায় এইসূত্রে তাঁদের সকলের প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অন্য কেউ এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে তার রূপায়ণে আগ্রহী হলে কৃতার্থ বোধ করব।

আরেকটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই। এই রচনা শুরু করার আগে বিষয়টা নিয়ে যখন চিন্তা করি তখন দুটো ভাবনা আমার মাথায় ছিল। এক. প্রস্তাবিত রূপের চেহারা যেন বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দুই. কে কবে নতুন টাইপফেস বানাবে এবং কারা তা গ্রহণ ও ব্যবহার করবে সেসবের অপেক্ষায় বসে না-থেকে প্রচলিত

ব্যবস্থার মধ্যেই যাতে নতুন চিহ্নের স্থান করে দেওয়া যায়। উল্লিখিত চারজনের মন্তব্য থেকে এখন এটা পরিষ্কার যে আমার ভাবনা সঠিক খাতেই বইছিল।

ক.বি.২-এর সমাধি

ইতিপূর্বে যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই ফের বানানের রাজ্যে প্রবেশ করা যাক। আমরা লক্ষ করেছি, ঙ্-যুক্ত সমস্ত অসংস্কৃত শব্দে যুক্তবর্ণের পরিবর্তে ং প্রয়োগের অভিন্ন নীতি বানানবিদদের সংকলিত বিভিন্ন অভিধানে স্থান পায়নি। ক.বি.-২ সেরকম একটা প্রস্তাব করলেও পরবর্তী কালে যা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ লঙ্ঘন না-করার মানসিকতা। অর্থাৎ অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ং ব্যবহারে উদার হলেও সংস্কৃত শব্দে শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই যুক্তবর্ণ ভেঙে অনুস্বার দেওয়া হবে যেখানে ব্যাকরণের অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে।পক্ষান্তরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর কিছু-কিছু প্রস্তাব ছিল 'বৈপ্লবিক', যেমন— বেশ কয়েকটি বর্ণের বিলোপ এবং যুক্তাক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন। তাঁর প্রস্তাবিত বানানে 'দৃক্পাত' 'বিস্তৃত' 'নিস্পন্দ' 'ব্রহ্মা' 'সৃজন' হবে যথাক্রমে 'দ্রিক্পাত' 'বিস্ত্রিত' 'নিশ্পন্দ' 'ব্রম্হা' 'স্রিজন'। (তাঁর 'বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব', 'দেশ', ১১ মার্চ ১৯৭৮ দ্রষ্টব্য) এই ধরনের বানান প্রচলিত হলে বই বা পত্রিকার আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে, তার ফলে কাগজের দোকানদার আর প্রেসের মালিক ছাড়া কারো লাভের সম্ভাবনা নেই। লিখতে গেলে সময়ও অনেক বেশি লাগবে। সে-কারণে, একসময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা ও বিশ্বভারতী তাদের প্রকাশনায় 'পুনর্মুদ্রণ' বানান ব্যবহার করলেও পরে সেসব যেমন বর্জিত হয়েছিল, তেমনই ব্যাপকভাবে যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখাও প্রচলিত হয়নি। এমন-কি ক.বি.-২-এর প্রস্তাবেও মাত্র অল্প কয়েকটি শব্দে যুক্তাক্ষর ভাঙার সুপারিশ ছিল।

পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, 'দেশ' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের ''পরে (বছরখানেকের মধ্যেই) অধ্যাপক চক্রবর্তী এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে। ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি নতুন বানান-সমিতি গঠিত হয়। এঁরাও একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে নানা (২০০ জনের মতো) বিবুধজনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং নতুন সংস্কারে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের আপত্তির ভিত্তিতে এ সমিতির কাজকর্ম, এই লেখকের মতে অনুচিতভাবে, বন্ধ করে দেন, এবং সে উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটে।'' ('বানান বিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত 'বাংলা বানান-সংস্কার : শেষ প্রতিবেদন', পৃ. ২৭৬) অথচ ঘটনা এই যে উক্ত সমিতির কয়েকটি সুপারিশ পরবর্তী কালে গৃহীত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি অনুমোদিত হলে বাংলা বানান সহজ করার পথ অনেকটাই সুগম হতো।

কী কারণে ক্ষুদিরাম দাস ক.বি.-২-এর সমাধি রচনা করেছিলেন কিংবা অসিতকুমার তাঁর অযৌক্তিক আবদার মেনে নিয়েছিলেন তা জানা নেই। তবে এক প্রকাশক ক্ষুদিরামবাবুর হাতে চারটি পুস্তিকা (১. আকাদেমির 'বাংলা বানান সংস্কার—একটি ভিত্তিপত্র', ২. সংসদ প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম', ৩. আনন্দ পাবলিশার্সের 'বাংলা / কী লিখবেন কেন লিখবেন' এবং ৪. শিশুসাহিত্য-সংসদ থেকে প্রকাশিত 'হাসতে হাসতে বানান') ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি 'বানান বানানোর বন্দরে' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটি 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর রচনাটি নিয়ে আপাতত বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু এইটুকু বলি, নতুন প্রস্তাব ও বিধিগুলি নিয়ে বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি কিছু-কিছু সমর্থন করেছেন, দু-একটা নতুন প্রস্তাবও দিয়েছেন, তবে তৎসম ও অতৎসম উভয় শ্রেণির শব্দে তিনি খুব বেশি ঈ-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিমত স্পষ্ট নয়। বরং মনে হয় যে ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয়যুক্ত রূপে বাংলায় ঈ-কার সর্বত্র ব্যবহারই তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল।

ক্ষুদিরামবাবুর উল্লিখিত রচনা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক : ''সাধুগদ্য নির্মাণের সময় থেকে পণ্ডিতকুল সংস্কৃতপক্ষে হেলে থেকে ওদের উপর আকছার প্রত্যয় ও সমাস যোগে ভারী ভারী শব্দ সব গড়ে তুলতে লাগলেন। চলতে লাগল— গুণিগণ, গুণিদের, রথিবৃন্দ, ধনিরা, মন্ত্রিসকল, স্বামিধর্ম, সাক্ষিগণ, প্রতিযোগিতা, অনুগামিতা, একাকিত্ব, মনস্বিতা প্রভৃতি। মৌখিক-নির্ভর চলতি বাঙলাতেও অন্ধভাবে ঐসবের অনুসরণ করা হয়েছে, তবে 'রা' 'দের' 'দিগ' প্রত্যয়যোগের ক্ষেত্রে বহু লেখকই উক্ত ঈ = ই-এর অত্যাচার মানতে রাজী হন নি। যার ফলে গুণীদের, ধনীরা, সাক্ষী সকলের, মন্ত্রীমশায় পর্যন্ত তাঁরা এগিয়েছেন, কিন্তু প্রতিযোগীতা, মনস্বীতা, বিরোধীতা, দায়ীত্ব পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সাহসী হন নি। আর, এ বিষয়ে বানান-সংস্কারকেরা এখনও দোমনা ভাব নিয়ে রয়েছেন দেখি। আমি তাঁদের কাছে এই দ্বিধা ত্যাগ করার আবেদন রাখি ...।" ('বানান বিতর্ক' গ্রন্থের পৃ. ২২৯)

ক.বি.২-এর আরো কিছু কথা

এ-ব্যাপারে ক.বি.-২ বরং তাদের ভিত্তিপত্রের ৩ নম্বর প্রস্তাবে দ্বিধা ত্যাগ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। যেখানে বলা হয় — ''সংস্কৃত ইন্ (ণিনি, ঘিনুণ্, ইনি, বিনি) ভাগান্ত শব্দ প্রত্যয় যুক্ত অথবা সমাসবদ্ধ হলে এদের পদান্তের স্বর হ্রস্ব হয়ে থাকে : উপকারী (উপকারিন্)-উপকারিতা; অনুবর্তী (অনুবর্তিন্)-অনুবর্তিগণ; রক্ষী-রক্ষিগণ; গুণী (গুণিন্)-গুণিবৃন্দ। কিন্তু এইসব শব্দে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলে এই নিয়ম অনুসৃত হয় না : দেহরক্ষী—দেহরক্ষীরা, দেহরক্ষীবৃন্দ। লক্ষণীয়, বাংলায় শব্দগুলি ইন্-ভাগান্ত নয়, এবং বাংলায় সমাসবদ্ধ পদ বহুক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা শব্দ হিসেবে লিখিত হয়ে থাকে। অতএব এই শব্দগুলির বেলায় পদান্তে দীর্ঘস্বরের বদলে হ্রস্বস্বর লেখা যেতে

পারে।" ('বানান বিতর্ক' গ্রন্থের পৃ. ৩২৫) এবং এই সুপারিশ অনুযায়ী শ-দুয়েক ইন্-ভাগান্ত শব্দের শেষে প্রচলিত ঈ-কার বর্জন করে ই-কার যুক্ত বানানের তালিকা পেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আকাদেমি ও সংসদের সংস্কার-প্রক্রিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়নি, বরং এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ এ-ব্যাপারে মণীন্দ্রকুমার ঘোষের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বহু আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে সমস্ত ইন্-ভাগান্ত শব্দে বাংলায় অবিকল্প ই-কার ব্যবহারই সংগত। মনে হয়, ক.বি.-২ মণীন্দ্রকুমারের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়েই উক্ত প্রস্তাব পেশ করতে সাহসী হয়েছিল।

ইন্-ভাগান্ত শব্দে বাংলায় ই-কার প্রচলিত হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, বানান সরল হতো, ফলে বানান ভুলের সম্ভাবনাও অনেকটা কমত। সে-কারণে আচার্য মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্য একটু বিস্তারিতভাবেই এখানে তুলে ধরা দরকার। ক.বি.-১-এর কিছু কিছু সিদ্ধান্তের সমালোচনায় ছেচল্লিশ বছর আগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৩ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন : ''সমাসবদ্ধ খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বানানেও বিভ্রান্তি আছে। গুণিগণ না গুণীগণ? স্বামিসেবা না স্বামীসেবা? পক্ষিতত্ত্ব বা পক্ষীতত্ত্ব? মন্ত্রিপর্যায়ে না মন্ত্রীপর্যায়ে? প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই— বাংলায় মূল শব্দ 'গুণিন্, স্বামিন্, পক্ষিন্, মন্ত্রিন্' না 'গুণী, স্বামী, পক্ষী, মন্ত্রী'? সংস্কারসমিতি এপ্রসঙ্গে নীরব। এই বানান নিয়ে কিছু চিন্তা করেছিলেন সেযুগে 'প্রবাসী'র চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলতেন বাংলায় মূল শব্দ ইন্ ভাগান্ত নয়, অতএব বানান হবে 'মন্ত্রীগণ মন্ত্রীপুত্র মন্ত্রীসভা'।

''কিছুকাল আগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'ভারতকোষ' প্রকাশিত হয়েছে। দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত নিষ্ঠাবান্ যুবকেরা মিলে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। আশা করেছিলাম এই গ্রন্থে 'ইন্-ঈ'র গ্রন্থিমোচন হবে। দুঃখের বিষয় এঁরা সমস্যার দিকে নজর দিলেও জটিলতা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ভারতকোষ বলছেন : ''তৎসম শব্দে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইলেও স্থলবিশেষে ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সমাসের পূর্বপদস্থিত ইন্-ভাগান্ত শব্দ পরিচিত ক্ষেত্রে ই-কারান্ত না হইয়া ঈ-কারান্ত হইয়াছে, যথা 'যোগীগণ', 'মন্ত্রীসভা', 'অনুগামীগণ' ইত্যাদি।" 'পরিচিত ক্ষেত্রে' মানে কী? 'যোগীগণ' যদি চলে 'যোগীশ্রেষ্ঠ' চলবে? 'যোগীবর, যোগীরাজ, যোগীবেশ' চলবে কিনা বুঝি না। সম্পাদকমণ্ডলীতে একটি নাম আছে 'শশিভূষণ'— অর্থাৎ 'শশীভূষণ' চলবে না। 'শশীমোহন, শশীপদ, শশীমুখী, শশীসম, শশীনিভ, শশীসুলভ, শশীদেহ, শশীকলা, শশীভানু, শশীসূর্য, শশীতারকা, শশীপ্রীতি, শশীকর'— এই শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টা চলবে, কোন্‌টা চলবে না বুঝি না। কোন্ শব্দ পরিচিত? এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দরকার। কেউ কেউ বলেন, সমাসটা বাংলায় তৈরী হয়েছে, না, সংস্কৃতেই পূর্বে ছিল সেইটি দেখে সিদ্ধান্ত করতে হবে। সেটা যে সহজ নয় তাই বোঝাবার জন্যই 'শশী' বা 'শশিন্' শব্দ-যোগে কয়েকটি সমাসের উল্লেখ করলাম।

''পণ্ডিতেরা আমল না দিলেও এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে'' (পৃ. ৩৬)। এই মত প্রকাশ করেছিলেন তিনি ''বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত'' নামক প্রবন্ধে ১৩০৮ সালে, অর্থাৎ আশী বছর আগে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তিনি একথা বলেছিলেন তাঁর হ্রস্ব-ইকার প্রীতির জন্যই। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলা ভাষার লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভাল করে বিচার-বিবেচনা করেন নি। দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় 'ইন্'-কে 'ঈ' করা হয়েছে, এ ছাড়া এই বানানের তেমন কোন যৌক্তিকতা দেখি না।

''সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দের কেবল পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন দীর্ঘ-ঈকারান্ত। সমগ্র সুপ্ (২১টি) বিভক্তির ঐ একটি শব্দেই দীর্ঘ-ঈকার, আর সব শব্দে হ্রস্ব-ইকার। ক্লীবলিঙ্গ ইন্-ভাগান্ত শব্দে একটাও দীর্ঘ-ঈকার নেই। স্ত্রীলিঙ্গে 'ইন্'-স্থলে 'ইনী', অর্থাৎ এখানেও মূল শব্দের হ্রস্ব-ই রক্ষিত। তা হলে দাঁড়ায় ইন্-ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের মোট ২১ x ৩ = ৬৩ বিভক্তির মধ্যে একটিতে দীর্ঘ-ঈকার, আর ৬২টিতে হ্রস্ব-ইকার। প্রত্যয়যোগেও হ্রস্ব-ইকার— 'উপযোগিতা'।

''ইন্-ভাগান্ত শব্দে দীর্ঘ-ঈকার দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ ঋ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত বহু শব্দের পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনই বাংলায় মূলশব্দরূপে গৃহীত হয়েছে, যথা— পিতা, বণিক্, সম্রাট্, রাজা, আত্মা, যুবা। কিন্তু শব্দমাত্রেরই প্রথমার একবচন গৃহীত হয় নি— স্বরান্ত শব্দে দেবঃ, ফলম্, মুনিঃ, পতিঃ, সুধীঃ, শ্রীঃ, সাধুঃ, ধেনুঃ, ভূঃ, গৌঃ, এমনকি ব্যঞ্জনান্ত উদ্ভিৎ, আপৎ, বিপৎ, সম্পৎ, নিরাপৎ, প্রাঙ্, তির্যঙ্ প্রভৃতি রূপ বাংলায় গৃহীত হয় নি। 'প্রাক্ তির্যক্' প্রথমার একবচন বটে কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে।

''ইন্-ভাগান্ত শব্দ সর্বত্র দীর্ঘ-ঈকারান্ত হলে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই 'স্থায়ী কীর্তি, স্থায়ী আসন' অশুদ্ধ হবে, কারণ 'স্থায়ী' পুংলিঙ্গ, 'কীর্তি' স্ত্রীলিঙ্গ, 'আসন' ক্লীবলিঙ্গ। 'গুণী ব্যক্তি' ভুল, 'গুণী' পুংলিঙ্গ, 'ব্যক্তি' স্ত্রীলিঙ্গ। 'গুণী লোকেরা, গুণী লোকের, গুণী লোককে' ভুল, কারণ 'লোকেরা' বহুবচন, 'লোকের' ষষ্ঠী, 'লোককে' দ্বিতীয়া বিভক্তি। অর্থাৎ দীর্ঘ-ঈকারান্ত 'স্থায়ী, গুণী' অল্পক্ষেত্রেই সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত হয়। এরূপ স্থলে বাংলায় ইন্-ভাগান্ত শব্দকে হ্রস্ব-ইকারান্ত করলে সংস্কৃত নিয়মও লঙ্ঘন করা হয়েছে বলা চলে না। বানানের সরলতা ও সঙ্গতি দুয়ের জন্যই সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়কে বাংলায় ই-প্রত্যয় করা সঙ্গত।'' ('বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৪২-৪৪)

হয়তো মণীন্দ্রকুমারের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ক.বি.-২ ইন্-ভাগান্ত শব্দে সর্বত্র হ্রস্ব ই-কার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। অথচ তার এক দশক পরে সংস্কার-প্রক্রিয়া শুরু করেও আকাদেমি বা সংসদ-এর বানান-সমিতির সদস্যরা এই প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে যথোচিত মনোযোগ দিলেন না। তার পরিবর্তে মূল শব্দগুলিতে যেমন তাঁরা ঈ-কার বজায় রাখলেন, তেমনই ওইসব শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সমাসবদ্ধ রূপে এবং বাংলা প্রত্যয় যোগের ক্ষেত্রেও ঈ-কার অনুমোদন করলেন (যেমন 'মন্ত্রীসভা' 'মন্ত্রীগিরি'), ই-কার অবিকৃত রাখলেন শুধু সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলিতে (যেমন

'মন্ত্রিত্ব' 'প্রতিযোগিতা' 'সহযোগিতা' ইত্যাদি)। সংগত কারণেই 'শিক্ষাদর্পণ'-এর মার্চ ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভাষার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন : ''এতে ঝঞ্ঝাট অবশ্য একটু রয়েই গেল। কিছুকাল আগেকার ভিন্ন একটা প্রস্তাব ছিল ইন্-ভাগান্ত শব্দগুলিকেই ই-কারান্ত করে লেখার। অর্থাৎ কর্মী গুণী মন্ত্রী নয়, কর্মি গুণি মন্ত্রি। সাহস করে সেটা করতে পারলে বড়ো একটা সমস্যার নিরসন হতে পারত, যদিও আপত্তিও উঠত অনেক বেশি।'' ('বানান বিতর্ক', পৃ. ২৬৪)

হ্যাঁ, অনেকেই আপত্তি করতেন এ-কথা ঠিক, যেমন প্রতিটি সংস্কারের পরেই নানারকম বিতর্ক ও অযৌক্তিক বিরোধিতা আমরা লক্ষ করেছি। আর সেটা ঘটেছে বানান-সমিতিগুলি 'ধীরে চলার' নীতি গ্রহণ আর বৈপ্লবিক সংস্কারের পথ পরিহার করা সত্ত্বেও। সুতরাং বিরূপ সমালোচনার ভয়ে থেমে না-থেকে মণীন্দ্রকুমারের প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল বলেই একাংশ বানান-বিশেষজ্ঞের অভিমত। মজার ব্যাপার হলো, ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে আকাদেমি ও সংসদ মণীন্দ্রকুমার এবং ক.বি.-২-এর প্রস্তাবের প্রতি যথোচিত মনোযোগ না-দিলেও ওই দুই প্রতিষ্ঠানের বানান অভিধানে ই-কার যুক্ত 'দেশি বিদেশি' বানান শোভা পাচ্ছে। কী কারণে দেশী বিদেশী স্বদেশী বানানে ঈ-কার বর্জন করে ই-কার গৃহীত হলো তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। মনে হয় 'দেশী' ইন্-ভাগান্ত শব্দ নয় এই বিবেচনা থেকেই ই-কারের আগমন। ইতিপূর্বে আ.বা.প.-তে আমরা 'দেশি বিদেশি' বানান দেখেছি। তখন ওই প্রতিষ্ঠানের বানান নির্ধারকদের একজনের কাছে আমি তার কারণ জানতে চাই। তিনি বলেন, ''ওটা ইন্-ভাগান্ত শব্দ নয়, দেশীয় থেকে বাংলায় দেশি হয়েছে এবং অতৎসম শব্দে ই-কার প্রয়োগের নীতি অনুযায়ী 'দেশি বিদেশি' বানানই অনুমোদিত।'' কিন্তু পরে দেখেছি, এই ব্যাখ্যা তথ্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত নয়। এম. মনিয়ের উইলিয়াম্স-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে যথাক্রমে 'দেশিন্' 'দেশী' 'দেশীয়' তিনটি শব্দেরই অস্তিত্ব রয়েছে (পৃ. ৪৯৬, তৃতীয় কলামে)। সুতরাং আমি মনে করি, সমস্ত ইন্-ভাগান্ত শব্দ বাংলায় ই-কার দিয়ে লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে 'দেশি বিদেশি স্বদেশি' বানানও অবশ্যই চলতে পারে। কিন্তু যতদিন সেটা না-হচ্ছে ততদিন 'দেশী বিদেশী স্বদেশী' বানানই যুক্তিসম্মত।

প্রায় শ-দুয়েক তৎসম শব্দে সংস্কৃত নিয়মে ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কার দুই-ই অনুমোদিত। ইতিপূর্বে সেগুলোর অধিকাংশ ঈ-কার (বা ঊ-কার) দিয়ে লেখা হচ্ছিল। বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে আকাদেমি ও সংসদ ওইসব শব্দে ই-কার (ও উ-কার) প্রয়োগের বিধান দেয়। যেমন— অন্তরিক্ষ, অবনি, আবলি, উষা, গাণ্ডিব, ধমনি, ধরণি, বৈতরণি, শ্রেণি, সরণি প্রভৃতি। এ-ব্যাপারে আ.বা.প.-র নীতি ঠিক স্পষ্ট নয়। ওই সংস্থার পত্র-পত্রিকায় 'অন্তরিক্ষ গাণ্ডিব' লেখা হলেও 'ধমনি ধরণি' ব্যবহারের নজির নেই বললেই চলে। তবে বলা দরকার যে এ-ব্যাপারেও প্রথম সুপারিশ এসেছিল ক.বি.-২-এর পক্ষ থেকেই। সেখানে বেশ কয়েকটি শব্দ তালিকাভুক্ত করে প্রথম নিয়মটিতেই বলা হয়েছিল : ''সংস্কৃত শব্দে দীর্ঘস্বরের বিকল্পে হ্রস্বস্বর থাকলে

হ্রস্বস্বর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।”

কয়েকটি অতৎসম শব্দে ‘য’-এর পরিবর্তে ‘জ’ ব্যবহারের সুপারিশ করেছিল ক.বি.-১ (৬ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য), তবে এ-ব্যাপারেও ৭ নম্বর নিয়মে ‘জ’-এর ব্যাপক প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে ক.বি.-২, যা আকাদেমি ও সংসদ-এর বানান-বিধিতেও স্বীকৃত এবং ইদানীং অনুসৃত হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম দাসের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য— ...“আমরা কাজ, জুঁই, জোড়া, জাঁতা, জোগান, জোয়ান, জাউ, জুত, জায়গা— এ সবই স্বীকার করি এবং এসব বহু-প্রচলিত হয়েও পড়েছে। আগেকার সংস্কৃত-বাগীশেরা বাঙলা লেখার সময় সংস্কৃতের সঙ্গে মিল ধ’রে এগুলিতে ‘য’ দিতেন। সেদিন আর নেই। যত, যেন, যাহা, যে, যখন, যেমন এগুলির বানানও মধ্যযুগের পুঁথিতে ‘জ’ দিয়ে লিখতেই দেখা যায়, আর সেই হিসাবে মধ্যযুগের লেখার মুদ্রণেও তা পাওয়া যায়। গোলমালটা ঘটেছে উনিশ শতকে গদ্যনির্মাণের সময়ে, ঐ শাস্ত্রীদের হাতে, যাঁরা, ‘কাজ’কে ‘কায’ লিখতেন। কিন্তু মধ্যযুগে যা-ই হয়ে থাক, যে, যেন, যাহা, যত ইত্যাদি জনচিত্রে এতই দৃঢ়মূল হয়ে পড়েছে যে তা থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। তবে প্রচারপত্র যাঁদের হাতে আছে এমন ‘কী লিখবেন’ অথবা ‘ভিত্তিপত্র’ যদি সাহস ক’রে জে, জেন, জখন, জত ইত্যাদি ছাপাতে আরম্ভ করেন আমরা তাঁদের নমস্কারই জানাব।” (‘বানান বিতর্ক’, পৃ. ২৩৯-৪০)

দুঃখের বিষয়, অতিরিক্ত সংস্কৃতপ্রেমীদের কল্যাণে ইতিমধ্যে আমাদের অভ্যাসের মধ্যে ‘য’ এতটা দৃঢ়প্রোথিত হয়ে গেছে যে সর্বত্র ‘জ’ প্রয়োগের সাহস কেউই দেখাননি, স্বয়ং সুনীতিকুমারও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ‘জাওয়া’ বানান লিখতে পারেননি; ফলে অদূর ভবিষ্যতে এরকম প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুদূর ভবিষ্যতে বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা অনুযায়ী যদি কোনো ‘কেমাল পাশার’ আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি বাংলা বর্ণমালা থেকে ‘য’-কে ছেঁটে ফেলতে পারেন তাহলে সেই সুদিনকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষাই এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

চলিত ভাষা, কথ্য ভাষা

ক.বি.-১ তাদের ১২ নম্বর নিয়মে বলেছিল : ''কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ।— 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরানো, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে (যথা 'পেছন, ভেতর') তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা— 'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা— 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।"

এ-ব্যাপারে ক.বি.-২ তাদের ১৪ নম্বর নিয়মে বলেছিল : ''কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ : অভ্যেস, অসুবিধে, আগ্গেঁ, আদ্ধেক, ইচ্ছে, উঠোন, উনুন, ওপড়ানো, ওপর, ওলটপালট, ওলটানো, ওস্তাদি, কুয়ো, কুলো, খিদে, গুলো, জন্যে, জিগ্যেস, জুড়োনো, জুতো, তুলো, ধুলো, নতুন, নিকেল, নিচে, নিকোনো, নেবানো, নৌকো, পিত্যেশ, পুজো, পিছোনো, পেছোনো, পেছন, পুরোনো, পেছল, পেতল, বেঁধানো, ভেতর, মধ্যে, মিছে, মিথ্যে, মুক্তো, মুলো, মেটানো, লুকোনো, রুপো, শেকড়, শেয়াল, সত্যি, সিধে, সুতো, হিরে, হিসেব।"

দেখা যাচ্ছে, ক.বি.-১ যেখানে দু-রকম বিধান দিয়েছিল, সেখানে ক.বি.-২ কথ্য রূপেরই অবিকল্প ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ-বিষয়ে আকাদেমি বা সংসদ সুনির্দিষ্ট কোনো বিধি প্রণয়ন করেনি। আমাদের মনে হয় দুটো বিধিই অন্ধভাবে অনুসরণের অযোগ্য। তার কারণ ব্যাখ্যা করার আগে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ক.বি.-১-এর সুপারিশ সম্বন্ধে কী বলেছিলেন তা দেখে নেওয়া যাক। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৩ সংখ্যায় মণীন্দ্রকুমার লিখেছিলেন : ''মূলতঃ এই নিয়মটির উপরে নির্ভর করবে চলিত ভাষার প্রকৃতি। পূরাপূরি কথ্য ভাষা যে চলিত ভাষার উপযোগী নয়, সংস্কার-সমিতি এই নিয়ম প্রণয়ন করে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি চলিত ভাষায় গ্রহণীয় নয়। তার অর্থ— সবরকম কথ্য শব্দই চলিত ভাষায় প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সমিতি আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি লৈখিক ভাষায় সমর্থন করছেন না, অথচ মধ্য অক্ষর বা শেষ অক্ষরের বিকৃতি গ্রহণীয় মনে করছেন, এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের ধারণা, মৌখিক বিকৃতির কোন অংশ যদি সাহিত্যিক ভাষায় স্বীকৃতি পায়, তা হলে সর্ববিধ মৌখিক বিকৃতিই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পাবে। খুব কম লেখকই এই নিয়মটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা যেমন মধ্য বা শেষ অক্ষরে বিকৃতির 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন' লিখছেন, তেমনি আদ্য অক্ষরের বিকৃতিকেও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে না করে 'পেছন, পেতল, ভেতর, ওপর' নিরুদ্বেগে লিখে চলেছেন। এই সূত্রে তৎসম শব্দের বিকৃতিও প্রাকৃত বাংলাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের বিবেচনায়, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য কোন পদের সামান্য মৌখিক বিকৃতিকেও চলিত ভাষায় প্রশ্রয় দিলে

বানানে সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব হবে। যাঁরা বানান-সংস্কারে অগ্রণী হয়েছেন বা হবেন তাঁরা এই বিষয়ে সম্যক্ অবহিত না হলে কদাপি ঈপ্সিত বানান-সাম্য দেখা যাবে না। ... চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা এক নয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বিশেষ্য-বিশেষণ-নির্বিশেষে কথ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ চলিত ভাষায় এসে যাবেই। কিন্তু অতৎসম শব্দেরও মৌখিক বিকৃতি যদি 'নিয়মের মধ্যে' আমল না পায়, তাহলে অন্ততঃ তৎসম শব্দগুলি সাহিত্যিক ভাষায় বানান-বিকৃতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।" ('বাংলা বানান' গ্রন্থের পৃ. ২৬)

'চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা এক নয়', তা সত্ত্বেও 'কথ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ চলিত ভাষায় এসে যাবেই'— এ-কথা মণীন্দ্রকুমার স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি চান না যে তৎসম শব্দগুলির কোনোরকম বিকৃতিকে চলিত ভাষায় প্রশ্রয় দেওয়া হোক। আর সে-কারণেই অতৎসম শব্দগুলির মৌখিক বিকৃতিকেও নিয়মবদ্ধ করে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাবে সায় দেননি মণীন্দ্রকুমার। এমন-কি রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'অভ্যেস, জিগগেসা, সন্ধে, সুবিধে, বিদ্যে' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও তাঁর পছন্দ হয়নি, কেননা মূল শব্দগুলি তৎসম।

ক.বি.-১ কথ্য রূপ বর্জন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তৎসম ও অতৎসম শব্দের জন্য আলাদা নিয়ম সুপারিশ করেনি, বিকৃতি প্রথম অক্ষরে, না কি মধ্য বা শেষ অক্ষরে সেটাই ছিল তাদের বিবেচ্য। অন্যদিকে, ক.বি.-২ বিকৃতির ক্ষেত্রে তৎসম-অতৎসম নিয়ে যেমন মাথা ঘামায়নি, তেমনই বিকৃতির স্থান-নির্বিশেষে সর্বত্র কথ্য রূপগুলিই চলিত ভাষায় অনুমোদন করেছে। আমাদের মনে হয়, দুটো নিয়মই নির্বিচারে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে বহু প্রচলিত শব্দকেই নির্বাসনদণ্ড দিতে হবে।

ক.বি.-১ প্রথম বর্ণে বিকৃতির মাত্র চারটে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। এরকম আরো কয়েকটা শব্দ হয়তো পাওয়া যাবে। যেমন, পিছল (পেছল), নূতন (নতুন), শিকড় (শেকড়), শিয়াল (শেয়াল) প্রভৃতি। এর বেশি আপাতত মনে পড়ছে না। কিন্তু মধ্য বা শেষ বর্ণে বিকৃতির উদাহরণে ছ-টা শব্দ দেখানো হলেও আসলে সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি। ওই সুপারিশ মানতে হলে অভ্যাস, অসুবিধা/সুবিধা, অবশ্য, ইচ্ছা, জন্য, জিজ্ঞাসা, নৌকা, মিথ্যা, বিদ্যা, সত্য, সন্ধ্যা, হিসাব প্রভৃতি বহু শব্দ চলিত ভাষা থেকে বাদ যাবে। সবসময় অভ্যেস, অসুবিধে/সুবিধে, অবিশ্যি, ইচ্ছে, জন্যে, জিগ্যেস, নৌকো, মিথ্যে, বিদ্যে, সত্যি, সন্ধে, হিসেব প্রভৃতিই লিখতে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে সেটা কি সম্ভব? তা ছাড়া, প্রয়োজনে পেছন, পেতল, ভেতর, ওপর, শেকড়, শেয়াল প্রভৃতি শব্দও কি মা.চ.বা.-য় লেখা যাবে না? সর্বদাই কি 'মিছে কথা', 'মিথ্যে কথা' বা 'সত্যি কথা' লিখতে হবে, 'মিথ্যা'-র মতোই 'সত্য' বলাও বারণ? এবং 'উঠন, উনন' যে ইতিমধ্যেই 'উঠোন উনুন' হয়ে গেছে, সেগুলোর পুরনো রূপ কি আর ফিরিয়ে আনা যাবে?

পক্ষান্তরে, ক.বি.-২ শুধু কথ্য রূপগুলিই সুপারিশ করেছে। তাই তাদের বিধান অনুযায়ী অভ্যাস, অসুবিধা/সুবিধা, অবশ্য, ইচ্ছা, জন্য, জিজ্ঞাসা, নৌকা, মিথ্যা, বিদ্যা,

সত্য, সন্ধ্যা, হিসাব প্রভৃতির মতো উপর, পিছন, পিছল, পিতল, ভিতর, শিকড়, শিয়াল প্রভৃতিও বাতিল।

এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিবেদনের আগে অন্য একটা কথা বলে নিই। 'উপর, পিছন, পিছল, পিতল, ভিতর, শিকড়'-এর প্রথম বর্ণের বিকৃতির পরে উচ্চারণও খানিকটা বদলে গেল। সাধু রূপগুলোর মধ্যবর্ণের উচ্চারণ ছিল 'অ', কিন্তু ওপর, পেছন, পেছল, পেতল, ভেতর, শেকড়-এর মধ্যবর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও এসে গেছে। অর্থাৎ শেষোক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে ওপ'র (ওপোর্), পেছ'ন (পেছোন্), পেছ'ল (পেছোল্), পেত'ল (পেতোল্), ভেত'র (ভেতোর্), শেক'ড় (শেকোড়্)। শেয়াল-এর মধ্যবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকার কারণ আ-কার।

এবার মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। উল্লিখিত শব্দগুলোর সাধু ও কথ্য উভয় রূপই চলিত ভাষায় চলবে কি না। কথ্য রূপের ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েও আচার্য মণীন্দ্রকুমার স্বীকার করেছেন যে "কথ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ চলিত ভাষায় এসে যাবেই।" আমরা লক্ষ করেছি, 'কিছু কিছু' নয়, বহু কথ্য শব্দই ক্রমশ বেশি করে মা.চ.বা.-য় ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ কালের বিচারে তাঁর আপত্তি টেকেনি। যেমন টেকেনি 'দিক্, বণিক্, সম্যক্' প্রভৃতি শব্দ থেকে হসন্ত লোপ এবং 'অন্ততঃ, ক্রমশঃ, প্রধানতঃ, প্রায়শঃ' প্রভৃতি শব্দ থেকে বিসর্গ লোপ সম্পর্কিত তাঁর আপত্তিও। হয়তো সংস্কৃতের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের ফলেই তিনি ক.বি.-১-এর ওই দুটি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি, যদিও ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যে উদারতার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

আসলে সেই 'সবুজ পত্র'-র যুগ থেকে অনেকদিন ধরেই অনেকে বলেছেন যে 'চলিত ভাষা' 'উচ্চ চিন্তার বাহন' হতে পারে না। পরে দেখা গেছে, চলিত ভাষায় উচ্চ চিন্তার প্রকাশ অবশ্যই সম্ভব। বলবার অপেক্ষা রাখে না যে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বয়ং মণীন্দ্রকুমার স্বীকার করেছেন যে 'চলিতভাষায় বহু দর্শন-বিজ্ঞানের সাহিত্য আমরা পেয়ে গেছি'। কিন্তু কথ্যভাষা আর চলিতভাষা তো এক নয়, তাই কথ্যভাষায় উচ্চশ্রেণির সাহিত্য রচিত হতে পারে না বলে কেউ-কেউ মতপ্রকাশ করলেন। আমাদের প্রশ্ন, সাহিত্য বলতে কি শুধু প্রবন্ধ-নিবন্ধই বোঝায়? গল্প-উপন্যাস-নাটকও কি সাহিত্য নয়? এবং সেখানে কি কথ্যভাষা, এমন-কি আঞ্চলিক ভাষারও সার্থক প্রয়োগ আমরা লক্ষ করিনি? সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-কে কি উচ্চশ্রেণির সাহিত্য বলা হয় না? শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় এবং 'বহুরূপী'-র প্রযোজনায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'-এর সফল নাট্যায়নের কথাও কি আমরা ভুলতে পারি? আরো একটা নাটকের কথা আমার মনে পড়ছে—চিত্রভানু ভৌমিকের সিলেটি উপভাষায় লেখা 'লালমোহনর (লালমোহনের) সংসার', ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। মঞ্চস্থ করেছিল শিলচরের 'দশরূপক' নাট্যসংস্থা। অত্যন্ত সিরিয়াস নাটক। ওঝা সম্প্রদায়ের জীবনের এক ট্র্যাজিক রূপ তুলে ধরা হয়েছিল সেখানে। পরিচালক হিসেবেও চিত্রভানু এক চমৎকার উচ্চমানের

নাট্য আমাদের উপহার দিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নাটকে তো চরিত্রগুলো কথা বলে, সেখানে মুখের ভাষা বা কথ্যভাষা (এমন-কি অঞ্চলবিশেষের ভাষাও) উচ্চারিত হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? বেশ, নাটকের কথা বাদ দেওয়া যাক। কিন্তু গল্প-উপন্যাস? সেখানেও তো সংলাপের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। চরিত্রগুলোর মুখের ভাষায় কি তাদের শিক্ষা-পেশা-রুচি-বয়স-সামাজিক অবস্থানের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে না? তাহলে সাহিত্য থেকে কথ্য ভাষার বিসর্জনের প্রশ্নটাই কি অবান্তর নয়? আর কবিতা? সেখানেও কথ্য শব্দ ব্যবহারের নিদর্শন ভূরি ভূরি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বহু আটপৌরে শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ কি আমরা ভুলতে পারি?

আসলে, আমাদের মনে হয়, ভিন্ন রূপের দোহাই দিয়ে যে-সব শব্দের প্রয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টা করা হয়েছে তার কোনোটাই ব্রাত্য নয়। ভাষার প্রসাদগুণ বজায় রেখে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে ওইসব শব্দের যে-কোনোটার সুষ্ঠু প্রয়োগ চলিতভাষায় সম্ভব। কোথায় কোন্ শব্দ ব্যবহার করলে সাবলীলতা অক্ষুণ্ণ থাকে সেটাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। 'দ্বার' শব্দটির কথ্য কয়েকটি রূপ এইরকম— দুয়ার, দুয়োর, দোর। এর মধ্যে কোন্‌টাকে আমরা মা.চ.বা.-য় প্রবেশাধিকার না-দেওয়ার ফতোয়া জারি করতে পারি? যাকে বলা হয়েছে মৌখিক 'বিকৃতি' তাকে শব্দের 'রূপান্তর' আখ্যা দিতেই-বা অসুবিধে কোথায়? জীবিত ভাষায় এরকম রূপান্তর এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং মুখে ব্যবহৃত হতে হতে একসময়ে সাহিত্যেও স্থান করে নেয়। আর ভাষার ওপর যাঁদের দখল আছে তাঁদের কলমে ওইসব শব্দের শিল্পিত প্রয়োগও সম্ভব হয়ে ওঠে।

শব্দের রূপান্তরকে সবসময় 'বিকৃতি' অভিধায় ভূষিত করা উচিত কি না সেটাও বোধহয় ভেবে দেখা উচিত। কারণ 'বিকৃত' বা 'বিকৃতি' শব্দের অর্থের মধ্যে 'দোষ' বা 'অস্বাভাবিকতা'-র ইঙ্গিত রয়েছে। অথচ কালক্রমে শব্দের ওই রূপান্তর-প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে, তাতে দোষের কিছু নেই। সে-কারণে সংস্কৃত শব্দের অর্ধ-তৎসম বা তদ্ভব রূপগুলিকে আমরা 'বিকৃত' শব্দ বলি না। এইরকম রূপান্তর আগে হয়েছে, এখনও হচ্ছে, আগামীদিনেও হবে। বিভিন্ন ধরনের বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত রূপ-যে বাংলায় কিছুটা পালটে গেছে তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? আরবি 'আক্‌ল', ফারসি 'গিরিফতার', ইংরেজি 'টেব্‌ল' বাংলায় যথাক্রমে 'আক্কেল', 'গ্রেপ্তার' বা 'গ্রেফতার', 'টেবিল' হয়েছে। এরকম দৃষ্টান্ত অজস্র।

যাঁরা ভাষাকে ভালোবাসেন, ভাষার চর্চা করেন তাঁরা চলিত ভাষাতেও শব্দব্যবহারে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। উল্লিখিত কোনো নিয়মের তাঁদের প্রয়োজন হয় না। 'ভেয়ের বে' কিংবা 'গেনু, করনু, ছ্যালো' নিতান্ত চরিত্রানুগ সংলাপ ছাড়া মা.চ.বা.-য় ব্যবহৃত হয় না। কই, তার জন্যে তো কোনো নিয়ম রচনার দরকার হয়নি। তথাকথিত কিছু 'সাধু' শব্দের মৌখিক ভিন্ন রূপ চলিত ভাষায় প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাই সুস্পষ্ট কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সংগত নয় বলেই আমাদের ধারণা। কোন্ শব্দের পাশে

কোন্ শব্দ খাপ খায় সেটা লেখকের বিচার্য বিষয়। স্বীকার্য, তাঁর সিদ্ধান্তে কখনো-কখনো নান্দনিকতার প্রকাশ না-ও ঘটতে পারে, কিন্তু পাঠকদের বা অন্যান্য লেখকের নজরে ত্রুটিটা ধরা পড়ে, ফলে তা ব্যাপক ছাড়পত্র পায় না।

এইসূত্রে 'উপর' ও 'ওপর'-এর আলাদা প্রয়োগের একটা সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইংরেজি and শব্দটির দুরকম প্রয়োগ রয়েছে— দুটো শব্দের মধ্যে আর দুটো বাক্যাংশের মধ্যে। দুটো বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হলে and-এর আগে একটা কমা বসানোর রীতি রয়েছে, যা দুটো শব্দের মধ্যে থাকলে (যেমন Ram and Shyam) দরকার হয় না। বাংলায় 'ও' আর 'এবং' দুটোই সমার্থক, তবে এখানেও আলাদা প্রয়োগের কথা কেউ-কেউ বলেছেন (রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ দুটো শব্দের মধ্যে বসলে 'ও' লেখা হবে (যেমন রাম ও শ্যাম) আর দুটো বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হলে 'এবং'। 'এবং'-এর পরিবর্তে 'আর' লেখারও প্রচলন রয়েছে। অনুরূপভাবে, আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী বাসব রায়ের প্রস্তাব— ইংরেজির on বোঝাতে 'ওপর' আর up/ above বোঝাতে 'উপর' ব্যবহার করা হোক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : 'টেবিলের ওপরটা স্তূপাকার হয়ে আছে', 'সে খাটের ওপরে শুয়ে আছে'; up and down-এর বাংলা 'উপর-নীচ', কিংবা 'ঘুড়িটা অনেক উপরে উঠে গেছে', 'বিমানটা অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি। প্রস্তাবটা আমার ভালো লেগেছে, মৌখিক আলোচনায় কেউ-কেউ অনুমোদন করেছেন। তবে এটাও বলে রাখি, কারো-কারো কাছে এরকম অর্থ-বিভাজন সমর্থনযোগ্য মনে না-ও হতে পারে। এখানে একটা সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করা হলো মাত্র।

একটা উদাহরণ দিয়ে এ-প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানা যাক। আমরা লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি মণীন্দ্রকুমারের শ্রদ্ধা ছিল অসীম আর তার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই বাক্যটিতে— "তাঁরই জীবন ও রচনা থেকে আহৃত মন্ত্র লেখককে সুদীর্ঘকাল সুখে দুঃখে সঞ্জীবিত রেখেছে।" তা সত্ত্বেও নিজের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো শব্দের প্রয়োগ মণীন্দ্রকুমার সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথের চলিতভাষায় লেখা প্রবন্ধে 'অভ্যেস, সন্ধে, সুবিধে, বিদ্যে' প্রভৃতি মণীন্দ্রকুমারের পছন্দ হয়নি, যদিও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলো অস্বাভাবিক ঠেকে না। পক্ষান্তরে, আচার্য মণীন্দ্রকুমারের পাণ্ডিত্যের প্রতি আমরাও বিনম্রচিত্তে নতজানু। তাই কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গে বলছি— চলিতভাষায় লেখা প্রবন্ধে মণীন্দ্রকুমারের একাধিক বার 'পূরাপূরি' ব্যবহার আমাদের মনঃপূত হয়নি। হয়তো সংস্কৃত-প্রীতি এবং তথাকথিত 'সাধু' শব্দের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ওই শব্দটি প্রয়োগের কারণ। সসংকোচে নিবেদন করি, সম্পূর্ণ অর্থে 'পূরা' একটি তৎসম শব্দ, কিন্তু 'পূরাপূরি'-র অস্তিত্ব সংস্কৃত অভিধানে নেই। আগে সাধুভাষায় 'পুরাপুরি' ব্যবহৃত হতো, যা চলিত বাংলায় 'পুরোপুরি' হয়েছে। সুতরাং মা.চ.বা.-য় 'পুরোপুরি'ই পুরোপুরি খাপ খায় বলে আমাদের ধারণা।

য়-শ্রুতির অপপ্রয়োগ, অন্তঃস্থ ব-এর লিপ্যন্তর

এবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। কোনো শব্দের উচ্চারণে যদি y-glide বা য়-শ্রুতি আসে তাহলে বাংলায় আমরা 'য়' দিয়ে বানান লিখতে পারি। আর সেটা তৎসম, অতৎসম, অন্য ভাষা থেকে আগত কিংবা বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তর প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এয়ো, খেয়ো, দয়া, দিয়ো, নিয়ো, বয়েস, ভয়ে, যায়, ওয়ে (way), ওয়েল (well), ওয়ার (ware) ইত্যাদি বহু শব্দে য় সঠিকভাবেই ব্যবহৃত। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ এবং প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে অজস্র বাংলা শব্দে তো বটেই, অন্য ভাষা থেকে আগত আর বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরেও অকারণে য় দিয়ে বানান চালু করা হয়েছে। সেটা করেছেন সেইসব পণ্ডিত যাঁদের বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের প্রতি আনুগত্য ছিল বেশি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ, এমন-কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের জানিয়েছেন যে বাংলায় গায়ে সংস্কৃতের পোশাক চাপিয়ে তাঁরা গৌরব বোধ করতেন। ফলে অপ্রয়োজনে য়-শ্রুতি অসংখ্য বাংলা শব্দে জাঁকিয়ে বসল, প্রাকৃতে প্রচলিত প্রচুর 'আ' বাংলায় 'য়া' হয়ে গেল, যা প্রকৃতপক্ষে অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। শুধু তা-ই নয়, আকার যুক্ত অন্তঃস্থ 'ব'(ৱা)-কেও তাঁরা 'য়া' করে দিলেন। এভাবেই তৎসম 'গুৱাক' থেকে আগত প্রাকৃতের 'গুআ' সংস্কৃত পণ্ডিতদের কল্যাণে বাংলা বানানে 'গুয়া' হয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় শব্দের শেষে 'আ'-যুক্ত প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলো পরবর্তীকালে 'য়া' হয়েছে। এই রচনার প্রথমদিকে আমি তার বহু দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, এখানে পুনরুল্লেখ করে আয়তন আর বাড়াতে চাই না। আমরা উচ্চারণ করি 'জাওআ' 'পাওআ', কিন্তু লিখি ' যাওয়া' 'পাওয়া'। এরকম ভূরি ভূরি। এইসব বানান দীর্ঘকাল ধরে এতটাই প্রচলিত এবং আমরাও লিখতে অভ্যস্ত-যে এখন আর এ-নিয়ে নতুন করে ভেবে লাভ নেই।

অন্তঃস্থ-ব (ৱ)-এর লিপ্যন্তরের সমস্যারও সন্তোষজনক সমাধান হয়নি। একসময়ে আচার্য সুনীতিকুমার বিষয়টা নিয়ে ভেবেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩২৪ সনের বৈশাখ (ইং এপ্রিল ১৯১৭) সংখ্যায় 'বাঙ্গালা বানান-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দুটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এক. অন্তঃস্থ-ব লেখার জন্য ব-এর ডানদিকে ফুটকি দিয়ে 'ব.' লেখা যেতে পারে। দুই. 'ওআ' বা 'ওা' (পূর্ববর্ণে উ-কার থাকলে অবশ্য সেটা বজায় রেখে 'অ' বা 'আ' লিখলেই চলে, যেমন— অসমিয়া পদবি 'দুৱরা', 'বরুৱা' লেখা যায় 'দুঅরা', 'বরুআ' হিসেবে) লিখুন। পুরনো পুঁথিতেও 'ওআ' 'ওা' লেখা হতো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ('বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের পৃ. ১২০, ১২৩ দ্রষ্টব্য)

আমাদের মনে হয়, সুনীতিকুমারের দ্বিতীয় প্রস্তাবের 'ওআ' অধিকতর যুক্তিসম্মত এবং বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে সহজে লেখা যায়। ('ওা' চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ বাংলায় দুটো স্বরবর্ণ পাশাপাশি বসলেও কোনো স্বরবর্ণের পরেই আ-কার ব্যবহৃত হয় না। স্বরবর্ণের পরে অন্য স্বরচিহ্নও তখনই বসে যখন সেটা কোনো

ব্যঞ্জনবর্ণের সংলগ্ন। যেমন, খাবারের, হিসাবের, ওয়েল, ওয়েটারের প্রভৃতি।) অথচ এ-ব্যাপারেও সর্বজনমান্য সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব আমরা অনুভব করছি। অন্তঃস্থ্-ব (ৱ) ইংরেজিতে কোথাও w, আবার কোথাও v দিয়ে লেখা হয়। সুনীতিকুমারের প্রস্তাব অনুযায়ী wa-র লিপ্যন্তর না-হয় 'ওআ' করা গেল (যদিও 'ওয়া' থেকে এখনও আমরা বেরোতে পারিনি), কিন্তু v-এর ক্ষেত্রে কী হবে? দেবনাগরীতে অন্তঃস্থ্-ব যুক্ত 'ৱেংকাইয়া' 'ৱেংকটরামন' ইংরেজিতে যথাক্রমে 'Venkaiah' 'Venkataraman', বাংলায় এই দুটো শব্দের বানানের আদ্যক্ষরে একাংশ লেখেন 'বে', অন্যরা লেখেন 'ভে' অর্থাৎ 'বেঙ্কাইয়া' 'বেঙ্কটরামন' এবং 'ভেঙ্কাইয়া' 'ভেঙ্কটরামন'।

যা-ই হোক, য়-শ্রুতির অপব্যবহারের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আদিতে 'আ' রয়েছে এমন বেশ কয়েকটি আরবি-ফারসি মূল শব্দের (আইন, আক্কেল, আদব, আন্দাজ, আবরু প্রভৃতি) সঙ্গে ফারসি 'বে' উপসর্গ-যুক্ত শব্দ বাংলায় প্রচলিত, যেখানে উচ্চারণানুগ 'আ' অবিকৃত থাকার কথা। সেকারণে বেআইনি, বেআক্কেল, বেআদব, বেআন্দাজ, বেআবরু প্রভৃতি বানানই সংগত। কিন্তু যাঁরা অবলীলায় বেআইনি, বেআন্দাজ, বেআবরু লেখেন (কখনো বেয়াইনি, বেয়ান্দাজ, বেয়াবরু বানান দেখেছি বলে মনে পড়ে না) তাঁরা কোন্ যুক্তিতে বেয়াক্কেল, বেয়াদব (বা বেয়াদপ) লিখতে সংকোচ বোধ করেন না? শেষোক্তদের প্রভাবেই 'ও'-এর পরে 'আ'- উচ্চারণযুক্ত বহু বিদেশাগত শব্দেও অযথা 'য়া' প্রচলিত হয়েছে, যেমন— ওয়াইন, ওয়াইপার, ওয়াকি-টকি, ওয়াকিবহাল, ওয়াক্‌ফ, ওয়াটার, ওয়াদা, ওয়ারিশ প্রভৃতি। এরকম বানান যাঁরা প্রচলন করেছেন তাঁদের মনোভাব বোধহয় এই যে, উচ্চারণে য়-শ্রুতি না-থাকলেও বানানে 'য়' ব্যবহার করে শব্দগুলোকে বাংলায় জাতে তোলা হচ্ছে!

এই অযৌক্তিক ব্যাপার লক্ষ করে রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার সমস্যার দিকে খানিকটা নজর দিয়েছিলেন, কিছু-কিছু বানানে 'য়' 'য়া'-র পরিবর্তে 'অ' 'আ' ব্যবহার করেছেন। সুনীতিকুমার অসংখ্যবার 'মানোয়েল'-এর পরিবর্তে 'মানোএল'ও লিখেছেন। পরে ক.বি.-১ বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বানানবিধিতে একটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করে। তাদের ১৮ নম্বর নিয়মে বলা হয় : ''য়।— নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে 'য়, য়া, য়ো' লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া 'এডওআর্ড, ওঅর-বণ্ড্' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' বানানে দোষ নাই।''

দুঃখের বিষয়, এই নিয়মটার প্রতি পরবর্তীকালে বানান-সংস্কারকগণ যথোচিত মনোযোগ দিলেন না, মূল প্রস্তাবটি অনুসরণ করে সময়োপযোগী কিছু পরিবর্তন-সহ সুপারিশও তাঁদের বানানবিধিতে সন্নিবিষ্ট হলো না। একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ ভট্টাচার্য। তিনি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছেন এবং বহু বানানে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সে-প্রসঙ্গ পরে। তার আগে দেখে নেওয়া যাক উল্লিখিত নিয়মটির বিরোধিতা করে মণীন্দ্রকুমার

ঘোষ কী লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের অনেকখানি এখানে তুলে ধরতে হচ্ছে, কারণ তাঁর কয়েকটা মন্তব্য আমরা নির্বিচারে মেনে নিতে পারছি না। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় ১৩৮৩ সনের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা বানান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ক.বি.-১-এর নিয়মাবলির বিস্তারিত আলোচনায় ১৮ নম্বর নিয়মটি সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার লেখেন : ''এই নিয়মে সংস্কার-সমিতি phonetics-এর দৌরাত্ম্য দেখিয়েছেন বটে। যা-কিছু পুরাতন সব বিসর্জন দিতে হবে। নইলে ধ্বনিবিজ্ঞান রসাতলে যায়। মনে আছে 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'খাওয়া, যাওয়া'-কে কিছুকাল 'খাওা, যাওা' লিখতেন। ঐ বানান চলল না। সংস্কার-সমিতি অবশ্য বিদেশী শব্দের কথা বলেছেন, তা-ও নবাগত। কিন্তু কোন্‌টা নবাগত, কোন্‌টা পুরাতন, আমরা যে হদিস পাই না। 'জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি' নবাগত? অনেকেই লিখছেন 'জানুআরি, ফেব্রুআরি'। 'আনা, আনি' বিদেশী প্রত্যয়— 'বাবুআনা, হিন্দুআনি' না 'বাবুয়ানা, হিন্দুয়ানি'? 'ওয়ালা' কি বিদেশী প্রত্যয়? 'ওআলা'তে যে অস্থির হয়ে পড়েছি। 'ওআরেন হেস্টিংস, কর্নওআলিস' নবাগত? আমরা তো জানি তাঁরা ক্লাইব (না ক্লাইভ)-এর পরেই এসে গেছেন। অন্তঃস্থ য, অন্তঃস্থ য় সংস্কার-সমিতির চক্ষুঃশূল। 'খাওয়া, যাওয়া'-কে যদি 'খাওআ, যাওআ' না করা যায়, বিদেশী শব্দেও ও-কারের পর অ আ না থাকলে মারাত্মক অপরাধ হবে না। সংস্কার-সমিতি 'য়' শব্দের পূর্বে 'অনর্থক' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এতেই মনে হয় 'য়'-র প্রতি সমিতির কতটা বিরাগ। ''উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত''— মোটেই 'অকারণে' নয়, যথেষ্ট 'কারণ' আছে। বহুকাল যাবৎ উ-কার ও-কারের পর য় লেখা হচ্ছে। এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। একে বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বলব 'অকারণে' 'উ' এবং 'ও'-র পরে 'অ আ'-কে টেনে আনা হয়েছে। যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল না সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রমাণ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ। তাঁরা একই গ্রন্থে 'জানুআরি জানুয়ারি, ওআলা, ওয়ালা' সবই চালাচ্ছেন। ১৯৩৭-এর পূর্বে বানানে অনেক অনাচার ছিল, কিন্তু এই উপদ্রব কোন কালে ছিল না। তার পর 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম'-কে এত করুণা কেন? 'চলিতে পারে কথার অর্থ কী? মনে হয় 'না চলিলেই' ভাল হয়। Phonetics তাই বলে নাকি? আমাদের তো ধারণা 'মেঅর, চেআর, রেডিঅম' ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান। 'ইয়া' না লিখে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন 'ইআ'। আমরা মনে করি এই বানান ধ্বনির দিকে নজর রেখে করা হচ্ছে না, কেবল 'নোতুন কিছু করো'-র ঝোঁক।... 'উআ, ওআ'তে কর্ণ পীড়িত না হলেও চক্ষু পীড়িত হয়। 'অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য'র চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে এই বানান-বিধিটি।'' ('বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থের পৃ. ৬৭-৬৯)

আমরা জানি, রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমারকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন মণীন্দ্রকুমার। উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় তৃতীয় বন্ধনীর ভিতর তিনি লিখেওছিলেন— ''... এই প্রবন্ধে কয়েকজন সাহিত্যিক ও অধ্যাপকের নাম করা হয়েছে। এঁরা সকলেই প্রবন্ধলেখকের শ্রদ্ধাভাজন। যাঁদের সঙ্গে লেখকের মতানৈক্য দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই কেবল শ্রদ্ধাভাজন নন, ভক্তিভাজন। আচার্য্য সুনীতিকুমারের প্রতি লেখকের কৃতজ্ঞতা

অপরিসীম। বহুকাল যাবৎ নানা ভাবে লেখক তাঁর কাছে ঋণী।...” আমিও আচার্য মণীন্দ্রকুমার সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত পোষণ করি। সেইসঙ্গে মনে করি, দ্বিমত প্রকাশ করার শিক্ষাও তিনি আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং, পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ, উপরোক্ত নিয়মটির প্রসঙ্গে কেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই তা ব্যক্ত করলে সেটাকে কেউ যেন অশ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য না-করেন।

মণীন্দ্রকুমার উক্ত বিধিকে “‘অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য’র চূড়ান্ত নিদর্শন” আখ্যা দিলেও আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে সেটা রচিত হয়েছিল রাজশেখর ও সুনীতিকুমারের সম্পূর্ণ অনুমোদন নিয়ে। আর যখন বলা হয় ‘কর্ণ পীড়িত না হলেও চক্ষু পীড়িত হয়’ তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে যুক্তি নয়, মণীন্দ্রকুমার মর্যাদা দিতে চাইছেন প্রচলিত অভ্যাসকে। ঠিক যেমন এককালে রেফের সঙ্গে দ্বিত্ব বর্জন এবং অতৎসম শব্দে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের প্রচলিত অভ্যাসকে ঢাল হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল। কর্ণ যেহেতু পীড়িত হয় না সেহেতু পরিবর্তিত বানানই-যে সঠিক উচ্চারণের বাহক তা মণীন্দ্রকুমারের মন্তব্য থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি। এবার তাঁর বিভিন্ন আপত্তি নিয়ে একে-একে আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রথমত, নিয়মটিতে ‘যা কিছু পুরাতন সব বিসর্জন’ দেওয়ার কথা আদৌ বলা হয়নি। শুধু উ-কার ও ও-কারের পরে যে-সব শব্দে আদৌ য়-শ্রুতি নেই সেগুলি থেকেই য়-র পরিবর্তে উচ্চারণ অনুযায়ী অ বা আ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এবং সেটাও শুধু বিদেশী শব্দে, দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত বহু বাংলা শব্দে অযৌক্তিকভাবে য় ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর কোনোরকম পরিবর্তন ক.বি.-১ সুপারিশ করেনি। আর ‘খাওা, যাওা’ কেন চলেনি তার ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি। হ্যাঁ, স্বীকার করি, সমিতির সদস্যগণ ‘নবাগত’ বিশেষণ প্রয়োগ না-করলেই পারতেন এবং শুধু বিদেশী নয়, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রেও নিয়মটা প্রযোজ্য বলে বিধান দিতে ভালো হতো। আর সেটা হলেই জানুআরি, ফেব্রুআরি, বাবুআনা, হিন্দুআনি, ওআরেন হেস্টিংস, কর্নওআলিস বানান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কমে যেত।

দ্বিতীয়ত, মণীন্দ্রকুমারের প্রশ্ন : ‘খাওয়া, যাওয়া’-কে যখন ‘খাওআ, যাওআ’ করা হচ্ছে না তখন বিদেশী শব্দের বাংলা বানানেও য়, য়া বজায় রাখা হবে না কেন? আমাদের বক্তব্য, প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাকৃতের ওইরকম বহু বানানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা জোর করে বাংলায় য় চালানোর ফলে প্রায় তিনশো বছরের অভ্যাসে সেটা দৃঢ়প্রোথিত হয়ে গেছে বলে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দেও কি অন্ধভাবে সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতে হবে? এক ধরনের ভুলকে মেনে নিতে হচ্ছে বলেই অন্যতর ভুলকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? বানান সমিতির পক্ষ থেকে “অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত” মন্তব্য উদ্ধৃত করে মণীন্দ্রকুমার বলেছেন— “মোটেই ‘অকারণে’ নয়, যথেষ্ট ‘কারণ’ আছে।” কী সে কারণ? “বহুকাল যাবৎ উ-কার ও-কারের পর য় লেখা হচ্ছে। এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে।” আমরা মনে করি, এই ‘কারণ’-এর পিছনে যুক্তির অনুমোদন নেই,

রয়েছে অভ্যাসের দাসত্ব করার মানসিকতা। 'বহুকাল যাবৎ' সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহকে আমরা 'ঐতিহ্য' হিসেবে লালন করেছিলাম, তা সত্ত্বেও ওইসব কুপ্রথা কি রদ করা হয়নি? সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দগুলির বাংলায় ঈ-কার প্রাপ্তিতে খেদ প্রকট এবং ই-কার ব্যবহারই সংগত এই অভিমত প্রকাশ করে মণীন্দ্রকুমার লিখেছিলেন, ''দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় 'ইন্‌'-কে 'ঈ' করা হয়েছে, এ ছাড়া এই বানানের তেমন কোন যৌক্তিকতা দেখি না।'' ('বাংলা বানান', পৃ. ৪৩) তাঁর ওই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে আমরাও এক্ষেত্রে বলতে চাই, দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় 'অ' 'আ'-কে 'য়' 'য়া' করা হয়েছে, এ ছাড়া এই বানানের তেমন কোনো যৌক্তিকতা দেখি না।

তৃতীয়ত, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করে মণীন্দ্রকুমার মন্তব্য করেছেন, ''তাঁরা একই গ্রন্থে 'জানুআরি জানুয়ারি, ওআলা ওয়ালা' সবই চালাচ্ছেন।'' অথচ এই বিশৃঙ্খলা কেন ঘটছে সেটা তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই খোদ মণীন্দ্রকুমারকে ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮ তারিখে লেখা একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন (''চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।... প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে— সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত। সেই কারণেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই।'') এবং কবির কৈফিয়ত সংবলিত সম্পূর্ণ চিঠিটি মণীন্দ্রকুমার পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ. ১৮-১৯) ছেপেওছেন। সুতরাং অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থত, তিনি যখন লেখেন '''মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম'-কে এত করুণা কেন? 'চলিতে পারে' কথার অর্থ কী?... আমাদের তো ধারণা 'মেঅর, চেআর, রেডিঅম' ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান'' তখন আমরা রীতিমতো আশ্চর্য হই। কেননা বানান-সমিতির নিয়মে 'চলিতে পারে'-র কারণ ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ''কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না।'' সেজন্যই এইসব বানান পালটানোর প্রশ্নও ওঠেনি। সুতরাং ক.বি.-১ তো পরোক্ষভাবে স্বীকারই করে নিয়েছে যে মেঅর, চেআর 'ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান' এবং ওইসব শব্দের উচ্চারণে য়-শ্রুতি থাকায় য়-যুক্ত বানান অপরিবর্তিত রাখার কথাই বলা হয়েছে। তাহলে আর আপত্তি বা বিরূপ সমালোচনা কেন?

'হার্ডওয়ার' (hardware) বা 'ওয়ার' (ware) বানানে 'দোষ' না-থাকার কারণও তো স্পষ্ট— ওই জাতীয় শব্দের ইংরেজি উচ্চারণে y-glide রয়েছে। শব্দ দুটির সঠিক উচ্চারণ যথাক্রমে 'হা-ড্‌ওয়েঅ(র্‌)' ও 'ওয়েঅ(র্‌)', তবে ইংরেজির প্রথম অনুচ্চারিত r বাংলায় আমরা উচ্চারণ করে থাকি, তাই 'র্ড'। অনুরূপভাবে, hard শব্দের উচ্চারণ 'হা-ড্‌' হলেও বাংলা লিপ্যন্তরে সেটা 'হার্ড'। একই কারণে ক.বি.-১ অনুমোদিত 'ওঅর' (war)-এর পরিবর্তে বাংলায় 'ওআর' লেখাই ভালো বলে আমাদের মনে হয়। সেইরকম 'ওআর্ক' (work), 'ওআর্ড' (ward বা word), 'ওআর্ল্ড' (world) সংগত, কারণ

উচ্চারণে y-glide বা য়-শ্রুতির অভাব। অবশ্য কেউ শুধুই ইংরেজি ভাষায় কথা বললে 'আ'-এর পরিবর্তে 'অ' ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা নিয়মিত বাংলা হরফে 'ওয়র্ক', 'ওয়র', 'ওয়র্ল্ড' লিখে চলেছেন তাঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন যে বাঙালির রসনায় ওইরকম বানানের উচ্চারণ দাঁড়ায় যথাক্রমে 'ওয়্অর্ক্', 'ওয়্র্' ও 'ওয়্অর্ল্ড্', যা ইংরেজি উচ্চারণের কাছাকাছিও যায় না। যা-ই হোক, উক্ত নিয়মটির মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান ও সমর্থন জানিয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ও বিদেশী শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখে বানান-সংস্কারে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমরা করতেই পারি।

প্রসঙ্গত বলি, ইতিপূর্বে শুধু বিশ্বভারতীর বইপত্রে নয়, আরো অনেকের লেখায় জানুআরি, ফেব্রুআরি বানান ব্যবহৃত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের লেখায় ওই দুটি বানান পাওয়া গেছে। 'চলন্তিকা'-তেও 'জানুআরি', 'ফেব্রুআরি' বানান বহু আগে থেকেই শোভা পাচ্ছে। এও লক্ষ করেছি, সাম্প্রতিক কালে সুভাষ ভট্টাচার্য ওই নিয়মটি অনুসরণ করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বা 'দেশ'-এ যা-ই লেখা হোক, ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারবিধির অন্তর্গত সুভাষবাবুর 'লেখক ও সম্পাদকের অভিধান'-এ জানুআরি ফেব্রুআরি ছাড়াও যেসব বানান সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা 'এডওআর্ড', 'ওআইল্ড', 'ওআট', 'ওআকিবহাল', 'ওআটার' (সেইসঙ্গে 'ওআটার পোলো', 'ওআটার স্কিইং', 'ওআটারপ্রুফ' 'ওআটারকালার' কিংবা 'ওয়াটার-কালার'), 'ওআটারলু', 'ওআড়', 'ওআদা', 'ওআরিশ', 'ওআরেন', 'ওআরেন্ট', 'ওআর্ড', 'ওআর্নার', 'ওআশিংটন', 'ওআহাবি', এবং 'বেআইনি' ছাড়াও 'বেআক্কেল', 'বেআদব', 'বেআদবি' কিংবা 'বেআদপি', 'বেআবরু' প্রভৃতি বানানই পাচ্ছি আর অনেক জায়গায় 'য়' ব্যবহার না-করার কথাও স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে।

'নোতুন কিছু'-র পক্ষে যুক্তি থাকলে সেটা করাই ভালো, নইলে ভাষার গতিশীলতা রুদ্ধ হয়ে যায়। ক.বি.১-এর প্রদর্শিত পথে সুভাষবাবু সেই সংগত কাজটাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমরা তাঁর এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি এবং সেইসঙ্গে ওই ধরনের উচ্চারণ-ভিত্তিক বানানের ব্যাপক ব্যবহারে যত্নবান হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই। স্বীকার করি, দীর্ঘকালীন অভ্যাসের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয় এবং অভ্যাস অন্যরকম বলেই উল্লিখিত বানানগুলি দেখে প্রথম-প্রথম অনেকের 'চক্ষু পীড়িত' হতে পারে। কিন্তু মণীন্দ্রকুমারও মেনে নিয়েছেন যে এইসব বানানে 'কর্ণ পীড়িত' হয় না। ফলে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জনের উদ্দেশ্যে নতুন বানানে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে আমরা মনে করি।

বাংলা শব্দে তো বটেই, এমন-কি অন্য ভাষার শব্দের লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রেও অকারণে য়-শ্রুতি ব্যবহারের প্রবণতার বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছিলাম। মজার কথা হলো, এর উলটো ব্যাপারও ঘটেছে। যেখানে উচ্চারণে 'য়' রয়েছে সেখানেও অনেকে 'ও' দিয়ে বানান লেখেন। আমাদের বহু শব্দের উচ্চারণেই 'ইয়ো' 'এয়ো' রয়েছে,

যেমন— দিয়ো, নিয়ো, খেয়ো, যেয়ো। অথচ প্রায়ই ছাপার অক্ষরে দিও, নিও, খেও যেও প্রভৃতি বানান চোখে পড়ে। অনেকেই খুলিয়ো, পড়িয়ো, বলিয়ো লেখেন, কিন্তু পোলিয়ো, রেডিয়ো, স্টুডিয়ো-র পরিবর্তে পোলিও, রেডিও, স্টুডিও লিখতে সংকোচ বোধ করেন না। স্মর্তব্য, সংসদ ও আকাদেমি এইসব বানানে 'য়ো' অনুমোদন করেছে। আ.বা.প.-র 'কী লিখবেন কেন লিখবেন'-এও খেয়ো, গেয়ো, চেয়ো, দিয়ো, নিয়ো, বানিয়ো, হটিয়ো প্রভৃতি বানানই সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ ওই সংস্থার পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই 'খেও', 'দিও', 'নিও' বানান দেখা যায়। আমার মনে হয়, একটু সচেতন হলেই এ-বিষয়ে সংশয়মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এ কেমন ধরনধারন

এবার এমন একটা নিয়মের কথা বলি যা অভিধানগুলিতে থাকলেও লেখার সময় না-মানাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো বর্ণের পরে অন্তঃস্থ্-ব থাকলে তার উচ্চারণ যদি বাংলায় করা না-হয় তাহলে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্তরূপে তা লেখা যায়। যেমন— দ্বাপর, দ্বাবিংশ, দ্বিজ, দ্বিত্ব, বিদ্বজ্জন, বিদ্বান, বিদ্বেষ, দ্বেষ, দ্বৈত প্রভৃতি। এইসব শব্দের বাংলা উচ্চারণে 'ব'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। শব্দগুলির উচ্চারণের আরো একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'ব' যদি শব্দের আদিতে অর্থাৎ প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে শুধু সেই বর্ণটাই উচ্চারিত হয়। যেমন— দাপর্, দাবিংশ', দিজ', দিত্‌ত', দেশ্, দৈত'। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যে-বর্ণের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, উচ্চারণে সেই বর্ণের দ্বিত্ব আসে। যেমন— বিদ্‌দজ্‌জ'ন্, বিদ্‌দান্, বিদ্‌দেশ্। লক্ষণীয়, 'দ্বিত্ব' শব্দেও 'ত'-এ ব-ফলার উচ্চারণে শুধুই 'ত'-এর দ্বিত্ব, শেষে 'ত্ব' বা 'ত্ত্ব' রয়েছে এমন সব শব্দের উচ্চারণেও এরকমটাই ঘটে।

কিন্তু যেসব 'ব'-এর আলাদা উচ্চারণ রয়েছে সেগুলোকে পূর্ববর্ণে যুক্ত না-করে তার নীচে হসন্ত দিয়ে 'ব' আলাদাভাবে লেখার কথা, অভিধানগুলিতে তা স্পষ্টভাবে দেখানোও রয়েছে। মনিয়ের উইলিয়াম্‌স-এর সংস্কৃত অভিধানে তো বটেই, রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', জামিল চৌধুরীর 'শব্দসংকেত', ঢাকার বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' এবং সংসদ ও আকাদেমির বানানের অভিধানেও ওইরকম বানানই সন্নিবিষ্ট। 'উদ্'-যুক্ত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি, যেগুলোর বানান হওয়া উচিত উদ্‌বন্ধন, উদ্‌বর্ত, উদ্‌বর্তন, উদ্‌বায়ী, উদ্‌বাস্তু, উদ্‌বাহু, উদ্‌বিগ্ন, উদ্‌বুদ্ধ, উদ্‌বৃত্ত, উদ্‌বেগ, উদ্‌বেল, উদ্‌বোধন প্রভৃতি। অথচ সেগুলোর বানান বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথাক্রমে উদ্বন্ধন, উদ্বর্ত, উদ্বর্তন, উদ্বায়ী, উদ্বাস্তু, উদ্বাহু, উদ্বিগ্ন, উদ্বুদ্ধ, উদ্বৃত্ত, উদ্বেগ, উদ্বেল, উদ্বোধন দেখতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত। 'সদ্‌ব্যবহার', 'সদ্‌ব্যয়'-এর ক্ষেত্রেও এরকমই ঘটছে, অর্থাৎ লেখা হচ্ছে 'সদ্ব্যবহার', 'সদ্ব্যয়'। আমরা ভুলে থাকছি যে ওইরকম বানান লিখলে 'ব'-এর উচ্চারণ লোপ পেয়ে বাংলায় 'দ'-এর উচ্চারণে দ্বিত্ব আসবে। অথচ বলার সময় 'বিদ্বান'-এর মতো সেরকম উচ্চারণ তো আমরা করছি না। তাহলে লিখতে গিয়ে

অভিধানের নির্দেশ অমান্য করছি কেন?

এইরকম আরো কিছু বানানের দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক। দিগ্‌বধূ, দিগ্‌বলয়, দিগ্‌বসন, দিগ্‌বসনা, দিগ্‌বস্ত্র, দিগ্‌বাস, দিগ্‌বাসা, দিগ্‌বিজয়, দিগ্‌বিজয়ী, দিগ্‌বিদিক, বাগ্‌বহুলতা, বাগ্‌বাদিনী, বাগ্‌বাহুল্য, বাগ্‌বিতণ্ডা, বাগ্‌বিদগ্ধ, বাগ্‌বিদ্ধ, বাগ্‌বিধি, বাগ্‌বিনিময়, বাগ্‌বিন্যাস, বাগ্‌বিমুখ, বাগ্‌বিমুখতা, বাগ্‌বিস্তার, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, বাগ্‌বৈভব, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, সদ্‌বংশ, সদ্‌বংশজাত, সদ্‌বাসনা, সদ্‌বিচার, সদ্‌বিবেচক, সদ্‌বিবেচনা, সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে এইসব শব্দের বানানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ব'-কে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত দেখতে আমরা অভ্যস্ত। যেমন দিগ্বধূ, দিগ্বলয়, দিগ্বসন, দিগ্বসনা, দিগ্বস্ত্র, দিগ্বাস, দিগ্বাসা, দিগ্বিজয়, দিগ্বিজয়ী, দিগ্বিদিক, (বাগ্বহুলতা, বাগ্বাহুল্য, বাগ্বিতণ্ডা, বাগ্বিদগ্ধ, বাগ্বিদ্ধ এখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না), বাগ্বিধি, বাগ্বিনিময়, (বাগ্বিন্যাস, বাগ্বিমুখ, বাগ্বিমুখতাও চোখে পড়েনি), বাগ্বিস্তার, বাগ্বৈদগ্ধ্য, বাগ্বৈভব, বাগ্বৈশিষ্ট্য, সদ্বংশ, সদ্বংশজাত, সদ্বাসনা, সদ্বিচার, সদ্বিবেচক, সদ্বিবেচনা, সদ্বুদ্ধি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ধরনের বানান লিখলে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে 'ব' ঊহ্য থাকার কথা, যেমন রয়েছে অশ্ব, অশ্বত্থামা, বিল্ব, বিল্বপত্র, বিল্বফল, বিশ্বাস, শ্বাস, শাল্ব প্রভৃতি শব্দে। সম্ভবত বিল্ব, শাল্ব বানান অনুকরণ করেই অনেকে ইংরেজি bulb শব্দটির লিপ্যন্তরে 'বাল্‌ব'-এর পরিবর্তে 'বাল্ব' লেখেন। অথচ উক্ত তৎসম শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণ বিল্‌ল', শাল্‌ল'-এর অনুকরণে পাঠকের বাল্‌ল' উচ্চারণের আশঙ্কাকে মনে স্থান দেন না।

ব-ফলা যুক্ত আরো বহু শব্দে বাংলায় ব-এর উচ্চারণ নেই, শব্দের প্রথমে থাকলে শুধুই পূর্ববর্ণের উচ্চারণ হয় আর মধ্যে বা শেষে থাকলে ব-যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণে দ্বিত্ব আসে। স্বকর্ম, স্বকাজ, স্বকৃত, স্বগত, স্বচক্ষে, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ, স্বজন, স্বজাতি, স্বতন্ত্র, স্বত্ব, স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বনাম, স্বপক্ষ, স্বপদ, স্বপ্ন, স্বপ্রকাশ, স্ববশ, স্ববিরোধ, স্বভাব, স্বমত, স্বমর্যাদা, স্বমহিমা, স্বয়ং, স্বয়ম্ভু, স্বর, স্বরূপ, স্বর্গ, স্বর্ণ, স্বল্প, স্বশিক্ষা, স্বস্ত, স্বস্তিক, স্বাক্ষর, স্বামী, স্বার্থ, স্বাস্থ্য, স্বীকার, বিশ্ব, বিশ্বামিত্র, পিতৃষ্বসা, পয়স্বল, পয়স্বিনী, রজস্বলা, কণ্ব, তেজস্বী, মনস্বী, পরশ্ব, পরস্ব, যশস্বী ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে শকর্‌ম', শকাজ্‌, শকৃত', শগত', শচ'ক্‌খে, শচ্‌ছ', শচ্‌ছন্‌দ', শজ'ন্‌, শজাতি, শতন্‌ত্র', শত্‌ত', শদেশ্‌, শধর্‌ম', শনাম্‌, শপক্‌খ', শপদ্‌, শপ্‌ন', শপ্র'কাশ্‌, শবশ্‌, শবিরোধ্‌, শভাব্‌, শমত্‌, শম'র্‌জাদা, শম'হিমা, শয়ং, শয়ম্‌ভু, শর্‌, শরুপ্‌, শর্‌গ', শর্‌ন', শল্‌প', শশিক্‌খা, শস্‌ত', শস্‌তিক্‌, শাক্‌খ'র্‌, শামি, শার্‌থ', শাস্‌থ', শিকার্‌, বিশ্‌শ', বিশ্‌শামিত্র', পিতৃশ্‌শশা, পয়'শ্‌শল্‌, পয়'শ্‌শিনি, রজ'শ্‌শলা, কন্‌ন', তেজ'শ্‌শি, ম'ন'শ্‌শি/মন'শ্‌শি, পর'শ্‌শ', পর'শ্‌শ', জশ'শ্‌শি।

পুরনো কিছু অভিধানে 'উৎ' আর 'দিক্‌' উপসর্গের সঙ্গে 'ব' থাকলে বেশকিছু বানানে অবশ্য যুক্তবর্ণ দেখা যায়। যথা— উদ্বাস্তু, উদ্বিগ্ন, উদ্বেল, উদ্বোধন, দিগ্বধূ, দিগ্বলয়, দিগ্বসন, দিগ্বালিকা, দিগ্বিজয়, দিগ্বিদিক্‌ প্রভৃতি। আমার বক্তব্য, এককালে তো অবিসম্বাদিত (অবিসংবাদিত), এবম্বিধ (এবংবিধ), কিম্বা (কিংবা), কিম্বদন্তী (কিংবদন্তি), প্রিয়ম্বদা

(প্রিয়ংবদা), বশম্বদ (বশংবদ), সম্বৎ (সংবৎ), সম্বৎসর (সংবৎসর), সম্বরণ (সংবরণ), সম্বর্ধনা (সংবর্ধনা), সম্বলিত (সংবলিত), সম্বাদ (সংবাদ), সম্বিৎ (সংবিৎ), স্বয়ম্বর (স্বয়ংবর) প্রভৃতি ভুল বানান বেশ প্রচলিত ছিল। তা সত্ত্বেও কি আমরা পরবর্তী কালে সেগুলো বর্জন করিনি?

আসলে বাংলা উচ্চারণে অন্তঃস্থ-ব আর বর্গ্য-ব একাকার হয়ে গেছে। তাই যে-সব অন্তঃস্থ-ব আদৌ উচ্চারিত হয় না সেগুলো পূর্ববর্ণের সঙ্গে ব-ফলা হিসেবে যুক্ত। কিন্তু যে-সব অন্তঃস্থ-ব বাংলায় বর্গ্য-ব হিসেবে উচ্চারিত সেগুলোকে পূর্ববর্ণে হসন্ত দিয়ে আলাদা করে লেখা বিধেয়। পক্ষান্তরে সম্-এর পরে বর্গ্য-ব থাকলে যুক্তবর্ণ হিসেবে কিংবা অনুস্বার দিয়ে 'ব' আলাদা করে লেখার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ সম্বন্ধ/সংবন্ধ, সম্বন্ধী/সংবন্ধী, সম্বল/সংবল, সম্বুদ্ধ/সংবুদ্ধ, সম্বোধন/সংবোধন দু-ভাবেই লেখা যায়। তা সত্ত্বেও বাংলায় এইসব শব্দ-যে শুধু ম্-যুক্ত বানানেই চলছে তার কারণ বোধহয় উচ্চারণে অনুস্বারের পরিবর্তে ম্-এরই প্রাধান্য।

প্রসঙ্গত ব-যুক্ত বর্ণের একটা ব্যতিক্রমী উচ্চারণের কথাও বলা দরকার। ব যখন হ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, যেমন আহ্বান, আহ্বায়ক, গহ্বর, জিহ্বা, বিহ্বল প্রভৃতি বানানে, তখন উচ্চারণে 'হ'-এর দ্বিত্ব যেমন হয় না তেমনই 'ব'-এর উচ্চারণও বিলুপ্ত— হ-এর জায়গায় আসে 'ও্' আর ব-এর উচ্চারণ হালকা 'ভ' (অনেকটা v-এর মতো, ইদানীং কেউ-কেউ ভ-এর নীচে ফুটকি দিয়ে 'ভ়' লিখে উচ্চারণটা বোঝানো পক্ষপাতী)। অর্থাৎ ওইসব শব্দের বাংলা উচ্চারণ যথাক্রমে আও্ভান্, আও্ভায়'ক্, গও্ভর্, জিও্ভা, বিও্ভল্ কিংবা আও্ভ়ান্, আও্ভ়ায়'ক্, গও্ভ়র্, জিও্ভ়া, বিও্ভ়ল্। অন্যদিকে, হ-এর সঙ্গে যদি ণ বা ন যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে বাংলায় ন-এর উচ্চারণ আগে এবং হ-এর উচ্চারণ পরে আসে। উদাহরণ— অপরাহ্ণ, অহ্ন, চিহ্ন, পূর্বাহ্ণ, সায়াহ্ন। এই শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে অপ'রান্হ', অনহ', চিন্হ', পুর্বান্হ', শায়ান্হ'।

এবার ক.বি.-১-এর দুটো নিয়মের কথা বলি যেখানে অযথা বিকল্প সুপারিশ করা হয়েছিল। ৫ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছিল : "ই ঈ উ ঊ।— যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ ঊ অথবা বিকল্পে ই উ হইবে, যথা 'কুমীর [<কুম্ভীর], পাখী [<পক্ষী], ঊনিশ [<ঊনবিংশ], পূব [<পূর্ব], অথবা 'কুমির, পাখি, উনিশ, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা 'নীলা [<নীলক], হীরা [<হীরক], দিয়াশলাই [<দীপশলাকা], পানি [<পানীয়], চুল [<চূল], তাড়ু [<তর্দু], জুয়া [<দ্যূত]' ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য, সেকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পুনঃপুন আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়েই ক.বি.-১ এত বিকল্পের বিধান দিয়েছিল। তবে মূল সংস্কৃত শব্দে কী ছিল তার তোয়াক্কা না-করে রবীন্দ্রনাথ সেকালেই সমস্ত অতৎসম শব্দে যতদূর সম্ভব ই উ বা ই-কার উ-কার ব্যবহার করেছেন, একালেও বিভিন্ন বানানবিধিতে সেটাই স্বীকৃত এবং এ-বিষয়ে মতভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। হীরক থেকে আগত হিরা ও হিরে দুটোতেই এখন ই-কার অনুমোদিত। কেউ-কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন 'দূরবিন' ও 'পূজারি'

বানান নিয়ে। তাঁদের মতে 'দুরবিন' ও 'পুজারি' বানানই সংগত, কারণ এ-দুটো অতৎসম শব্দ।

আমরা অবশ্য দূরবিন ও পূজারি বানানের পক্ষে। কারণটা বলি। দূরবিন শব্দের দূর অংশটুকু তৎসম এবং সংস্কৃত অর্থেই এখানে ব্যবহৃত, দূরবিন তো দূরের জিনিসই দেখায়। ফারসিতে শব্দটা যে-বানানেই থাক সেখানেও প্রথমাংশ অবশ্যই দূরত্বসূচক। তা ছাড়া বিন-এর সঙ্গে 'দুর্' উপসর্গ যুক্ত হয়েও শব্দটি সৃষ্ট নয়। সুতরাং বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে দূরবিন বানান প্রচলিত রাখাই শ্রেয়। পূজারি-র পক্ষেও যুক্তিটা এই যে, প্রথমাংশে তৎসম পূজা অবিকৃত রয়েছে, পুজো স্বীকৃত হলেও পূজা-য় হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে পূজা থেকে যেমন পুজো হয়েছে তেমনই পূজারি থেকে পুজুরি হতে পারে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে প-এ উ-কার দিতে আমরা আপত্তি করব না।

১১ নম্বর নিয়মেও ক.বি.-১ অকারণে বিকল্পের বিধান দিয়েছে। বলা হয়েছে, ''সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।'' আমরা মনে করি, করান, দেখান, পড়ান, পাঠান, বলান, লেখান, শেখান প্রভৃতি এবং করানো, দেখানো, পড়ানো, পাঠানো, বলানো, লেখানো, শেখানো প্রভৃতি অর্থ ও উচ্চারণ উভয় দিক থেকেই পৃথক শব্দ, সুতরাং আলাদা বানানেই লেখা উচিত। শেষোক্ত শব্দগুলোকে প্রযোজক ক্রিয়া, সাধিত ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষ্য প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা হয়। আমরা ব্যাকরণের কচকচির মধ্যে না-গিয়েও শব্দগুলোর আলাদা অর্থ ও উচ্চারণের সঙ্গে পরিচিত। 'তিনি রামকে দিয়েই কাজটা *করান*' আর 'কাজটা-যে রামকে দিয়েই *করানো* হয়েছে তা সকলেই জানে'— এই ধরনের বাক্য থেকে অর্থপার্থক্যটা পরিষ্কার বোঝা যায়। অনুরূপ আরো কয়েক জোড়া বাক্য দেখা যাক : আপনি ওই কাপড়টা আমাকে *দেখান* তো/ওটা তো ইতিমধ্যেই আপনাকে *দেখানো* হয়েছে ; ইতিহাসের মাষ্টারমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে *পড়ান*/তিনি *পড়ানো*র ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ; যদুবাবু যেসব জিনিস ডাকে *পাঠান* সেগুলো অনেক দেরিতে আমার হাতে এসে পৌঁছয়/বইগুলো-যে *পাঠানো* হয়েছে সে-ব্যাপারে আমি নিঃসংশয় ; আপনি তোতাকে দিয়ে যা *বলান* সে তা-ই বলে/অনেক চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে কথাটা কিছুতেই *বলানো* গেল না ; সুনীলবাবু তো আনন্দকে দিয়েই চিঠিপত্র *লেখান*/বারবার অনুরোধ করেও তাঁকে দিয়ে প্রবন্ধটা *লেখানো* গেল না ; শুভংকরবাবু যেভাবে *শেখান* সেটা অনেকেরই মনঃপূত নয়/তোমাকে *শেখানো* খুবই কঠিন কাজ। বেশ বোঝা যায় যে এগুলো একই শব্দের বিকল্প বানান নয়, এগুলোর অর্থ ও উচ্চারণের মতোই বানানও আলাদা হওয়াই উচিত। আ.বা.প., সংসদ ও আকাদেমি সকলেই এই পার্থক্য স্বীকার করে বানানে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, ফলে আমাদেরও অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধে নেই।

অল্প কিছু বানানে অবশ্য দ্বিমত লক্ষ করা যায়। এগনো, না এগোনো? লুকনো, না

লুকোনো? পুরনো, না পুরোনো? আকাদেমি ও সংসদ এইসব বানানের মধ্যবর্ণে ও-কার সুপারিশ করেছে। আ.বা.প. 'পুরনো' লেখে, ক.বি.-১ প্রণীত সুপারিশপত্রেও 'পুরনো' রয়েছে। কেউ-কেউ আবার 'এগনো' লিখলেও 'লুকোনো', 'পুরোনো' প্রভৃতি লেখেন। পবিত্র সরকার নিজে এগোনো, লুকোনো, পুরোনো প্রভৃতি লেখারই পক্ষপাতী, তবে তাঁর 'বানান বিবেচনা' বইয়ে তিনি বলেছেন, "...যাকে ভাষায় 'ইকনমি' বলে সেটাই মেনে চলুন, অকারণে ক্রিয়াপদে ও-কার দেবেন না।" (পৃ. ১৭) আমার মনে হয়, 'ইকনমি'-র কথা মাথায় রেখে শুধু ক্রিয়াপদে নয়, বহু বাংলা শব্দেই অকারণে ও-কার পরিহার করা উচিত, বিশেষত স্বরান্ত উচ্চারণ যেখানে হ্রস্ব-ও এবং এই হ্রস্ব-ও বাংলা ভাষার একটা নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতির অন্তর্গত। ওইসব শব্দে ও-কার না-দিলেও চলে, কারণ ও-কারবিহীন অনুরূপ অন্য কোনো শব্দের অস্তিত্ব নেই। এগনো, লুকনো, পুরনো এই ধরনের শব্দ, তাই মধ্যবর্ণে ও-কার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, কেননা না-দিলেও অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, করান/করানো প্রভৃতির মতো এগোন/এগনো, লুকোন/লুকনো প্রভৃতির উচ্চারণ ও অর্থ আলাদা। এবং উচ্চারণে পুরনো-র মতোই এগনো, লুকনো প্রভৃতিতে মধ্যবর্ণে হ্রস্ব-ও রয়েছে, অর্থাৎ শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে পুর'নো, এগ'নো, লুক'নো। এ-জাতীয় একটি শব্দের কথাই শুধু মনে পড়ছে যেখানে মধ্য ও শেষ উভয় বর্ণেই ও-কার দেওয়া জরুরি। শব্দটা 'শুকোনো'। কারণ 'শুকোন' (উচ্চারণ শুকোন্) যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে ভিন্নার্থক 'শুকনো' (উচ্চারণ শুক্‌নো)। আর শুকনো ও শুকোনো তো সমার্থক নয়। প্রথমটার অর্থ শুষ্ক আর দ্বিতীয়টার শুকিয়ে নেওয়া বা শুষ্ক করানোর কাজ। তাই 'শুক্‌নো' উচ্চারণে ভিন্নার্থক শুকনো শব্দটা যখন রয়েছে তখন শুকোনো বোঝানোর জন্যে ওই শব্দের বানানে ক-এ ও-কার না-দিলে সেটা হবে বিভ্রান্তিকর।

বেশকিছু শব্দে ও-কার দেওয়া বা না-দেওয়া নিয়ে দ্বিমত লক্ষ করা যায়, এ-ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত 'পুরনো' শব্দটার কথা বলেছি। ওইরকম আরেকটা শব্দ 'পৌঁছনো'। অনেকেই লেখেন 'পৌঁছোনো'। একই ব্যক্তির একটা রচনায় 'পৌঁছনো' ও 'পৌঁছোনো' দুরকম বানানও দেখেছি। ধরে নেওয়া যাক যে একটা ছাপার ভুল, কারণ কোনো সচেতন লেখকের পক্ষেই একই প্রবন্ধে একই শব্দের দুরকম বানান লেখার কোনো যুক্তি নেই। দুটোর একটা লেখকের অভিপ্রেত ধরে নিলেও মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। মধ্যবর্ণে ও-কার দেওয়া সংগত কি না। আমার বক্তব্য, বাংলাভাষায় যুক্তবর্ণহীন তিন অক্ষরের বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর মাঝখানের বর্ণের উচ্চারণ স্বরান্ত, কোনো স্বরচিহ্ন না-থাকলেও। ওইসব শব্দের উচ্চারণ আবার পুরোপুরি 'অ' নয়, অনেকটা 'ও'-র কাছাকাছি, যার হ্রস্ব-ও নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের উচ্চারণে এই হ্রস্ব-ও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে, নানাভাবে। তার অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে। সেগুলো যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে। আপাতত কয়েকটা শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

আদর (আদ'র্), আদল (আদ'ল্), আনন (আন'ন্), ওজন (ওজ'ন্), কাগজ (কাগ'জ্), কাজল (কাজ'ল্), কানন (কান'ন্), কেশর (কেশ'র্), কোমল (কোম'ল্), ছোবল (ছোব'ল্), ডাগর (ডাগ'র্), তোষণ (তোশ'ন্), নাগর (নাগ'র্), পোষণ (পোশ'ন্), বোধন (বোধ'ন্), মোদক (মোদ'ক্), লেহন (লেহ'ন্), শোধন (শোঘ'ন্), শোষণ (শোশ'ন্) ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এইসব শব্দের মধ্যবর্ণে ও-কার না-দিয়েও আমরা দিব্যি প্রায় 'ও' উচ্চারণ করছি। অনুরূপভাবে, 'এগনো' 'পুরনো'-তে যেমন, 'পৌঁছনো'-তেও তেমনই হ্রস্ব-ও উচ্চারণ রয়েছে, ও-কার না-দিলেও চলে। অর্থাৎ এ-জাতীয় শব্দে 'ইকনমি'-র যুক্তি মেনে চলাই ভালো। তবে, 'এগোন' 'লুকোন'-এর মতো 'পৌঁছোন' শব্দের মধ্যবর্ণে ও-কার চাই।

ক্রিয়াপদের শেষ বর্ণের উচ্চারণ স্বরান্ত হলেও সাধারণভাবে ও-কার না-দেওয়ার নীতিই একালে গৃহীত হয়েছে। যেমন— করত/করল, বলত/বলল প্রভৃতি। এটা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, মাত্র দুটো শব্দের ক্ষেত্রে এখনও দ্বিমত রয়ে গেছে। শব্দ দুটো হত/হতো আর হল/হলো। দুরকম বানানই প্রচলিত। কোন্‌টা গ্রহণীয়? আমরা হতো/হলো বানানের পক্ষপাতী। কেন, সেটা বলবার আগে যাঁরা হত/হল চাইছেন তাঁদের তরফের যুক্তিটা পেশ করা দরকার।

''ক্রিয়ার নিত্যবৃত্ত অতীত, শুদ্ধ অতীত আর ভবিষ্যৎ রূপের শেষে ও-কার দেবেন না— করত (করতো নয়), করল (করলো নয়), করব (করবো নয়)/ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান আমরা বিশেষ্য-বিশেষণে লিখি না যখন, ক্রিয়াতে কেন খামোখা লিখতে যাব? যদি কেউ বলেন যে ক্রিয়াগুলি তদ্ভব শব্দ, তাহলে আমরা বলব বিশেষ্য বিশেষণে প্রচুর তদ্ভব শব্দ আছে, সেগুলির ক্ষেত্রে কী করি দেখুন— যেমন চরকি (চোরকি লিখি না), লগি (লোগি লিখি না), ঢঙি (ঢোঙি লিখি না), পড়ুয়া (পোড়ুয়া লিখি না)। তা হলে কেন ক্রিয়াপদে বলতো, শুনতো, হাসবো, বাসলো লিখতে যাব? এমনকি হোলো, হোতো লেখারও দরকার নেই, কারণ 'হল' ক্রিয়াপদের সঙ্গে ইংরেজি hall-কে কেউ গুলিয়ে ফেলবে না, আর 'হত' ক্রিয়ার সঙ্গে 'নিহত' বিশেষণের গুলিয়ে যাবারও সম্ভাবনা খুব কম। কেউ 'হলো' লেখেন। কিন্তু, আবার বলি, উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে হলে তো 'হোলো, হোতো' লিখতে হবে। কাজেই যাকে ভাষায় 'ইকনমি' বলে সেটাই মেনে চলুন, অকারণে ক্রিয়াপদে ও-কার দেবেন না।" ('বানান-বিবেচনা', পবিত্র সরকার, পৃ. ১৭)

উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যটি খুবই মূল্যবান মনে করি আর আমরা-যে তা মেনে চলতে চাই, শুধু ক্রিয়াপদে নয়, অন্যান্য শব্দেও, সে-কথা ইতিপূর্বে স্পষ্টই বলেছি। তবে উপরোক্ত যুক্তিগুলির প্রতিটিই অভ্রান্ত কি না সেটা বিবেচনা করা যাক। প্রথমত, 'উচ্চারণ অনুযায়ী বানান আমরা বিশেষ্য-বিশেষণে লিখি না' কথাটা কি সম্পূর্ণ ঠিক? তাহলে কাল/কালো, ভাল/ভালো, মত/মতো— বানানে এই পার্থক্যগুলো রাখা হয়েছে কেন? এইসব শব্দে

তো বিশেষ্য-বিশেষণে আমরা 'উচ্চারণ অনুযায়ী' বানান লিখছি, এবং পবিত্রবাবুরা সেটাই অনুমোদন করেছেন। আকাদেমি ও সাহিত্য সংসদের বানানের অভিধানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, চরকি, লগি, ঢঙি, পড়ুয়া প্রভৃতি শব্দে-যে প্রথম বর্ণে ও-কার দেওয়া হয় না সেটা তো বাংলার একটা নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতির কারণেই—পরে ই, ঈ (বা ই-কার, ঈ-কার) আর উ, ঊ (বা উ-কার, ঊ-কার) থাকলে প্রথম বর্ণের 'অ'-গুলোর উচ্চারণ 'ও' হয়ে যায়। ওইসব শব্দে ও-কার দেওয়ার প্রশ্নটা, তাই, খুব প্রাসঙ্গিক কি? (প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে এ-ব্যাপারে পবিত্রবাবু আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ওয়াকিবহাল। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা শেখার চেষ্টা করি।) আর উচ্চারণে এই 'ও' আসছে তৎসম-অতৎসম সবরকম শব্দেই। সে-কারণেই আমরা অতি লিখি (ওতি লিখি না), গতি লিখি (গোতি লিখি না), পতি লিখি (পোতি লিখি না), অরুণ লিখি (ওরুণ লিখি না), করুণ লিখি (কোরুণ লিখি না), জলুয়া লিখি (জোলুয়া লিখি না, অথচ জোলো লিখি), বরুণ লিখি (বোরুণ লিখি না)। তৃতীয়ত, কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি যদি হয় 'খোলা হল ঘর', তাহলে কি গুলিয়ে ফেলার আশঙ্কাটা অমূলক? পাঠক কী বুঝবেন—ঘরটা খোলা হয়েছে, না কি hall ঘরটা খোলা? তর্কের খাতিরে না-হয় ধরে নেওয়া গেল যে 'গুলিয়ে যাবার' 'সম্ভাবনা খুব কম', তবুও যে-প্রশ্নটা থেকে যায় তা হলো, ভাল (কপাল)-এর সঙ্গে ভালো (উত্তম) শব্দের গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কি খুব কম নয়, বিশেষ করে কপাল অর্থে ভাল শব্দটার ব্যবহার যখন চলিত বাংলায় বিরল বললেই চলে? তাহলে 'ভালো' সুপারিশ করা হয়েছে কেন?

যে-প্রশ্নটা বাকি রইল তা হচ্ছে, হতো/হলো-র পরিবর্তে উচ্চারণ অনুযায়ী হোতো/হোলো লেখা অনুচিত কেন? আমাদের বক্তব্য, শব্দ দুটো এসেছে সাধুভাষার 'হইত', 'হইল' থেকে, পরবর্তী 'ই'-এর প্রভাবে উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে 'হোইত' (হ'ইত'), 'হোইল' (হ'ইল')। চলিত ভাষায় 'ই' উঠে যাওয়ার পরেও হ-এর হ্রস্ব-ও উচ্চারণ রয়েছে গেছে, সে-কারণে হ-এ ও-কার দেওয়ার দরকার হয় না, যেমন 'কলিকাতা' থেকে আগত 'কলকাতা' বানানও আমরা ও-কার দিয়ে 'কোলকাতা' লিখি না, অথচ উচ্চারণ করি 'কোলকাতা' (ক'লকাতা)। যেমন করিল থেকে আগত করল (কোরল লিখি না), বলিল থেকে আগত বলল (বোলল লিখি না) লিখি। পক্ষান্তরে, শেষ বর্ণ 'ত' ও 'ল'-এর উচ্চারণ সাধুভাষায় 'অ'-কারান্ত ছিল, যা চলিত বাংলায় ও-কারান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং 'হত' (নিহত) আর ইংরেজি 'হল্' (hall)-এর সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য আমরা 'হতো' ও 'হলো' লেখার পক্ষপাতী। বহু নিয়মেই তো কিছু ব্যতিক্রম থাকে, ক্রিয়াপদে ও-কার যুক্ত এই দুটো বানানকে না-হয় ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করা হোক। আর কী কারণে আমরা 'হোল'/'হোত' সুপারিশ করছি না সেটাও উপরের ব্যাখ্যা থেকে নিশ্চয় পরিষ্কার।

আসলে কোনো-কোনো ক্রিয়াপদের উচ্চারণে যখন একাধিক বর্ণে 'ও' আসে তখন আমরা কিছুটা সমঝোতা করি একটায় ও-কার দিয়ে। এইরকম কিছু শব্দ এগোল, বেরোল,

পিছোল (পিচ্ছিল অর্থে পিছল শব্দের সঙ্গে পার্থক্যের কারণেও) প্রভৃতি। এইসব শব্দে ইকনমির দোহাই দিয়ে মধ্যবর্ণে ও-কার বাদ দেওয়া মুশকিল। তা ছাড়া ক্রিয়াপদে-যে ও-কার সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে তা-ও তো নয়। তুমি পক্ষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় ও-কার দেওয়ার বিধান রয়েছে। যেমন— করো, ধরো, বলো প্রভৃতি। ওইসব শব্দের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় আবার দুটো ও-কার অনুমোদিত। যেমন— কোরো, ধোরো, বোলো প্রভৃতি। এই দুটো ক্ষেত্রেই বানান উচ্চারণ-অনুসারী।

কিন্তু যেখানে ও-কার বাদ দেওয়া যায় এবং অনুরূপ অন্য শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই সেইরকম বেশকিছু শব্দে অযথা ও-কার সুপারিশ করা হয়েছে আকাদেমি ও সংসদের অভিধানে। 'ছোট', 'বড়'-র পরিবর্তে 'ছোটো', 'বড়ো' কেন? 'ঘন' শব্দের উচ্চারণও তো স্বরান্ত, সেখানে তো ও-কার দিয়ে 'ঘনো' লেখার কথা বলা হয়নি। ইকনমির যুক্তিতে কি ও-কার বর্জিত ছোট, বড়-ই শ্রেয় নয়, বিশেষ করে অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও যখন নেই? ছুটে চলো অর্থে অনুজ্ঞায় বরং 'ছোটো' লেখা যেতে পারে। তবে 'ছোটখাটো' বানান সংগত, কারণ দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে তুলনায় ভিন্নার্থক 'খাট' (পালঙ্ক) শব্দের অস্তিত্ব বাংলায় রয়েছে, যেমন— 'ছোট খাট'। তা ছাড়া, 'খাট'-এর উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত আর 'খাটো' স্বরান্ত (যেমন 'মত' আর 'মতো'), সে-কারণেও খাটো-তে ও-কার বাঞ্ছিত।

আকাদেমি ও সংসদের অভিধানে ইকনমির শর্ত লঙ্ঘনের আরেকটা দৃষ্টান্ত— 'চোদ্দো'। ও-কার বর্জিত 'চোদ্দ' নয় কেন? 'দ্দ' যুক্তবর্ণের উচ্চারণ স্বভাবতই স্বরান্ত অর্থাৎ হ্রস্ব-ও, যেমন একান্ন, বাহান্ন থেকে আটান্ন পর্যন্ত শব্দগুলোর উচ্চারণে রয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত শব্দগুলোতে তো ও-কার দিয়ে একান্নো, বাহান্নো, তিপ্পান্নো প্রভৃতি বানান অনুমোদন করা হয়নি। তাহলে 'চোদ্দ' কী দোষ করল?

আকাদেমি ও সংসদের আরেকটা নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'ছন্দঃ' (ছন্দস্) থেকে আগত বিসর্গবর্জিত 'ছন্দ' শব্দটিকে অর্ধ-তৎসম বিবেচনা করে আকাদেমির বানানবিধির ৫.৩ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে— "'ছন্দ' শব্দটিকে ... বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে সমাসের পূর্বপদে বিসর্গসন্ধিজাত ও-কার বর্জনীয় হতে পারে। যেমন, ছন্দগুরু ছন্দবিজ্ঞান ছন্দমুক্তি ছন্দলিপি ছন্দস্পন্দ।" এ-ব্যাপারে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, "শব্দের বিসর্গকে অগ্রাহ্য করে 'ছন্দমুক্তি' যদি করা যায় (করাই সংগত), তবে 'সদ্যমুক্তি' করতেই-বা অসুবিধে কী, এ-প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে।" ('ভাষার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ, আকাদেমির 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থের পৃ. ২৬৫) এ-ব্যাপারে আমার আরো একটা প্রশ্ন : তাহলে মনোগত, মনোগ্রাহী, মনোজগৎ, মনোজীবন, মনোদর্শন, মনোদুঃখ, মনোধর্ম, মনোনিবেশ, মনোবল, মনোবিকলন, মনোবিকার, মনোবিকৃতি, মনোবিগ্রহ, মনোবিচ্ছেদ, মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, মনোবেদনা, মনোভঙ্গি মনোভাব, মনোযোগ ইত্যাদির পরিবর্তে ও-কার বাদ দিয়ে মনগত, মনগ্রাহী, মনজগৎ, মনজীবন, মনদর্শন, মনদুঃখ, মনধর্ম, মননিবেশ, মনবল, মনবিকলন, মনবিকার, মনবিকৃতি, মনবিগ্রহ, মনবিচ্ছেদ, মনবিজ্ঞান, মনবিদ্যা, মনবেদনা, মনভঙ্গি

মনভাব মনযোগ প্রভৃতিই-বা হবে না কেন? কারণ ছন্দ, সদ্য-র মতো মনঃ (মনস্) থেকে বিসর্গবর্জিত মনও তো 'বাংলা' শব্দই। আর মনভোমরা, মনমাঝি, মনমেজাজ যদি উক্ত দুটি অভিধানে স্থান পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 'মনোমতো'-র পরিবর্তে 'মনমতো'-তে আপত্তি কোথায়, বিশেষ করে 'মতো' যখন তৎসম শব্দ নয়? ছন্দ শব্দের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম যদি করতেই হয়, সেক্ষেত্রে বিসর্গবর্জিত অনুরূপ অন্যান্য বাংলা শব্দের বেলায় আলাদা নিয়ম বহাল রাখা হবে কেন?

আরেকটা শব্দের বানান নিয়ে কিছুকাল যাবৎ দ্বিমত লক্ষ করা যাচ্ছে। পদ্ধতি, রীতি, চাল অর্থে 'ধরন' বানানই প্রচলিত ছিল। কয়েক বছর আগে অরুণ সেন জানালেন যে মনিএর উইলিয়াম্স-এর অভিধান অনুযায়ী শব্দটা তৎসম, বানান 'ণ'-যুক্ত 'ধরণ', যা আমাদের বর্তমানে প্রচলিত 'ধরন'-এর অর্থকেও ধারণ করে। তার পর থেকে কেউ-কেউ 'ধরণ' ও 'ধরণধারণ' লিখতে থাকেন, যদিও অনেকেই উলটো পথে হাঁটতে রাজি হলেন না। এখন মূল প্রশ্ন হলো, আমরা যে-অর্থে 'ধরন' লিখি তার সঙ্গে ধৃ-ধাতুর সম্পর্ক রয়েছে কি না। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'-য় 'ধরণ' ও 'ধরন' দুটো বানানই আমরা পাচ্ছি, তবে ভিন্ন অর্থে। সেখানে 'ধরণ'-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে 'ধারণ', অর্থাৎ শব্দটি ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন। আর 'ধরন'-কে অতৎসম পর্যায়ভুক্ত করে অর্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : ''পদ্ধতি, রীতি, চাল ('কাজের —')। আকৃতি, লক্ষণ, রকম (মুখের, রোগের, কথার —')।'' ব্যাপারটা নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে সেই সময়ে জানা গেল, মেদিনীপুর অঞ্চলে নাকি 'বৃষ্টি থেমে গেল' কিংবা 'বৃষ্টি ধরে গেল' বোঝাতে 'বৃষ্টির ধরণ হলো' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধৃ-ধাতুর একটা সম্পর্ক রয়েছে, যার স্বীকৃতি চলন্তিকায় পাচ্ছি। কিন্তু আমরা সাধারণত যেসব অর্থে শব্দটা প্রয়োগ করি তার মূলে কি ধৃ-ধাতু রয়েছে? না-থাকলে তো রাজশেখরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ধরন' বানানই সংগত, যা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিতও বটে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরা 'ধরন' লিখছেন তাঁরা 'ধরনধারণ' লিখছেন কেন? প্রশ্নটা শঙ্খ ঘোষও তুলেছেন আকাদেমির বানান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের আলোচনায়, উল্লিখিত 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন— '''ধরনধারণ'-এর ধরন-এ সংস্কৃতের যথাযথ অর্থটা নেই বলে সেখানে ন-এর প্রয়োগ যদি আবশ্যিক হয়, তবে ওখানে 'ধারণ'-এর ণ-টা আসছে কোন্ যুক্তিতে, এও হয়তো আর-একবার ভাবতে হবে। এ ধারণ তো ধরে থাকা নয়?'' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫) এই আপত্তি সংগত এবং বানানটা 'ধরনধারন' হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। কারণ এখানে 'ধারণ'-এর আলাদা কোনো অর্থ নেই, ধরন-এর সঙ্গে কথার লব্জ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, যেমন আমরা বলি 'রকমসকম'। সসম্মানে অভ্যর্থনা, নিয়োগ, গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে তৎসম 'বরণ' থাকলেও 'বর্ণ' থেকে আগত অতৎসম 'বরন' যদি আমরা ন-দিয়ে লিখতে পারি ('কুঁচবরন রাজকন্যার মেঘবরন চুল'), তাহলে 'ধরনধারন'-এর 'ধারন'-কেও বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির অন্তর্গত অতৎসম গণ্য করে ন-দিয়ে লিখতে আপত্তির কোনো যুক্তিসম্মত কারণ আছে কি?

আরেকটা শব্দের কথা বলি, যা প্রায় দুই দশক ধরে ভুল বানানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। শব্দটা ‘দেশী’ (এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই ‘বিদেশী’ ও ‘স্বদেশী’)। যতদূর মনে পড়ে, আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকেই প্রথম ‘দেশি’ বানান চালু করা হয় এবং ওই সংস্থার ‘কী লিখবেন কেন লিখবেন’-এ ‘দেশী’ না-লেখার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশি, বিদেশি বানান লেখা হতে থাকে প্রায় সর্বত্র। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে। যোলো-সতেরো বছর আগে আ.বা.প.-র বানান-বিশেষজ্ঞদের একজনকে ঈ-কার বর্জনের কারণটা জিগ্‌গেস করি। তিনি বললেন, দেশ ইন্-ভাগান্ত শব্দ নয়, ‘দেশীয়’ থেকে আগত বাংলা শব্দ ‘দেশি’, সেজন্যে ই-কারই সংগত। চলন্তিকাতেও দেখলাম, ‘দেশী’ বানানের পাশে যে-চিহ্নটা ব্যবহার করা হয়েছে তা অতৎসম শব্দের সূচক। অগত্যা আমিও গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ‘দেশি’ ‘বিদেশি’ লেখা শুরু করি, যদিও মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিছুদিন পরে সুভাষ ভট্টাচার্য জানালেন যে ‘দেশী’ ইন্-ভাগান্ত শব্দ এবং মনিএর উইলিয়াম্‌স-এর অভিধানে তার উল্লেখ রয়েছে। ওই অভিধান তখন আমার সংগ্রহে ছিল না, পরে কিনে দেখি যে সুভাষবাবুর বক্তব্য অভ্রান্ত। ওই অভিধানের ৪৯৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে যথাক্রমে ‘দেশিন্’, ‘দেশী’ ও ‘দেশীয়’ তিনটি শব্দই স্পষ্ট শোভা পাচ্ছে। অর্থাৎ শব্দটি-যে ইন্-ভাগান্ত এ-বিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। বেশ বোঝা গেল, এ-ব্যাপারে তথ্যের পরিবর্তে একটা ভ্রান্ত ধারণাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ‘দেশীয়’ থেকে শব্দটা বাংলায় এসেছে।

এই ঘটনা-পরম্পরা থেকে এটা পরিষ্কার যে ‘দেশি’ ‘বিদেশি’ বানান ভুল করে চালানো হয়েছে, ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ‘দেশী’ ‘বিদেশী’ ‘স্বদেশী’ বানানই সংগত। তবে হ্যাঁ, আচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ই-কার দিয়ে লেখার সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করেন (যা সংগত বলেই আমার ধারণা এবং বানানবিদদেরও একাংশের অভিমত), তখন আমিও ‘দেশি’ ‘বিদেশি’ লিখতে সংকোচ বোধ করব না। কিন্তু অন্য সব ইন্-ভাগান্ত শব্দে ঈ-কার ব্যবহার করব আর শুধু ‘দেশী’ ‘বিদেশী’-র ক্ষেত্রে নিয়মটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ই-কার চালাব— এটাকে সুবিবেচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া যায় কি?

একই রকম বিভ্রান্তির শিকার আরো একটা বানান— ‘পিণ্ডী’। শব্দটা ‘পিণ্ড’ থেকে আগত অতৎসম শব্দ ধরে নিয়ে আকাদেমি ও সংসদের বানান অভিধান সহ অধিকাংশ অভিধানে ‘পিণ্ডি’ হিসেবে মুদ্রিত। অথচ ঘটনা এই যে, ‘পিণ্ড’ আর ‘পিণ্ডী’ সমার্থক (ডেলা, অন্নের গ্রাস, গোলাকার বস্তু, মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত খাদ্যের ডেলা ইত্যাদি) এবং ইন্-প্রত্যয়ান্ত ‘পিণ্ডিণ্’ থেকে তৎসম ‘পিণ্ডী’ শব্দের সৃষ্টি। মনিএর উইলিয়াম্‌স-এর অভিধান অন্তত সে-কথাই বলে। ওই অভিধানের ৬২৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে ‘পিণ্ডিণ্’ ও ‘পিণ্ডী’-র অস্তিত্ব রয়েছে। তার আগে ‘পিণ্ডি’ শব্দও অবশ্য সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু তার অর্থ ‘চাকার কেন্দ্র’ বা ‘চক্রনাভি’ (nave of a wheel)। কোনো-কোনো বাংলা অভিধানে ‘পিণ্ডি’-র এই অর্থটাও দেওয়া আছে, তবে সেইসঙ্গে বলা হয়েছে যে পিণ্ড

অর্থেও একই বানান চলবে, কেননা এটা ''পিণ্ড-র কথ্য রূপ।'' (জামিল চৌধুরীর 'শব্দসংকেত', পৃ. ৭৫৬) আমাদের মতো সাধারণ বানান-অনুসন্ধিৎসুদের তাহলে কোন্ পথে চলা কর্তব্য?

শ, ষ, স প্রসঙ্গ

এবারে শ ষ স প্রসঙ্গ। বাংলা বানানে এই তিনটি বর্ণের ব্যবহার নিয়ে এখনও কিছু কিছু মতপার্থক্য রয়ে গেছে। অভিন্ন নীতির আধারে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও আবার ষ-কে বিদায় দেওয়ার প্রবণতা থেকে বানানে বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ গুরুত্ব পায়নি। এ-কথা ঠিক যে সাধারণ বাংলা উচ্চারণে ষ আর শ-কে আলাদা করা কঠিন। আমাদের উচ্চারণে যেমন শ-এর প্রাধান্য তেমনই ষ-ও বাঙালির রসনায় শ হয়ে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, যুক্তবর্ণ ব্যতীত খাঁটি স-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ স সাধারণত অনেকটা শ-এর মতোই উচ্চারিত হয়। আবার এটাও লক্ষ করা গেছে যে, স-যুক্ত বেশকিছু শব্দের উচ্চারণে শ আর স-এর মিশ্রিত রূপের আভাস পাওয়া যায়। সেটা বাঙালির এক স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির অঙ্গ। 'শাপ' আর 'সাপ' আমাদের জিহ্বা একরকম ভাবেই উচ্চারণ করে। কিন্তু সব স-এর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। ব্যাপারটা বিশেষভাবে আমার নজরে আসে অবাঙালিদের দিয়ে বাংলা কথা রেকর্ড করানোর সময়ে। আমরা যেভাবে 'সত্যি', 'সাদা', 'সহজ', 'সাহস' প্রভৃতি শব্দের স-এর উচ্চারণ করি সেটা অবাঙালিরা সহজে পারেন না, তাঁরা হয় খাঁটি স, নয়তো শ উচ্চারণ করেন। ওইসব স-এর প্রকৃত উচ্চারণ লিখে বোঝানো মুশকিল। ফারসি (এবং/অথবা) উর্দুর 'জখ্‌ম্'-এর 'খ্‌'-এর উচ্চারণ যেমন সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী মানুষদের এবং একাংশ হিন্দিভাষীর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও বাঙালিকে সেটা বারবার শুনে কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়। পক্ষান্তরে, বানানে স থাকলেও উচ্চারণে তার-যে একটা অন্য রূপ রয়েছে তা আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখে যাই, বাঙালির রসনায় সহজেই সেটা চলে আসে।

'সাহস' শব্দটা লক্ষ করুন। এই শব্দের প্রথম স আর শেষের স-এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথম স-এর উচ্চারণ যতটা তালব্য, তার তুলনায় শেষ বর্ণের উচ্চারণে তালুর ব্যবহার অনেকটাই কম, অথচ সেটা ঠিক দন্ত্যও নয়। অর্থাৎ, আমার বক্তব্য, বাংলায় শ ও ষ-এর উচ্চারণ অভিন্ন, স-এর খাঁটি উচ্চারণ রয়েছে প্রধানত যুক্তবর্ণে এবং স-এর উচ্চারণে সাধারণত শ-এর প্রভাব থাকলেও বানানে 'স' বর্ণ যুক্ত কিছু শব্দের অন্যরকম একটা উচ্চারণের সঙ্গে আমরা পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই সেটা তালুর ব্যবহারের কম-বেশি সহ শ + সামান্য দন্ত্য। বাংলা উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে প্রচলিত কিছু শব্দ থেকে 'ষ' ও 'স' বাদ দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভেবেছেন। সেই ভাবনার সুফল যেমন আমরা পেয়েছি তেমনই কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের অভাবও লক্ষ করা গেছে।

একসময়ে কেউ-কেউ হয়তো মনে করেছিলেন যে ‘সাদা’ শব্দটা এসেছে ‘শ্বেত’ থেকে, সুতরাং বানান হওয়া উচিত ‘শাদা’। কিন্তু দেখা গেল, শব্দটা এসেছে ফারসি ‘সাদ্‌হ’ থেকে, ফলে অধিকাংশই ‘সাদা’ বানান বহাল রাখলেন। এইসূত্রে বলি, সাদা-র সাধারণ উচ্চারণ পুরোপুরি শাদা না-হলেও আমরা ‘শাদা’ উচ্চারণ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসু যেমন ‘শাদা’ লিখতেন তেমনই স্পষ্ট শ উচ্চারণও করতেন। কক্‌নিতে এইরকম একটা কৃত্রিম উচ্চারণভঙ্গি একাংশ দক্ষিণ কলকাতাবাসীর মুখে শোনা যায়। উত্তর কলকাতার কক্‌নিতে স-এর প্রাধান্যের কথা জানা আছে, যেমন— ‘স্যামবাজারের সসিবাবু সসা খেতে-খেতে সসুরবাড়ি যাচ্ছেন’। দক্ষিণ কলকাতার কারো-কারো উচ্চারণে আবার অকারণে শ-এর প্রাধান্য, তাঁদের মুখে ‘মাসিমা, আসি’ হয়ে যায় ‘মাশিমা, আশি’। এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে ‘আশি’ আর ‘আসি’-র উচ্চারণ হুবহু এক নয় এবং এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু রয়েছে বলেই যুক্তবর্ণহীন প্রচুর তৎসম ও অতৎসম শব্দে স এখনও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।

তবে যেসব শব্দে অকারণে আগে স ব্যবহার করা হতো এবং শ লিখলেও অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে ইদানীং শ-এর প্রয়োগ বেড়েছে। উসখুস, সাবাস, হদিস-এর পরিবর্তে উশখুশ, শাবাশ, হদিশ প্রভৃতি বানানই একালে বেশি প্রচলিত। ‘নক্সা’, ‘রিক্সা’ ও ‘মুস্কিল’-কেও ‘নকশা’, ‘রিকশা’ ও ‘মুশকিল’ করা গেছে। সেইসঙ্গে শ, ষ বা স যুক্ত যেসব তৎসম শব্দে সংস্কৃতেই বিকল্পে শ প্রয়োগের বিধান ছিল সেগুলো শ দিয়ে লেখারই সুপারিশ করেছে আকাদেমি ও সংসদ। যেমন— কংশ, কলশ, কলশি, কিশলয়, কৃকলাশ, কোশ, কৌশল্যা, কৌশিক, পরিবেশ, পরিবেশন, ভূশণ্ডি, শষ্প, শিপ্রা, শূর্পণখা। এর মধ্যে কয়েকটিতে অবশ্য আগে থেকেই শ প্রচলিত ছিল। আবার কয়েকটি, যেমন— কংশ, কলশ, কলশি, কোশ (সেইসঙ্গে কোশাগার, রাজকোশ প্রভৃতি) এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি, কংস, কলস, কলসি, কোষ (সেইসঙ্গে কোষাগার, রাজকোষ প্রভৃতি) বানানই বেশি চোখে পড়ে। আমার মনে হয়, নিয়মটিকে মান্যতা দিতে হলে শেষোক্ত বানানগুলিতে সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তন করাই বিধেয়।

আরেকটি বিষয়ে আমার ধন্দ কাটছে না। বাংলায় ষ-এর আলাদা উচ্চারণ নেই এই যুক্তিতে অতৎসম শব্দ থেকে ওই বর্ণটির ব্যবহার বিলোপের তাগিদ থেকে অল্প কয়েকটি শব্দে প্রচলিত ষ-এর জায়গায় স আমদানি করেছেন আকাদেমি ও সংসদের বানানবিধি রচয়িতাগণ। যেমন— ঘুষ, ঘুষখোর, ঘুষঘুষ, ঘুষঘুষে, ঘুষি, ঘুষোঘুষি, ঘুষানো, ঘুষোনো প্রভৃতি শব্দের বানান ওই দুটি সংস্থার অভিধানে যথাক্রমে ঘুস, ঘুসখোর, ঘুসঘুস, ঘুসঘুসে, ঘুসি, ঘুসোঘুসি, ঘুসানো, ঘুসোনো। এই পরিবর্তন কতদূর সংগত তা বোধহয় ভেবে দেখা দরকার। কারণ অন্তত দুটি।

প্রথমত, ষ রয়েছে এমন বহু অতৎসম শব্দের বানান পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়নি, অবিকৃত রাখা হয়েছে ঘেঁষা, ঘেঁষাঘেঁষি, চাষ, চাষ-আবাদ, চাষা, চাষাড়ে, চাষি,

তোষামুদি, তোষামুদে, তোষামোদ, তোষামোদি, পেষা, পেষানো, পেষাবার, মোষ, ষাঁড় প্রভৃতি। তাহলে উপরের কয়েকটি বানান পালটে এমন কী লাভ হলো? না-পালটালে কি চলছিলই না?

দ্বিতীয়ত, ষ আর শ-এর উচ্চারণ যেহেতু এক এবং স সম্পূর্ণ আলাদা, সেহেতু পরিবর্তিত বানানে স-এর জায়গায় শ লিখলেই সেটা মূল উচ্চারণ বজায় রাখার সহায়ক হতো, পরিবর্তনের নামে স আমদানি করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। স দিয়ে ঘুস, ঘুসখোর, ঘুসঘুস, ঘুসঘুসে, ঘুসি, ঘুসোঘুসি, ঘুসানো, ঘুসোনো প্রভৃতি বানান লিখলেও বাঙালি সেগুলোর উচ্চারণ আগের মতোই করবে যথাক্রমে ঘুশ, ঘুশখোর, ঘুশঘুশ, ঘুশঘুশে, ঘুশি, ঘুশোঘুশি, ঘুশানো, ঘুশোনো। অর্থাৎ পরিবর্তন এক্ষেত্রে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে না।

আরো কয়েকটা বানানে শ, না স কোন্‌টা সংগত সে-বিষয়ে দ্বিমত লক্ষ করা যাচ্ছে। সেগুলো মূলত অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দ। এইরকম কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত— ক্লাশ/ক্লাস, গ্লাশ/গ্লাস, নোটিশ/নোটিস, পাশ/পাস, পুলিশ/পুলিস। দুরকম বানানই প্রচলিত। প্রাতিষ্ঠানিক স্থির সিদ্ধান্তেরও অভাব রয়েছে। তাই বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে কোন্ বানান অভিপ্রেত সেটা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারলে ভালো হয়। আমার মতে, উল্লিখিত বানান-যুগলের কোনোটাই ভুল নয়, শুধু প্রয়োগের সময়ে বাংলা শব্দ হিসেবে শ দিয়ে এবং লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে স দিয়ে বানান লেখা যেতে পারে। তাতে বাংলার স্বাতন্ত্র্য যেমন বজায় থাকে তেমনই অন্য ভাষার শব্দের মূল উচ্চারণটাকেও মান্যতা দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা আরেকটু খোলসা করে বলা যাক। ইংরেজি class শব্দটির শেষ স উচ্চারণ বজায় রাখতে হলে বাংলা প্রতিবর্ণীকৃত রূপ অবশ্যই 'ক্লাস'। বাংলায় 'শ্রেণিকক্ষ' বা 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠশ্রেণি' ছাড়াও এই শব্দের আরো কয়েকটা অর্থ রয়েছে। যেমন— মর্যাদা, গুণ অথবা ক্রম অনুসারে সজ্জিত শ্রেণি, (অবস্থা, পেশা প্রভৃতির দিক থেকে) সামাজিক শ্রেণি, মূল্যায়নের মান, উচ্চমান, শ্রেণিভুক্ত বা শ্রেণিবিভাগ করা ইত্যাদি। ওইসব অর্থে বাংলায় 'ক্লাস' লেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই, যথা— 'হাই ক্লাস' বা 'ক্লাস স্ট্রাগ্‌ল'। কিন্তু শ্রেণিকক্ষ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠশ্রেণি অর্থে বাঙালির রসনায় শ দিয়ে 'ক্লাশ' কথাটাই কি বেশি মানায় না? কোনো মেয়ে বা ছেলে বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণিতে পড়ে তা জানতে চেয়ে আমরা সাধারণত বলি, 'তুমি কোন্ ক্লাশে পড়ো?' কিংবা এরকমও বলি, 'ক্লাশে একটুও গন্ডগোল (বা গোলমাল) করবে না।' অথবা 'ক্লাশ ফাঁকি দেওয়া মোটেই ভালো নয়।' অথবা 'শিক্ষকরা কি আজকাল ক্লাশে ঠিকমতো পড়াচ্ছেন না?' এইসব ক্ষেত্রে 'ক্লাশ' শব্দটা 'ক্লাস'-এর বঙ্গীকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম প্রশ্নটির জবাবে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণি কথাটা যদি ইংরেজিতে বলতে হয় তাহলে মেয়েটি বা ছেলেটি বলবে, 'ক্লাস থ্রি' অথবা 'ক্লাস ফোর'। একটু খেয়াল রাখলেই বুঝতে পারবেন যে সাবলীলভাবে 'ক্লাশ থ্রি', 'ক্লাশ ফোর', 'ক্লাশ ফাইভ' প্রভৃতি বলা যায় না। অর্থাৎ 'ক্লাস'

ইংরেজির লিপ্যন্তর এবং 'ক্লাশ' বাংলা শব্দ। (কোনো-কোনো ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি অবশ্য 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ো' বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তবে সেটাকে আমরা ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করতে চাই।) কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ইংরেজিতে ক্লাস আর বাংলায় ক্লাশ এরকম আলাদা করা যায় কি? আমার বক্তব্য, নিশ্চয় যায়। ইংরেজি table শব্দটির বাংলা লিপ্যন্তর 'টেব্‌ল' কিন্তু তার বঙ্গীকৃত রূপ তো 'টেবিল'। Table-এর অন্য অর্থও অবশ্য রয়েছে, যথা— ছক, তালিকা, সারণি। কিন্তু বাংলায় টেবিল বলতে আমরা একটা বস্তুই বুঝি। ঠিক তেমনই 'ক্লাস'-এর যত অর্থই থাক, 'ক্লাশ' বলতে একটা জিনিসই বুঝি। সেজন্যে বাংলা বানানে ওই শব্দে শ ব্যবহারেরই আমরা পক্ষপাতী।

ইংরেজি glass-এর বাংলা লিপ্যন্তর অবশ্যই 'গ্লাস'। পানপাত্র ছাড়াও শব্দটি কাচ, আয়না প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত। কিন্তু পানপাত্র অর্থে বাঙালির মুখে শব্দটা সাধারণত 'গ্লাশ' হিসেবেই উচ্চারিত হয়। 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাশ জল দাও না ভাই' কিংবা 'দুধটা বাটির পরিবর্তে গ্লাশেই দিয়ো'— এরকমই কি আমরা বলি না? এই গ্লাশ-এরই কথ্য রূপ 'গেলাশ', যা গ্রামেগঞ্জে হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, পানপাত্র-যে শুধু 'গ্লাস' অর্থাৎ কাচ দিয়েই তৈরি হয় তা-ও তো নয়, কাচের গ্লাশ ছাড়াও পেতলের গ্লাশ, কাঁসার গ্লাশ, পাথরের গ্লাশ, স্টিলের গ্লাশ প্রভৃতির সঙ্গেও সকলেই যথেষ্ট পরিচিত। তাই পেতলের 'গ্লাস', কাঁসার 'গ্লাস', পাথরের 'গ্লাস', স্টিলের 'গ্লাস' বললে সেটা কি অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'-র মতো মনে হবে না? অধিকন্তু, ইংরেজি tumblerও আমাদের কাছে 'গ্লাশ', যদিও তার প্রকৃত অর্থ 'হাতলহীন বড় গ্লাশ'। ছোট বা বড় যা-ই হোক, হাতল থাকলে বাঙালি সেটাকে আর গ্লাশ বলে না, তখন সেটা হয়ে যায় 'কাপ' বা 'মগ' (mug)।

বাংলা 'নোটিশ' কথাটাও ইংরেজি notice থেকেই এসেছে। Notice-এর খাঁটি উচ্চারণ যদিও 'নঅওটিস্', বাংলা লিপ্যন্তরে সেটা 'নোটিস' হিসেবেই প্রচলিত। 'নোটিস'-এর একাধিক অর্থ, যথা— সংবাদজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, লিখিত ঘোষণা, লক্ষ করা, নজর দেওয়া, গ্রাহ্য করা, পর্যবেক্ষণ করা বা মনোযোগ দেওয়া। কিন্তু বাংলা 'নোটিশ' শুধু বিজ্ঞপ্তি বা লিখিত ঘোষণা অর্থেই ব্যবহৃত। এইরকম ব্যবহারের কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ : 'নোটিশটা ঝুলিয়ে দিয়ে এসো'; 'এর জন্য কি তোমাকে অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে?'; 'সরকারের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে'; 'আদালতের নোটিশ পেয়েও তুমি চুপচাপ বসে রয়েছ?'; 'পুরসভা অমুকবাবুকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে'; 'ব্যাপারটা তো কাগজে নোটিশ দিয়ে সবাইকে জানানো হয়েছে' ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার কথা মাথায় রেখে আমরা শ দিয়ে 'নোটিশ' বানান লেখাই শ্রেয় জ্ঞান করি। তবে লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে 'নোটিস' বানানে আপত্তির কারণ দেখি না।

ইংরেজি pass (উচ্চারণ 'পাস্') শব্দটার একাধিক অর্থ রয়েছে, যেমন— এগনো,

অবস্থান্তর, রূপান্তরিত হওয়া, মালিকানা বদল, অতিক্রান্ত হওয়া, পার করা, মঞ্জুর বা অনুমোদন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শেষোক্ত অর্থে বাংলায় 'পাশ' কথাটাই বেশি প্রচলিত। এটাকে ইংরেজি থেকে আহরণ-করা বাংলা শব্দ বলা যেতে পারে। আমরা হামেশাই অনুজ ছাত্রছাত্রীদের বলি, 'পড়াশোনা কেমন চলছে, পাশ করতে পারবে তো?' পরীক্ষার ফল বেরনোর পর সংবাদপত্রে শিরোনাম হয় : 'মাধ্যমিকে এবার পাশের হার ৮০ শতাংশ' কিংবা 'এবার উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার বেড়েছে'। ইংরেজি fail (উচ্চারণ 'ফেইল্') শব্দটাও বাংলায় 'ফেল'। তাই উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণ বা সাফল্য-ব্যর্থতা বোঝাতে আমরা বলি, 'পরীক্ষায় পাশ-ফেল থাকেই।' এরকম ক্ষেত্রে 'পাস' লিখলে বাংলায় যথার্থ ভাবটা প্রকাশ পায় না। তবে, 'বলটা আমাকে পাস করে দাও' অথবা 'লোকসভায় বিলটা পাস হলো' প্রভৃতি বাক্যে বানানটা শ দিয়ে না-লেখাই ভালো, কারণ সেগুলো আসলে ইংরেজি শব্দের বাংলা লিপ্যন্তর। অবশ্য, সংস্কৃতে ও বাংলায় আরো কয়েকটা অর্থে 'পাশ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, যেমন— 'নাগপাশ', 'কেশপাশ', 'আশপাশ', 'গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটা নদী', 'পাশের বাড়ি', 'একটু পাশে যাও' ইত্যাদি; কিন্তু এগুলোর সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করাকে গুলিয়ে ফেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইংরেজি police (খাঁটি উচ্চারণ 'পঅ্ʼলীস্') শব্দটা বাংলায় 'পুলিশ' হয়েছে। অসমিয়ায় পুলিশের পরিবর্তে সাধারণত 'আরক্ষী' লেখা হয়। কিন্তু জনগণ বা দেশের রক্ষায় নিযুক্ত (সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন) সমস্ত বাহিনীকেই পুলিশ বলা যায় না, রয়েছে সি.আর.পি.এফ., বি.এস.এফ., সি.আই.এস.এফ., র‍্যাফ বা আর্মি প্রভৃতিও, যেগুলোর সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার। এঁদের কেউই সঠিক অর্থে 'পুলিশ' নন। কেউ-কেউ 'পুলিস' বানান লেখেন, একাংশ সংবাদপত্রেও 'পুলিস' চোখে পড়েছে। কিন্তু আ.বা.প. সর্বদাই 'পুলিশ' ও 'পাশ' লেখে। আকাদেমি ও সংসদও শ দিয়ে বানান দুটি অনুমোদন করেছে। বস্তুত 'পুলিশ'কে বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে ই-প্রত্যয় যোগে 'পুলিশি' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে (যা ইংরেজিতে নেই)। দৃষ্টান্ত : পুলিশি নির্যাতন, পুলিশি বন্দোবস্ত। তাই আমরা চাই যে সকলেই শ দিয়ে পুলিশ/পুলিশি বানান লিখুন।

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, বাংলায় যুক্তবর্ণ ব্যতীত স-এর খাঁটি দন্ত্য উচ্চারণ নেই বললেই চলে। যুক্তবর্ণে তৎসম-অতৎসম নির্বিশেষে প্রচুর শব্দে স-এর উচ্চারণ রয়েছে। অস্ত, আস্ত থেকে শুরু করে পোস্ত, ব্যস্ত , স্তন, স্তবক পর্যন্ত অনেক শব্দে স-এর খাঁটি দন্ত্য উচ্চারণ আমরা করে থাকি। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, স-এর সঙ্গে যুক্ত ত বর্ণটাও দন্ত্য। সংস্কৃতে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে সাধারণত মূর্ধন্য বর্ণের সঙ্গে মূর্ধন্য, দন্ত্য বর্ণের সঙ্গে দন্ত্য এবং তালব্য বর্ণের সঙ্গে তালব্য বর্ণের ব্যবহারই প্রচলিত। যেমন— ষ্ট, ষ্ঠ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, স্ত, স্থ, শ্চ, শ্ছ প্রভৃতি। তালব্য বর্ণের সঙ্গে দন্ত্য বর্ণের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সম্ভবত দুটি —'শ্ন'-যুক্ত প্রশ্ন, শিশ্ন। সংস্কৃত ভাষায় শ, ষ, স-এর পৃথক উচ্চারণ বজায় রাখা হতো। কিন্তু বাংলায় সবসময় সেরকম হয় না। এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের পূর্বে বলা দরকার,

উল্লিখিত দুটি শব্দে শ-এর সঙ্গে দন্ত্য বর্ণ যুক্ত হলেও শ-এর তালব্য উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। প্রশ্ন শব্দে যুক্তবর্ণটিতে ন থাকায় তার প্রভাবে একসময়ে বাংলায় শ-এরও দন্ত্য উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, যেমন— প্র'স্‌ন' (প্রোস্‌নো)। কিন্তু শিশ্ন শব্দের উচ্চারণে কখনোই স ছিল না। সেজন্য উচ্চারণ-সচেতন বাঙালিরা একালে অনায়াসে প্র'শ্‌ন' (প্রোশ্‌নো) বলে থাকেন।

বাঙালির রসনায় সাধারণত শ-এর প্রাধান্য থাকলেও এবং অনেক ক্ষেত্রেই স-ও শ-এর মতো উচ্চারিত হলেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ঠিক উলটো ব্যাপারও ঘটে। অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে বাংলায় শ-কে স হিসেবে উচ্চারণ করা হয়, শ-এর সঙ্গে র-ফলা, ঋ-কার এবং ল থাকলে। উদাহরণ অজস্র : অশ্রু (এবং অশ্রু-যুক্ত সমস্ত শব্দ), অশ্রদ্ধা/শ্রদ্ধা (এবং সেইসঙ্গে শ্রদ্ধা-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রদ্ধেয়, শ্রবণ (এবং শ্রবণ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রব্য, শ্রম (এবং শ্রম-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রমিক, শ্রয়, শ্রাদ্ধ (এবং শ্রাদ্ধ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রান্ত (এবং শ্রান্ত-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রান্তি (এবং শ্রান্তি-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রাবণ (এবং শ্রাবণ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রাবণী, শ্রাবস্তী, অশ্রাব্য/শ্রাব্য, বিশ্রী/শ্রী (এবং শ্রী-যুক্ত সমস্ত শব্দ), অশ্রুত/শ্রুত (এবং শ্রুত-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রুতি (এবং শ্রুতি-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রেণি (এবং শ্রেণি-যুক্ত সমস্ত শব্দ), আশ্রয়, আশ্রিত, শ্রেয়, শ্রেয়সী, শ্রেয়োজনক, শ্রেয়োবোধ, শ্রেয়োলাভ, শ্রেষ্ঠ/শ্রেষ্ঠা (এবং শ্রেষ্ঠ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্রোণি, শ্রোতা, শ্রোতৃ (এবং শ্রোতৃ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শৃগাল, শৃঙ্খল (এবং শৃঙ্খল-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শৃঙ্খলা (এবং শৃঙ্খলা-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শৃঙ্গ/শৃঙ্গী, শৃঙ্গার (এবং শৃঙ্গার-যুক্ত সমস্ত শব্দ), অশ্লাঘা, অশ্লিষ্ট, আশ্লিষ্ট, শ্লিষ্ট, সংশ্লিষ্ট, অশ্লীল, অশ্লেষা, আশ্লেষ, শ্লথ (এবং শ্লথ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্লাঘা (এবং শ্লাঘা-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্লীল (এবং শ্লীল-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্লেষ (এবং শ্লেষ-যুক্ত সমস্ত শব্দ), শ্লোক (এবং শ্লোক-যুক্ত সমস্ত শব্দ) প্রভৃতি।

উল্লিখিত শব্দের সব শ বাংলায় স হিসেবে উচ্চারিত হয়। সম্প্রতি একাংশ বাচিক শিল্পী শুধু অশ্লীল/শ্লীল শব্দ দুটি অশ্‌শ্লিল্‌/শ্লিল্‌ হিসেবে উচ্চারণ করছেন। কেউ-কেউ এটাকে পরিশীলিত উচ্চারণের নজির বলে মানতে চান। কিন্তু বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণের পরিপন্থী হওয়ায় এই ব্যতিক্রমকে অভিধানে স্থান দেওয়া হয়নি। শ্ল-যুক্ত অন্যান্য শব্দের মতোই এই দুটি শব্দেরও মান্য উচ্চারণ যথাক্রমে অস্‌স্লিল্‌ ও স্লিল্‌। অযথা কষ্ট করে শব্দ দুটিকে অশ্‌শ্লিল্‌/শ্লিল্‌ হিসেবে উচ্চারণ করার কোনো দরকার নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত।

ণ-কে বাংলায় ন হিসেবে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও অতীতে অতৎসম শব্দের বানানেও ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড প্রচলিত ছিল। মুশকিল হলো বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তর করতে গিয়ে। And, band, land প্রভৃতি শব্দের লিপ্যন্তরে অ্যাণ্ড, ব্যাণ্ড, ল্যাণ্ড অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। ফলে আমদানি করা হলো ন+ট, ন+ঠ, ন+ড যুক্তবর্ণ ন্ট, ন্ঠ, ন্ড। ক্রমে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তর ছাড়াও অতৎসম শব্দে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড-এর পরিবর্তে ন্ট, ন্ঠ, ন্ড মান্যতা পেয়েছে। সেইসঙ্গে এসেছে অ্যা ও অ্যা-কার। অ্যান্ড, ব্যান্ড, ল্যান্ড, লন্ডন-এর মতো নন্টেফন্টে, হন্টন, লন্ঠন, গুন্ডা, মন্ডামিঠাই, লন্ডভন্ড প্রভৃতি বানানই এখন বেশি প্রচলিত।

ষ্ট বনাম স্ট

বাংলায় স+ট উচ্চারণ ছিল না, বহু ইংরেজি শব্দের st-র লিপ্যন্তরের জন্যে নতুন যুক্তবর্ণ স্ট আমাদের ভাষায় স্থান পেয়েছে। শুধু লিপ্যন্তর নয়, কয়েকটি ইংরেজি শব্দ উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে বাংলাভাষায় গৃহীতও হয়েছে। যেমন— অ্যাসবেস্টস, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোভ প্রভৃতি। (এইখানে বলে রাখি, অনেকে 'স্টুডিও' 'রেডিও' বানান লেখেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলায় য়-শ্রুতি যুক্ত 'ইয়ো'-র প্রচলন থাকায় 'দিও' 'নিও'-র পরিবর্তে 'দিয়ো' নিয়ো' যেমন অধিকাংশের অনুমোদিত, তেমনই 'ও'-র বদলে 'য়ো' দিয়ে 'স্টুডিয়ো' 'রেডিয়ো' লেখাই ভালো।) শব্দের বানানে st নেই এমন বহু ইংরেজি শব্দও ক্রমে ক্রমে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে বাংলাভাষায় স্থান পেয়েছে। যেমন— কফি, কোকো, বেক্‌লাইট (ব্যাকেলাইট), সেলুলয়েড, রেল, ট্রেন, পেট্রোল, ডিজেল, প্যারাফিন প্রভৃতি। আচার্য সুনীতিকুমারও বলেছেন, ''এ সব শব্দের খাঁটি বাঙলা অনুবাদ পাওয়া না গেলে আমরা তেমন দুঃখিত হই না।'' আবার, কাপ (পেয়ালা), প্লেট (পিরিচ), চেয়ার (কেদারা), টেলিফোন বা ফোন (দূরভাষ), মোবাইল ফোন (মুঠোফোন বা চলভাষ), টেলিভিশন বা টিভি (দূরদর্শন), অক্সিজেন (অম্লজান), হাইড্রেজেন (উদজান)-এর মতো বেশকিছু শব্দের বাংলা পরিভাষা থাকলেও যেমন কথাবার্তায় তেমনই লেখায় ইংরেজি শব্দগুলি ব্যবহারেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ।

যা-ই হোক, লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে স্ট ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রচুর ইংরেজি শব্দ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আগেকার 'ষ্ট'-এর পরিবর্তে বাংলা হরফে 'স্ট' দিয়েই লেখা হচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দায় আর বিজ্ঞাপনে অবশ্য ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তরে এখনও অকারণে 'ষ্ট' প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তবে সেটা নিতান্তই অসচেতনতা বা অজ্ঞতার পরিণাম। মূল্য অর্থে ইংরেজি 'কস্ট' শব্দকে 'কষ্ট' লিখে আমাদের কষ্ট দেওয়ার নজির অবশ্য এখনও চোখে পড়েনি। তাই এ নিয়ে ভেবে খুব-একটা লাভ নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে-যে উলটোটাই ঘটেছে, বাংলা উচ্চারণে স-ধ্বনি না-থাকা সত্ত্বেও জোর করে স্ট চালানো হয়েছে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের আলোচ্য বিশেষ করে খ্রিষ্ট/খ্রিষ্টান/খ্রিষ্টাব্দ আর মাষ্টার, যেগুলো অনেকেই স্ট দিয়ে যথাক্রমে খ্রিস্ট/খ্রিস্টান/খ্রিস্টাব্দ আর মাস্টার বানানে লেখেন। কিছু-কিছু সংস্থা ও পত্রিকার বানান-রীতিতেও এইসব শব্দে স্ট অনুমোদিত। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অনুমোদন কি যুক্তিসম্মত? এ-ব্যাপারে আমার বক্তব্য পেশ করবার আগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত তুলে ধরা যাক।

প্রথমেই দেখা যাক সুনীতিকুমার কী বলেছেন। 'শিক্ষক' পত্রিকার ১৩৬৬ সনের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : ''ইংরিজিতে stone, stop প্রভৃতির জন্যে 'স্টোন্, স্টপ্' লিখ্‌লে, উচ্চারণ অনেকটা-ই ধরিয়ে দেওয়া হয় ; কিন্তু অনেকে এই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেন না। বাঙলার শব্দ হ'চ্ছে

‘খ্রীষ্ট’, ‘খ্রীষ্টান’, ‘মাষ্টার’ ; কিন্তু ইংরিজিতে ‘ক্রাইস্ট্’, ‘ক্রিশ্চিয়ান্’ ‘মাস্টর’। বাঙলায় ‘যীশু খৃস্ট লেখা ভুল, কারণ কোনো বাঙালী ‘খ্রীস্ট বলেন না, ‘মাষ্টার মশাই’কে কেউ ‘মাস্টর মশাই’ বলেন না।” (‘বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে’ গ্রন্থের পৃ. ৮০) ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৩৭৩ সনের ২১শে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ’ শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : “ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলা বানানে বজায় রাখিবার জন্য নূতন সংযুক্ত বর্ণ ‘স্ট’ বাঙ্গলা হরফে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে (যদিও ভুল করিয়া বহু স্থলে ‘ষ্ট’-এর বদলে ‘স্ট’ লিখিয়া থাকি — খাঁটি বাঙ্গালীত্ব পাইয়া বসিয়াছে এমন বিদেশী শব্দেও— যেমন ‘মাস্টার, খৃস্ট, ইস্টিসন’— শুদ্ধ বাঙ্গলা রূপ ‘মাষ্টার, খ্রীষ্ট, ইষ্টিশন’ স্থলে)।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ১২৯) একই প্রবন্ধের অন্যত্র তাঁর মন্তব্য “...ক্রাইস্ট্ (খ্রীষ্ট— পোর্তুগীস, গ্রীক ও বাঙ্গলার সংমিশ্রণ-জাত— খাঁটি বাঙ্গলা রূপ ; পোর্তুগীস Jesu Cristo + গ্রীক Iesous Khristos = বাঙ্গলা ‘যীশু খ্রীষ্ট’ ; ইংরেজি জিসস্ বা জিজ়স্ ক্রাইস্ট)...।” (পৃ. ১৩৫)

ক.বি.-১ তাদের বানানের নিয়মে ‘খ্রীষ্ট’ সুপারিশ করেছে এবং রাজশেখর বসুর ‘চলন্তিকা’-তেও ‘খ্রীষ্ট’, ‘খ্রীষ্টান’, ‘খ্রীষ্টাব্দ’, ‘ক্রীশ্চান’ প্রভৃতি বানানই অনুমোদিত। পবিত্র সরকার ‘বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন— “যে ‘মাষ্টার’ বানানটি সাধারণ বাংলা উচ্চারণের মোটামুটি যথাযথ প্রতিফলন ছিল, তার জায়গায় শিক্ষিতের সচেতন উচ্চারণের প্রতিনিধি হিসেবে ‘মাস্টার’ বানানটি চালু হয়েছে, এবং বোঝানো হচ্ছে যে, এই ‘স’ ইংরেজি [s]-এর মতো ; বাংলা শ বা ষ-এর মতো নয়। ফলত দাঁড়িয়েছে যে, ‘মাষ্টার’ ও ‘মাস্টার’ দুটি শব্দ বাংলায়, একটি নয়। পরে আমরা এই কারণেই ‘খ্রিষ্ট’ ‘খ্রিষ্টান’ সুপারিশ করেছি, ‘খ্রিস্ট’ খ্রিস্টান’-এর বদলে।” (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১০২) তবে উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন : “...বই ছাপতে ছাপতে কিছু বানান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমার বদলে গেছে। ‘খ্রিষ্ট’, ‘খ্রিষ্টাব্দ’ সুপারিশ করেছি বইয়ে, কিন্তু সমতার খাতিরে এখন ‘খ্রিস্ট’, খ্রিস্টাব্দ’-ই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে।” আমি তাঁর তথাকথিত ‘সমতার’ যুক্তি মানতে পারিনি। তাই আকাদেমি বানান অভিধানের প্রথম প্রকাশের কিছুদিন আগে, সম্ভবত ১৯৯৬ সালের শেষদিকে, বিষয়টি নিয়ে বি.টি. রোডে অবস্থিত তাঁর দপ্তরে (তখন তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) গিয়ে পবিত্রদার সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমার বক্তব্য শোনার পরে সেখানে উপস্থিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, আকাদেমির অভিধানে কী বানান রাখা হচ্ছে। অমিতাভবাবু বলেন, ‘খ্রিষ্ট’ ‘খ্রিষ্টান’ বানান থাকছে। এবং ওই বই প্রকাশের পরেও ‘খ্রিষ্ট’ ‘খ্রিষ্টান’ ‘খ্রিষ্টাব্দ’ বানানই সেখানে ছিল, তৃতীয় সংস্করণে পালটে ‘খ্রিস্ট’ ‘খ্রিস্টান’ খ্রিস্টাব্দ’ করা হয়। তখন বাংলা আকাদেমিতে পবিত্রদার সঙ্গে একবার দেখা হলে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি যা বললেন তাতে বুঝতে পারি যে যুক্তি নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যেই বানানগুলো পালটানো হয়েছে।

সুভাষ ভট্টাচার্যের উচ্চারণ অভিধানে 'খৃষ্ট', খ্রিষ্ট', 'খৃস্ট', 'খ্রিস্ট' লিখে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে 'খ্রিশ্‌টো, এবং খ্রিস্টান, খ্রিষ্টান লিখে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে 'খ্রিশ্‌টান'। ('খ্রিস্টান'-এর উচ্চারণ কীভাবে 'খ্রিশ্‌টান' হতে পারে তা আমি বুঝতে অপারগ, সেটা তো 'খ্রিস্‌টান্‌' হওয়ারই কথা।) তবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধির' অন্তর্গত সুভাষবাবুর 'লেখক ও সম্পাদকের অভিধান'-এ যা লেখা হয়েছে তা নিম্নরূপ : ''**খ্রিষ্ট** Christ এর বাংলা রূপ হিসাবে **খ্রিষ্ট** বানানই সংগত। 'খ্রিস্ট প্রচলিত হলেও উচ্চারণানুগ নয়, 'খৃষ্ট' বা 'খৃস্ট' বানানও অসংগত। **খ্রিষ্টান, খ্রিস্টান** প্রথমটি অধিকতর সংগত, দ্বিতীয় অধিকতর প্রচলিত। **খ্রিষ্টাব্দ** খ্রিষ্ট+অব্দ। এই বানানই সংগত। এটি প্রতিবর্ণীকৃত রূপ নয়, বঙ্গীকৃত রূপ। **খ্রিস্ট** Christ এর অসংগত কিন্তু বর্তমানে অধিকতর প্রচলিত রূপ। **খ্রিস্টাব্দ— খ্রিষ্টাব্দ-র** অসংগত কিন্তু বর্তমানে অধিকতর প্রচলিত রূপ। **খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টাব্দ** যথাক্রমে **খ্রিষ্ট, খ্রিস্ট** এবং **খ্রিস্টাব্দ-র** বর্জিত রূপ।" এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টাব্দ বানানই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। 'ছিল' বলছি এই কারণে যে, ইদানীং তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে। গত ২০১৮ সালের শারদীয় 'কবিসম্মেলন' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে সুভাষবাবু বলেছেন, ''...আমার মতের কিছু বদল হয়েছে। আপনারা খ্রিষ্ট/খ্রিস্ট, খ্রিষ্টাব্দ/খ্রিস্টাব্দের কথা বলেছেন। আমি এই শব্দে মূর্ধন্য-ষ মানতে পারি না। আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে retroflex ষ আসেই না। যতই বলুন উচ্চারণ অনুসারে খ্রিষ্টাব্দ, খ্রিষ্ট হওয়া উচিত, আমি মানি না সেকথা। 'মিষ্টিটা ভালোই'— এই মিষ্টি-র উচ্চারণ— মিশ্‌টি। 'খ্রিষ্ট/খ্রিস্ট' উচ্চারণ— খ্রিশ্‌টো।... কেননা বাংলায় মূর্ধন্য-ষকে আমরা শ উচ্চারণ করি।... অতএব একান্তই বানান বদলাতে হলে করুন— খ্রিশ্টান, খ্রিশ্টাব্দ। মূর্ধন্য-ষ নয়।"

অন্যদিকে, শঙ্খ ঘোষ 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকার মার্চ, ২০০৬ সংখ্যায় বাংলা আকাদেমির বানানবিধির আলোচনায় 'ভাষার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'খ্রিষ্ট' বানানের পক্ষে সওয়াল করে লিখেছেন : ''বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'ইংরেজি S-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে' তা দন্ত্য-স দিয়ে লেখাই উচিত হবে। তা যদি হয় তবে 'সান্ত্রি'র মতো শব্দেও স-এর দরকার কেন হবে, উচ্চারণের নিরিখে লেখা হচ্ছে বলে স্ট্রিট স্টেশন ইত্যাদি শব্দের পাশে খ্রিস্টের বদলে খ্রিষ্টই সংগত হতো কি না, এসবও কেউ ভাবতে পারেন।" (আকাদেমির 'বানান বিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬৫)

এবারে, আমি কী চাইছি এবং কেন চাইছি সেটা বলি। প্রথমে মাষ্টার/মাস্টার প্রসঙ্গ। সুনীতিকুমার ও পবিত্রদার সঙ্গে আমি একমত যে 'মাষ্টার' শব্দটা (ইংরেজি থেকে আগত) বাংলা এবং তার একমাত্র অর্থ 'শিক্ষক'। পক্ষান্তরে, 'মাস্টার' ইংরেজি master শব্দের লিপ্যন্তর এবং শিক্ষক ছাড়াও মাস্টার-এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে— প্রভু, মালিক, পরিচালক, নিয়ন্তা, নায়ক, নেতা, সর্দার, কর্তা, শাসক, মনিব, জ্ঞানসম্পন্ন বা দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, পণ্ডিত বা বিশারদ ব্যক্তি, ওস্তাদ বা দক্ষ কারিগর প্রভৃতি। কোনো বালকের নামের আগেও মাস্টার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্রে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের

অভিনেতাদের নামের আগেও মাস্টার লেখা হতো। যেমন— মাস্টার বিভু, মাস্টার সুখেন। মাস্টার সুখেনই পরবর্তীকালে অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে সুখেন দাস নামে খ্যাতিলাভ করেছেন। এইসব অর্থে কখনোই 'মাষ্টার' লেখা যায় না। আবার, মাষ্টারের কাজ বা শিক্ষকতাকে বাংলায় 'মাষ্টারি' বলা হয়। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন— ''বর্ত্তমানে আমি চন্দ্রহার হাই ইংলিশ স্কুলে হেডমাষ্টারি করিতেছি।'' (লেখকের 'বাংলা বানান' শীর্ষক গ্রন্থের পৃ. ১৭৫) ইংরেজিতেও অবশ্য 'মাস্টারি' (mastery) শব্দ রয়েছে, কিন্তু বাংলা 'মাষ্টারি'র সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। 'মাস্টারি'-র অর্থ কর্তৃত্ব, পরম দক্ষতা বা পাণ্ডিত্য, দখল, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ইত্যাদি। শিক্ষকতা অর্থে 'মাস্টারি' লিখলে সেটা হবে ভুল প্রয়োগ। সেজন্যেই, 'হেডমাস্টার' মানে প্রধান শিক্ষক হলেও প্রধান শিক্ষকতা বোঝাতে 'হেডমাস্টারি' লেখা অনুচিত বলেই মণীন্দ্রকুমার 'হেডমাষ্টারি' বানান লিখেছিলেন। অনুরূপভাবে, He is a master tailor বাক্যের বাংলা লিপ্যন্তরকালে 'হি ইস আ **মাষ্টার** টেইলর' কিংবা His mastery over the English language is well-known বাক্যের বাংলা লিপ্যন্তরকালে 'হিজ **মাষ্টারি** ওভার দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ইজ ওয়েল-নোন' লেখা অসংগত, কারণ উল্লিখিত বাক্য দুটিতে ব্যবহৃত master ও mastery শব্দের সঙ্গে শিক্ষক বা শিক্ষকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এবং ইংরেজি শব্দ দুটিতে st থাকায় তার লিপ্যন্তরে 'স্ট'-ই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা মাষ্টার বা মাষ্টারি শব্দের উচ্চারণে স-এর কোনো অস্তিত্ব না-থাকায় স্ট দিয়ে বানান লিখলে সেটাকে জবরদস্তির দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পণ্ডিতমশাই-এর অনুকরণে মাষ্টারমশাই প্রচলিত, সেটাকেই একাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি 'মাস্টারমশাই' বলেন। কই, তাঁদের কাউকে তো কখনো ডিরেক্টরমশাই, প্রেসিডেন্টমশাই, চেয়ারম্যানমশাই, ম্যানেজারমশাই, সুপারিনটেন্ডেন্টমশাই বলতে শুনেছি বা লিখতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

'খ্রিষ্ট' 'খ্রিষ্টান' 'খ্রিষ্টাব্দ' প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সুনীতিকুমার বা রাজশেখর এইসব শব্দে একদা ঈ-কার অনুমোদন করলেও ইদানীং ই-কার ব্যবহারই সংগত, কারণ এগুলো অতৎসম শব্দ। বাঙালি সাধারণত দীর্ঘ উচ্চারণ করে না, সে-কারণে অতৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, একালে সেটাই ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে একাধিক বানানবিধিতে। দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্ট-যে ইংরেজি নয়, বরং পোর্তুগিজ ও গ্রিক শব্দের সম্মিলিত বাংলা রূপ— সুনীতিকুমারের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই মান্য। ইংরেজি Christ (যার বাংলা লিপ্যন্তর ক্রাইস্ট) ও Christian (যা বাংলা লিপ্যন্তরে ক্রিশ্চিয়ান হিসেবেই প্রচলিত, যদিও খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণ 'ক্রিস্‌চঅন্') শব্দে আদৌ বাংলায় ব্যবহৃত 'খ্র' নেই, রয়েছে 'ক্র'। আবার, ইংরেজি শব্দে st থাকলেও বাংলা শব্দগুলিতে স-এর উচ্চারণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, ক্রাইস্ট-এর সঙ্গে খ্রিষ্ট-এর যে-পার্থক্য সে-তুলনায় ক্রিশ্চিয়ান-এর সঙ্গে খ্রিষ্টান-এর পার্থক্যও কম নয়। খ্রিষ্ট-এর সঙ্গে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে খ্রিষ্টান শব্দের

সৃষ্টি আর অব্দ যোগে গঠিত হয়েছে খ্রিষ্টাব্দ। ইংরেজি ক্রাইস্ট-এর সঙ্গে অব্দ যোগ করলে শব্দটা খ্রিষ্টাব্দ হতো না, সেটা 'ক্রাইস্টাব্দ' রূপ পেত।

চতুর্থত, বাংলা শব্দ তিনটির কোনোটির উচ্চারণেই স না-থাকায় আমরা অযথা স্ট ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। এইখানে সুভাষবাবুর সাম্প্রতিকতম মন্তব্যটি স্মর্তব্য। তিনি ঠিকই বলেছেন যে বাংলায় ষ-এর আলাদা উচ্চারণ নেই, সেটা শ হিসেবেই উচ্চারিত হয়। এমন-কি 'মিষ্টি' শব্দের উচ্চারণও-যে 'মিশ্‌টি' সেটাও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু সেখানে শ-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চারণ-সূচক স নিশ্চয় ব্যবহার করা যাবে না, অর্থাৎ 'মিস্টি' লেখা যাবে না, লিখলে সেটা হয়ে যাবে ইংরেজি misty শব্দের বাংলা লিপ্যন্তর আর মানে দাঁড়াবে 'কুয়াশায় ঢাকা' বা 'কুয়াশাচ্ছন্ন'। ফলে 'খ্রিস্ট' খ্রিস্টান' 'খ্রিস্টাব্দ' বানানগুলি-যে মোটেই বাংলা উচ্চারণসম্মত নয় সেটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন আর সেজন্যেই প্রকৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 'খ্রিশ্ট' 'খ্রিশ্টান' 'খ্রিশ্টাব্দ' চাইছেন। সুভাষবাবুর এই যুক্তিটা মানি। কিন্তু এখানেও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে।

প্রথম কথা, বাংলায় এখন পর্যন্ত 'শ্ট' যুক্তবর্ণের প্রচলন নেই, কোনো বানানবিধিতে কিংবা লিপিসংস্কারের প্রস্তাবে সেরকম সুপারিশও করা হয়নি। সুতরাং 'খ্রিশ্ট' 'খ্রিশ্টান' 'খ্রিশ্টাব্দ' কবে চলবে কিংবা আদৌ চালানো যাবে কি না সে-প্রশ্নের জবাব এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। দ্বিতীয়ত, বাংলায় ষ-এর উচ্চারণ নেই, ওই বর্ণের বাংলা উচ্চারণ হুবহু শ— এই যুক্তিতে যদি 'খ্রিষ্ট' 'খ্রিষ্টান' 'খ্রিষ্টাব্দ' বানানে আপত্তি করতে হয়, সেক্ষেত্রে আরো বহু অতৎসম শব্দ থেকে 'ষ্ট'-কে নির্বাসন দেওয়া উচিত। যেমন— আড়ষ্ট, কেষ্ট/কেষ্টা, গুষ্টি, তেষ্টা, দুষ্টু, ধাষ্টামো, পষ্ট, ফষ্টিনষ্টি, ভুষ্টিনাশ (সংসদ ও আকাদেমি 'ফস্টিনস্টি' সুপারিশ করেছে, আবার সংসদের বানান 'ভুস্টিনাশ' হলেও আকাদেমির অভিধানে 'ভুষ্টিনাশ'), মিষ্টি প্রভৃতি। কিন্তু সেগুলো বর্তমানে যথাক্রমে আড়শ্ট, কেশ্ট/কেশ্টা, গুশ্টি, তেশ্টা, দুশ্টু, ধাশ্টামো, পশ্ট, ফশ্টিনশ্টি, ভুশ্টিনাশ, মিশ্টি প্রভৃতি বানানে লিখতে স্বয়ং সুভাষবাবু রাজি হবেন কি? ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি, চাষ, মোষ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরহীন বহু অতৎসম শব্দ থেকে এখনও ষ বর্জন করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ওইসব বানানে (যেখানে ষ-এর উচ্চারণ আমরা শ-ই করি) যতদিন-না 'শ্ট' ব্যবহার করা যাচ্ছে ততদিন 'খ্রিষ্ট' 'খ্রিষ্টান' 'খ্রিষ্টাব্দ' বানানে আপত্তির কোনো যুক্তিসংগত কারণের সন্ধান আমরা পাচ্ছি না। সেইসঙ্গে, যাঁরা 'খ্রিস্ট' 'খ্রিস্টান' 'খ্রিস্টাব্দ' লিখছেন তাঁদের কাছে 'স্ট' প্রয়োগের যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনার বিনম্র আবেদন জানাই। কারণ, 'মিশ্‌টি' উচ্চারণ করেও যদি 'মিষ্টি' লেখা যায়, তাহলে 'খ্রিশ্‌টান্‌' উচ্চারণ সত্ত্বেও 'খ্রিষ্টান' লিখতে নিশ্চয় অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, বিশেষত ষ আর শ-এর উচ্চারণ যেহেতু অভিন্ন। এইসূত্রে এটাও উল্লেখ করতে চাই, 'খ্রিস্টান' প্রভৃতি বানানের লেখকরা সকলেই কিন্তু 'খ্রিশ্‌টান্‌' উচ্চারণ করেন, কারো মুখেই আমি 'খ্রিস্‌টান্‌' শুনিনি।

ব্য-ব্যা এবং অন্যান্য

আরেকটা শব্দের বানান নিয়ে বলা জরুরি। শব্দটা 'ব্যাবহারিক'। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কোনো তৎসম শব্দের সঙ্গে ষ্ণিক (ইক্) প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দটির প্রথম বর্ণে স্বরচিহ্নের বৃদ্ধি ঘটে। যেমন— ইতিহাস থেকে ঐতিহাসিক, সমাজ থেকে সামাজিক, বিজ্ঞান থেকে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি। এই নিয়মে ব্যবহার থেকেও হওয়া উচিত ব্যাবহারিক। অর্থাৎ প্রথম বর্ণের স্বরচিহ্নের বৃদ্ধি ঘটে 'ব্য' হয়ে যায় 'ব্যা'। অথচ একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় যে আ.বা.প.-র বিভিন্ন পত্রিকা-সহ প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকায় 'ব্যবহারিক' বানান ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন হচ্ছে? মনিএর উইলিয়াম্‌স-এর অভিধানে 'ব্যাবহারিক' (পৃ. ১০৩৯, প্রথম কলাম) অনুমোদন করে 'ব্যবহারিক'-কে (পৃ. ১০৩৪, তৃতীয় কলাম) ব্যাবহারিক-এর 'ভুল পাঠ' বলা হয়েছে। রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় 'ব্যবহারিক' শব্দের পাশে লেখা রয়েছে "(ব্যাব- দেখ)" এবং যথাস্থানে 'ব্যাবহারিক' শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে তার অর্থ দেওয়া হয়েছে। জামিল চৌধুরীর 'শব্দসংকেত' অভিধানে একমাত্র বানান 'ব্যাবহারিক'। ঢাকার 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান'-এও অবিকল্প 'ব্যাবহারিক'। পবিত্র সরকারের 'বানান-বিবেচনা' এবং তাঁর 'ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান' 'ব্যবহারিক' অনুমোদন করেনি। নরেন্দ্র শর্মার অভিধানের নামেও রয়েছে 'ব্যাবহারিক'।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিধান দুটিতে তো বটেই, আরো বেশ কয়েকটি অভিধানে 'ব্যাবহারিক' পাওয়া যাচ্ছে, পক্ষান্তরে 'ব্যবহারিক' বানান রয়েছে অল্প দু-তিনটি অভিধানে, সম্ভবত মনিএর উইলিয়াম্‌স-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ব্যাবহারিক'-এর 'ভুল পাঠ' হিসেবেই তা অন্তর্ভুক্ত। সংসদ ও আকাদেমির বানান অভিধানেও একমাত্র 'ব্যাবহারিক' সুপারিশ করা হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে 'ব্যাবসায়িক'। এতসব সত্ত্বেও, ঠিক কী কারণে জানা নেই, চারদিকে আ-কারহীন 'ব্যবহারিক' বানানের রমরমা। আমার মনে হয়, বিশেষজ্ঞদের উচিত অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'ব্যবহারিক'-কে বিদায় দিয়ে সর্বত্র 'ব্যাবহারিক' প্রচলনের ব্যবস্থা করা।

আরেকটা নিয়মের যৌক্তিকতা নিয়েও আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে, তাই এখানে উল্লেখ করতে চাই। নিয়মটা ক.বি.১-এ ছিল না, প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় আ.বা.প.-র 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' বইয়ে। সেখানে ২৬ নম্বর নিয়মে বলা হয়, "সংস্কৃত 'ঈয়' ... প্রত্যয়ের বিকল্প নেই। সুতরাং যেমন 'জাতীয়' 'দেশীয়' বা 'ভারতীয়' লিখি, অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনই 'ঈ-কার চাই। (দৃষ্টান্ত : 'এশীয়' 'অস্ট্রেলীয়' 'ইউরোপীয়'।)" (প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১৭) পরে এই নিয়ম সংসদ ও আকাদেমিও সুপারিশ করেছে।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার, জাতি, দেশ, ভারত, ইউরোপ প্রভৃতির সঙ্গে ঈয় যোগ করলে সন্ধির নিয়মে জাতীয়, দেশীয়, ভারতীয়, ইউরোপীয় প্রভৃতি শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু এশিয়া এবং/অথবা অস্ট্রেলিয়া-র সঙ্গে ঈয় যুক্ত হলে ব্যাকরণসিদ্ধ এশীয়

এবং/অথবা অস্ট্রেলীয় শব্দ পাওয়া যায় না। তাহলে অতৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের ওই নিয়মটা জোর করে চাপানো হবে কেন? নিয়মটা মানতে হলে তো রাশিয়া-র সঙ্গেও ঈয় প্রত্যয় যোগ করে 'রাশীয়' লিখতে হয়, লেখা উচিত কোরিয়া থেকে 'কোরীয়', সার্বিয়া থেকে 'সার্বীয়', জাম্বিয়া থেকে 'জাম্বীয়', জর্জিয়া থেকে 'জর্জীয়', বলিভিয়া থেকে 'বলিভীয়, রুমানিয়া থেকে 'রুমানীয়, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে 'চেকোস্লোভাকীয়' ইত্যাদি। এমন-কি চীন থেকে 'চিনীয়', জার্মানি থেকে 'জার্মানীয়', রোম থেকে 'রোমীয়', প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসম্মত হলেও সেগুলো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যাবে কি?। অধিকন্তু, উক্ত নিয়ম অনুমোদনকারী উল্লিখিত তিনটি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার কোথাও আজ পর্যন্ত রাশীয়, কোরীয়, চিনীয়, সার্বীয়, জাম্বীয়, বলিভীয়, জার্মানীয়, রোমীয়, রুমানীয়, চেকোস্লোভাকীয় প্রভৃতি শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। সুতরাং মাত্র গোটা দুয়েক অতৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে ভুল শব্দ গঠনের কোনো যৌক্তিকতা রয়েছে কি? আকাদেমি অবশ্য আরো বেশ কয়েকটি শব্দে নিয়মটি প্রয়োগের সুপারিশ করেছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তব ব্যবহার দেখা যায় না বললেই চলে।

কি/কী-র প্রয়োগ

বাংলায় একক স্বরবর্ণের শব্দ হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সীমিত। সে-তুলনায় একক ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটিমাত্র স্বরচিহ্ন যুক্ত শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি। উদাহরণ— কি, কী, কে, খা, গা, ঘা, ঘি, চা, ছা, জো, ঝা, ঝি, তা, তো, দা, দে, ধো, না, পা, বা, মা, যা, যে, রে, শা, সে, হে, হা প্রভৃতি। এ-ছাড়াও কয়েকটা রয়েছে যেগুলো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন—টি/টা/টে/টো, নি (নাই-এর সংক্ষিপ্ত রূপ), নে (না-এর কথ্য রূপ)। শেষোক্ত শব্দটার ব্যবহার ইদানীংকালের লেখায় নেই বললেই চলে। মুখেও এখন 'করি নে'/'করিনে', 'পারি নে'/'পারিনে' প্রভৃতি বলতে তেমন শোনা যায় না। পক্ষান্তরে, 'নি' যদিও 'নাই'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, সেটা কোনো ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত না-হলে অর্থোদ্ধারে অসুবিধে ঘটে। কারণ শুধু 'নি' বললে সেটা 'নিই'-এর সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ বোঝানোর সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই আগে যদিও 'খাই নি', 'বলি নি', 'যাই নি' এরকম লেখা হতো, আজকাল 'খাইনি', 'বলিনি, 'যাইনি' প্রয়োগই যুক্তিসম্মত বলে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। আর, বলা বাহুল্য, টি/টা/টে/টো শুধু সংখ্যাবাচক শব্দ বা অন্য কোনো বিশেষ্যের সঙ্গে বসে, আলাদাভাবে লেখা যায় না।

একক ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটিমাত্র স্বরচিহ্ন-যোগে যেসব শব্দের কথা উপরে বলা হয়েছে তার অধিকাংশের প্রয়োগ নিয়ে দ্বিমত নেই। ব্যতিক্রম শুধু 'কি' আর 'কী', এ-দুটির যথার্থ ব্যবহার নিয়ে এখনও বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। গত আড়াই দশকে বিষয়টা বানান-বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় একাধিক বার স্থান পেয়েছে, ব্যাবহারিক পার্থক্যের দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে ব্যাখ্যা-সহ। তবু-যে সংশয় দূর হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মুদ্রিত রচনায়। বিশেষ করে, অযথা 'কী' লেখার প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন সংস্থার বানানবিধিতেও মতভেদ লক্ষ করা গেছে। সুতরাং আরো একবার এ-বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন, কারণ আধুনিক কালে তিনিই এ-ব্যাপারে প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাচীন সাহিত্যেও অবশ্য 'কি' ও 'কী' পাওয়া যায়, তবে সেখানে অর্থ অনুযায়ী পার্থক্য বজায় রাখা হয়নি। পার্থক্য রাখার প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনময় রায়কে ১৯৩১ সালের ৫ নভেম্বর লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান : ''প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ'— বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিস রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে।'' (পূর্বোক্ত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', পৃ. ২৯০) এইসূত্রে উল্লেখ্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান'

শিরোনামে বিশ্বভারতীর সমস্ত প্রকাশনায় ব্যবহার্য যে-বিধিটি রচনা করেন এবং যেটা 'প্রবাসী'-তে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ (ডিসেম্বর ১৯২৫)-এ প্রকাশ পায় সেখানেও 'কি'-কে প্রশ্নসূচক অব্যয় আর 'কী'-কে নির্দেশক সর্বনাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এটা হলো সমস্যার এক দিক এবং এই দিকটা নিয়ে বর্তমানে সকলেই মোটামুটি একমত। শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েছে, যেখানে 'কি' ও 'কী' আলাদা বানানের 'প্রয়োজন' স্বীকার করা হয়নি। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ১৯৯৫-৯৬ সালের পত্রিকায় একটা সংক্ষিপ্ত বানানবিধির আমরা সাক্ষাৎ পাই। তার এক জায়গায় লেখা রয়েছে : "১. ... 'কি' বহুল প্রচলিত হ্রস্ব 'ই' যুক্ত শব্দ। এটি এইরূপেই সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 'কী' বানানের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এটি একটি মাত্র শব্দ এবং বিভিন্ন অবস্থায় এর পদগত প্রকৃতি ভিন্ন হলেও উচ্চারণে এই ভিন্নতা প্রকাশ পায় না, পেলেও তা এতই নগণ্য যে এরজন্যে দীর্ঘত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।" (পৃ. ১২২)

এই মন্তব্য পাঠে আমি শুধু আশ্চর্য নয়, রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যাই দুটো কারণে। প্রথমত, উক্ত বিভাগেরই কয়েকজন অধ্যাপক নিজেদের লেখায় 'কি' ও 'কী' বানান ব্যবহার করেন অর্থপার্থক্য বোঝাতে। দ্বিতীয়ত, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিধান রচনার তিরিশ বছর আগেই আচার্য মণীন্দ্রকুমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে 'প্রয়োজনটা' উচ্চারণে হ্রস্বতা-দীর্ঘতার জন্য নয়, লেখায় অর্থের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করবার জন্য। মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্য আমরা জানতে পারি 'পর্ষদ্ বার্তা'-র নভেম্বর ১৯৬৫-তে প্রকাশিত 'বানান-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'আকাশবাণী'-র কলকাতা কেন্দ্রে ২৩ অক্টোবর ১৯৭৯ তারিখে প্রদত্ত 'বাংলাবানান সমস্যা' শীর্ষক বক্তৃতা থেকে। ওই প্রবন্ধ ও বক্তৃতার পাঠ মণীন্দ্রকুমারের পূর্বোল্লিখিত 'বাংলা বানান' গ্রন্থের পৃ. ৭৮ থেকে ৮১-তে মুদ্রিত। তাঁর বক্তব্যের সবটুকু উদ্ধৃত করতে গেলে এখানে প্রচুর জায়গা লেগে যাবে, সুতরাং আগ্রহী পাঠক মূল বইটি দেখে নেবেন। আমরা বরং এখানে সংক্ষেপে বানানে পার্থক্য রাখার 'প্রয়োজনের' যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি।

প্রয়োজন-যে রয়েছে সেটা তো রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, বানানে পার্থক্য না-রাখলে বহু ক্ষেত্রেই কিছু প্রশ্ন-যুক্ত বাক্যের অর্থ সঠিক ভাবে প্রকাশ পায় না। তুমি খাবে কি না কিংবা তুমি কোন্ বস্তু খাবে— প্রশ্নকর্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য লিখিত বাক্যে আলাদাভাবে 'কি' ও 'কী' প্রয়োগ না-করলে শ্রোতা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়বেন। এক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ তথা 'ঝোঁক' বা 'জোর' দেওয়ার যুক্তি যেমন অচল, তেমনই 'কি' বাক্যের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করলেও সেটাকে 'কী' করে দেওয়া অনুচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিষয়টা নিয়ে এখনও কারো-কারো মনে কিছুটা সংশয় রয়েছে, এবং রয়েছে বলেই অকারণে 'কি'-র পরিবর্তে 'কী' ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত পেশ করি। (ক) "এ কী পাটকলের নোকরি নাকি?" (সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘প্রথম আলো’-র প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ৭১৬) (খ) ‘‘বন্ধ খামে দেওয়া সেই রিপোর্টে কী ঘুষের মামলায় ক্লিনচিট পেলেন ছুটিতে পাঠানো সিবিআই ডিরেক্টর অলোক বর্মা? না কি গরমিলের আরও তদন্তের কথা রয়েছে সেখানে?” (আ.বা.প., ১৬ নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ১) (গ) ‘‘এ বারেও কী গুজরাতের রাজ্যসভা ভোট নিয়ে উত্তাপ ছড়াতে চলেছে? বল সেই নির্বাচন কমিশনের কোর্টেই।” (আ.বা.প., ১৪ জুন ২০১৯, পৃ. ৮) উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেই ‘কী’-র ভুল প্রয়োগ ঘটেছে। হওয়া উচিত ছিল ‘কি’, কারণ ওইসব বাক্যে শুধুই প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে ‘কী’ ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না। অথচ উক্ত ১৪ জুনের একই পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য দুটি সংবাদে ‘কী’-র সঠিক প্রয়োগ আমরা দেখেছি। এক. ‘‘কিন্তু কর্মবিরতিতে কী চিকিৎসা হয়েছে জানা নেই।” (পৃ. ৫) দুই. ‘‘কী কী বিষয়ে মুলতুবি [প্রস্তাব] আনা যায়, দু’পক্ষে কথা বলেই ঠিক করা হবে।” (পৃ. ৬) এসব দেখেই আমার মনে হয়েছে যে ‘কি’ ‘কী’-র পার্থক্য নিয়ে আরো খানিকটা আলোচনা হয়তো সংশয়মুক্তির সহায়ক হতে পারে। এখানে প্রয়োগগত পার্থক্যটা ব্যাখ্যা-সহ তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

১) প্রশ্নসূচক অব্যয় ছাড়াও ‘কি’-র আরো নানারকম ব্যবহার আছে। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট কিছু বোঝানোর জন্য ‘কী’ লেখা হয়, যার অর্থ অনেকটা ইংরেজি ‘which’ বা ‘what’-এর মতো। আর প্রশ্নসূচক হোক বা না-হোক, ‘কি’ সর্বত্রই অব্যয়, কিন্তু সর্বনাম ছাড়াও বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবেও ‘কী’-র ব্যবহার রয়েছে।

২) একই বাক্যে ‘কি’ ও ‘কী’ প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, ‘তুমি কি জানো যে তুমি ঠিক কী করতে চেয়েছিলে?’ কিংবা ‘অশোক কি তোমাকে জানিয়েছে যে সে কী কারণে ওখানে গিয়েছিল?’ এইসব বাক্যে ‘কি’ বলা বা লেখা হয় শুধুই প্রশ্ন করার জন্য (যার জবাবে শুধু হ্যাঁ বা না বলতে কিংবা লিখতে হয়), কিন্তু ‘কী’ লেখা বা বলা হয় সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

৩) ‘কি’ ও ‘কী’ দুটোই বাক্যের মধ্যে এবং/অথবা শেষে বসতে পারে। ‘তুমি কি খাবে?’/‘তুমি খাবে কি?’ ‘তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে?’/‘তুমি সেখানে গিয়েছিলে কি?’ এই দু-জোড়া বাক্যে ‘কি’ একই অর্থ বহন করছে, অর্থাৎ তুমি খাবে কি খাবে না কিংবা গিয়েছিলে কি যাওনি সেটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে। নিছক প্রশ্ন ছাড়া স্থান পরিবর্তনে এই ‘কি’-র অন্য কোনো ভূমিকা নেই। শেষে বসলে, বলার সময় খানিকটা বাড়তি ঝোঁক পড়তে পারে, এটুকুই-যা পার্থক্য। অর্থাৎ বাড়তি ঝোঁক পড়লেও অর্থ পালটে যায় না কিংবা বানান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। ‘কী’-ও বাক্যের মাঝখানে বা শেষে যেখানেই ব্যবহৃত হোক তার অর্থ অবিকৃতই থাকে। যেমন— ‘তুমি কী বলতে চাইছ?’/‘তুমি যা বলতে চাইছ সেটা কী?’ বাক্য দুটিতে ‘কী’ প্রয়োগের উদ্দেশ্য শুধুই প্রশ্ন করা নয়, কোন্ কথা বা কোন্ বিষয়ে বলতে চাওয়া হচ্ছে তা নির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েই প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে।

৪) প্রশ্নবাচক অব্যয় হিসেবে যখন ‘কি’ ব্যবহৃত হয় তখন জবাবে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলতেই চলে। অর্থাৎ যে-বাক্যের জবাব ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ দিয়ে সারা যায় সেখানে ‘কি’ বসবে। আকাদেমি ও সংসদের বানানবিধিতে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা অবশ্যই যুক্তিসংগত। তবে আরো একভাবে প্রশ্নবাচক ‘কি’-কে আমরা শনাক্ত করতে পারি। ‘তুমি কি বিকেলে আসবে?’/‘বইটা আমাকে ফেরত দেবে কি?’ ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলে এইরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়, তাই ‘কি’ লেখা হবে। আমরা কিন্তু ‘কি’ ব্যবহার না-করেও প্রশ্ন দুটো করতে পারি, যার জবাব অবশ্যই ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ হবে। যেমন— ‘তুমি বিকেলে আসবে?’/‘বইটা আমাকে ফেরত দেবে?’ অর্থাৎ বাক্যে ‘কি’ না-থাকা সত্ত্বেও যদি লেখায় প্রশ্নচিহ্ন অথবা মুখে প্রশ্নের ভাবটা থাকে এবং জবাব শুধু ইতিবাচক বা নেতিবাচক হয়, সেসব ক্ষেত্রে আদৌ ‘কী’ লেখা চলে না, নিশ্চিতরূপেই ই-কার দিয়ে ‘কি’ লিখতে হবে।

৫) ‘কি’ আলাদাভাবে, অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে কিংবা হাইফেন দিয়ে লেখা চলে। কিন্তু ‘কী’ সাধারণত আলাদা বসে। অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে— রকম, ভাবে ও জন্য/জন্যে থাকলে। যেমন ‘এরকম’ ‘এভাবে’ ‘সেজন্য/সেজন্যে’ লেখা যায়, তেমনই ‘কীরকম’ কীভাবে’ ‘কীজন্য/কীজন্যে’ লেখা চলে। তবে ইচ্ছে করলে ‘কী রকম’ ‘কী ভাবে’ ‘কী জন্য/কী জন্যে’ আলাদা করেও লিখতেও কোনো বাধা নেই। কদাচিৎ হাইফেনযুক্তও হতে পারে, যথা— ‘কী-বা শোভা!’ কিংবা ‘কী-যে করি!’/‘কী-যে বলি!’ অন্যত্র সর্বদাই ‘কী’-র ব্যবহার আলাদা। উদাহরণ প্রচুর : ‘কী আশ্চর্য!’, ‘তুমি কী মানুষ হে?’, ‘এটা কী ধরনের বই?’, ‘কী ভালো!’, ‘কী সুন্দর গোলাপ!’, ‘কী বলতে চাও?’, ‘কী করবে?’ ‘কী অভাগা ছেলেটা!’ ‘কী ভাবছ?’, ‘কী শুনেছ?’ ‘কী দেখছ?’ ইত্যাদি।

৬) ইতিপূর্বে বলেছি, প্রশ্ন করা ছাড়াও আরো নানাভাবে বাংলায় ‘কি’-র ব্যবহার হয়ে থাকে। কোথায় কোথায় হয় সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

(ক) ‘কি না’/‘কিনা’, ‘না কি’/‘নাকি’। সবগুলোই ই-কার যুক্ত। কোথাও না-এর সঙ্গে জুড়ে, কোথাও আলাদা। প্রয়োগেও পার্থক্য রয়েছে। ‘রমেশ সেখানে যাবে কি না সেটা জেনে নিয়ো।’ এই বাক্যে ‘কি না’ ‘কিংবা না’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যাবে কিংবা যাবে না তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। অনুরূপ আরেকটা বাক্য— ‘তুমি কাজটা করবে কি না সেটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়।’ কিন্তু ‘কিনা’- র প্রয়োগ ভিন্ন— ‘আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, সে কিনা কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল।’ অথবা ‘সে কিনা আমার প্রশ্নটায় কোনো গুরুত্ব দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করল না।’ এখানে খানিকটা আক্ষেপের ভাব রয়েছে। ‘না কি’-র দৃষ্টান্ত— ‘তুমি বিকেলে আসছ তো, না কি আমিই তোমার ওখানে যাব?’ অথবা ‘পড়াশোনা ঠিকমতো চলছে তো, না কি ফাঁকি দিচ্ছ?’ ‘কি না’ তো ‘না কি’- উলটো, সেজন্যে প্রশ্নটাও একটু ঘুরিয়ে করা হচ্ছে। আর ‘নাকি’-র প্রয়োগ— ‘কিশোর নাকি তোমার কাছে আমার নিন্দে করেছে?’/‘সে নাকি ব্যাপারটা আদৌ বুঝতে পারেনি?’ এই ‘নাকি’ অনেকটা সংশয়ের ইঙ্গিতবহ।

(খ) আকাদেমির বানানবিধিতে ''কী রাম কী শ্যাম, দুটোই সমান পাজি!'' এই বাক্যে ঈ-কার যুক্ত 'কী' সুপারিশ করে এটাকে 'বিকল্পাত্মক বিশেষণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কী' রাম ও শ্যামের বিশেষণ কীভাবে হতে পারে? এই বিকল্প কি 'কিংবা'রই রকমফের নয়? যদি বলা হয় 'রাম কিংবা শ্যাম দুজনেই সমান পাজি/ভালো!' অথবা 'রাম ও শ্যাম দুজনেই সমান পাজি/ভালো!' তাহলেও আকাদেমি প্রদত্ত বাক্যের মোটামুটি একই বক্তব্য বজায় থাকে। ফলে 'কি' ব্যবহারেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তা ছাড়া, 'কী' ওই বাক্যে আলাদা কোনো অর্থ প্রকাশ করছে না। সুতরাং এ-জাতীয় বাক্যে 'কী'-র পরিবর্তে 'কি' প্রয়োগ সংগত কি না সেটা যেমন বিবেচনার বিষয়, তেমনই 'কি'-কে বিকল্পাত্মক বিশেষণের পরিবর্তে বিকল্পাত্মক অব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাবটাও বিশেষজ্ঞরা ভেবে দেখতে পারেন।

(গ) আকাদেমি ও সংসদের 'কীসে' ও 'কীসের' বানানও আমাদের মনঃপূত নয়। আমাদের অভিপ্রেত বানান 'কিসে' 'কিসের'। কেন, তা ব্যাখ্যা করছি। 'সে কী বলল' এই বাক্যকে ঘুরিয়ে 'কী সে বলল' লেখা যায়। 'কী' আর 'সে' দুটো আলাদা শব্দ এবং 'কী' এখানে নির্দিষ্ট অর্থ বহন করছে। কিন্তু 'কিসে' একটাই শব্দ, তা থেকে 'কি'-কে আলাদা করতে পারি না, আর না-পারলে 'কী'-র আমদানি কীভাবে সম্ভব? অনুরূপভাবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে...' পঙ্‌ক্তির অংশ থেকেও 'কি'-কে আলাদা করার উপায় নেই, ফলে বানানে 'কী' ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

(ঘ) একটি শব্দের তিন রকম বানান প্রচলিত— এমন-কি/এমনকি/এমনকী। রবীন্দ্ররচনায় আমরা সর্বত্র হাইফেনযুক্ত 'এমন-কি' পাই। সুনীতিকুমার ও মণীন্দ্রকুমার 'এমনকি' লিখতেন। পবিত্র সরকার, পলাশ বরন পাল প্রমুখ ই-কার যুক্ত বানান লেখেন। আকাদেমিও 'এমনকি' সুপরিশ করেছে। কিন্তু সংসদ ও আ.বা.প.-র অনুমোদিত বানান 'এমনকী'। এই শব্দেও 'কী'-র আলাদা কোনো অর্থ নেই। সে এমন কী বলল-যে তুমি তার ওপর রেগে আছ?'— এই বাক্যে 'কী' পৃথক অর্থ প্রকাশ করছে এবং 'এমন'-এর সঙ্গে সেটা কখনোই জুড়ে বসছে না। অর্থাৎ 'এমন কী' আর 'এমনকী' মোটেই এক নয়। তাহলে এক বানান থাকা কি সংগত? অন্যদিকে, যদি বলা হয় যে 'এমন-কি/এমনকি যদুবাবুও আমার বক্তব্য সমর্থন করেছেন', সেক্ষেত্রে 'কি'-র আলাদা অর্থ সন্ধান অর্থহীন, হাইফেনযুক্ত বা হাইফেনহীন পুরো শব্দটা ইংরেজি even-এর সমার্থক।

আসলে এই 'কি'টা বাংলার নিজস্ব এক বাগ্‌ভঙ্গির অন্তর্গত, কথার লব্‌জ হিসেবে ব্যবহৃত। এইরকম আরো কিছু শব্দ রয়েছে— 'আর-কি', 'চাই-কি', 'বই-কি', যেখানে 'কি'-র আলাদা কোনো অর্থ নেই। আর পৃথক অর্থ না-থাকায় ঈ-কার দিয়ে লেখার প্রশ্নটাই অবান্তর। তাই আকাদেমি 'এমনকি'-র পাশাপাশি 'চাই-কি', 'বই-কি' অনুমোদন করেছে, যদিও আ.বা.প.-র বানান 'এমনকী'-র মতোই 'বইকী'। আমাদের বক্তব্য, এইসব শব্দে 'কি' যখন কথার লব্‌জ হিসেবেই আসছে, তখন যে-যুক্তিতে 'চাই-কি' আর

‘বই-কি’ বানানে হাইফেন অনুমোদন করা হয়েছে সেই একই যুক্তিতে ‘এমন-কি’ ও ‘আর-কি’ বানানেও কি হাইফেন বাঞ্ছিত নয়?

এইসূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আ.বা.প.-র বিধিতে যা-ই থাক, প্রায় তিন বছর ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় আর ‘এমনকী’ লেখা হয় না, আমরা ৩৫/৩৬ মাস ধরে প্রত্যহ সেখানে নিয়মিতভাবে ‘এমনকি’ বানান দেখছি। ওই দৈনিক পত্রিকা থেকে ‘এমনকী’ সম্পূর্ণ উধাও, যদিও তাদের পাক্ষিক ‘দেশ’ পত্রিকায় তার পরেও বছর দেড়েক ‘এমনকী’ ছাপা হয়েছে। ইদানীং ‘দেশ’ও ‘এমনকী’ বর্জন করে ‘এমনকি’ গ্রহণ করেছে।

যা-ই হোক, উপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় পরিষ্কার যে বর্তমানে উল্লিখিত বানানগুলিতে গরিষ্ঠাংশ ই-কারের পক্ষপাতী। আপাতত যে-প্রশ্নটা নিয়ে একমত হতে পারলে ভালো হয় সেটা হাইফেন সংক্রান্ত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত এবং আকাদেমির ‘চাই-কি’, ‘বই-কি’ সুপারিশ অনুযায়ী ‘এমন-কি’ ও ‘আর-কি’তেও হাইফেন থাকবে, না কি সবগুলিরই হাইফেনবর্জিত ‘এমনকি’, ‘আরকি’, ‘চাইকি’, ‘বইকি’ বানান রাখা সংগত? এক গোত্রের শব্দ হওয়ায় সব ক-টিতেই আমার পছন্দ হাইফেনযুক্ত বানান।

উচ্চারণের গুরুত্ব

বানান নিয়ে অনেক কথা হলো, এবার উচ্চারণের এলাকায় প্রবেশ করা যাক। এই রচনার শুরুর দিকে আমি বলেছিলাম, গত দুই-আড়াই দশকে বানান নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে সে-তুলনায় উচ্চারণ-সম্পর্কিত আলোচনার দৃষ্টান্ত অনেক কম। হয়তো সে-কারণেই বিশিষ্ট বাচিক শিল্পীর ('বাচিক শিল্পী' কথাটা এখানে আমি ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করছি— গায়ক, অভিনেতা, আবৃত্তিকার, সংবাদ পাঠক/পরিবেশক, ঘোষক, অনুষ্ঠান সঞ্চালক প্রভৃতি সকলকেই বোঝাচ্ছি) মুখে 'দক্ষ' 'পক্ষ' অনায়াসে 'দক্‌খো' 'পক্‌খো' হিসেবে উচ্চারিত হয় (প্রকৃত উচ্চারণ অবিকল্প দ'ক্‌খ' (দোক্‌খো) প'ক্‌খ' (পোক্‌খো) ; একই নাটকে (বা চলচ্চিত্রে বা টিভি-সিরিয়ালে) একই দৃশ্যে 'সংসার' শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে কেউ বলছেন শংশার্ আর অন্য একজন বলছেন শ'ংশার্ (শোংশার্), তাঁরা কেউই কিন্তু 'সংঘাত' 'সংরাগ' 'সংলাপ' 'সংবাদ' প্রভৃতি শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণে ওইরকম ও-কার প্রয়োগ করেন না। অর্থাৎ বাচিক শিল্পীদের মাধ্যমেও ভুল উচ্চারণ বেশ ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ আচার্য সুনীতিকুমার আজ থেকে তেষট্টি বছর আগেই বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর 'বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'শিক্ষক' পত্রিকার ১৩৬৬ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ওই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার লিখেছিলেন : ''সেদিন ক'ল্‌কাতার সাহিত্যিকদের বিখ্যাত মিলন-সভা 'রবিবাসর'-এর এক অধিবেশনে, আজকাল বাঙলা উচ্চারণ নিয়ে যে দুর্দশা দেখা দিয়েছে, সে কথা নিয়ে একটু আলোচনা হ'য়েছিল— তাতে আমাকে আহ্বান করা হয়। 'রবিবাসর'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেন— আজকাল বাঙলা যে ভাবে পড়া হয় বা বাঙলায় যে ভাবে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাতে পাঠক বা বক্তা এই ভাষার যে একটা স্বকীয় ভদ্র উচ্চারণ-রীতি আছে, সে বিষয়ে কিছু মেনে চলেন না।... তিনি কতকগুলি উদাহরণ দেখালেন আর এই আক্ষেপ ক'র্‌লেন যে এটা মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার-ই পরিচায়ক।...

''এ বিষয়ে আমাকে কিছু ব'ল্‌তে অনুরোধ করা হয়। আমি বলি, আজকাল বড়ো দুঃখের বিষয় যে অনেক ইস্কুলেই মাস্টার-মহাশয়েরা বাঙলা উচ্চারণ বিষয়ে ছেলেদের কোনো নির্দেশ দেন না।...

''এই আলোচনায় আরও দুই-একজন যোগ দিয়েছিলেন। কেবল একটি সাহিত্যিক-মণ্ডলীর ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে এটি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আমাদের শুদ্ধ বাঙলা শিক্ষাতেও এটি আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। যেমন orthography বা 'শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস' লিখিত ভাষাকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য অপরিহার্য্য ব'লে বিবেচিত হয়, তেমনি ortho-epy বা 'শুদ্ধ উচ্চারণ' সে ভাষাতে সংলাপ-শিক্ষার একটা অনুরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত।...

‘‘...প্রত্যেক বাঙলা ব্যাকরণে বাঙলা উচ্চারণের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেখানো উচিত ; আর এ বিষয়ে প্রধান কর্তব্য হ'চ্ছে বাঙলার শিক্ষক মহাশয়দের। তাঁরা কতটুকু ভালোবাসা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে মাতৃভাষার চর্চা করেন, তার উপর নির্ভর করে তাঁরা ছেলেদের কী শেখান না শেখান।” (‘বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে’ গ্রন্থের পৃ. ৭৬-৮০)

সুনীতিকুমার যখন এসব কথা লিখেছিলেন তার পর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কিন্তু উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন কতটা হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। বাংলা যাঁরা পড়ান কিংবা বাচিক শিল্পীদের যাঁরা শেখান তাঁরা নিজ-নিজ বিষয়ের বাইরে উচ্চারণ শেখানোর ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী কি না সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে চারদিকে প্রচুর ভুল উচ্চারণ শুনে। আবার, এমনও হতে পারে যে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের নির্দেশ পালন করেন না। তা ছাড়া, বানানের মতোই কিছু কিছু উচ্চারণেও বিকল্প প্রচলিত। বিশেষজ্ঞরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলে আমরা উপকৃত হতে পারি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা কম বলেই মনে হয়। আগামীদিনে সচেতনতা বাড়বে এই আশা নিয়ে উচ্চারণের নিয়মগুলি সম্বন্ধে এই রচনায় কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে, এটাও মনে রাখতে হচ্ছে যে উচ্চারণ শুনিয়ে যেভাবে শেখানো যায় তা লিখে অনেক ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। সাধারণভাবে বর্ণগুলির উচ্চারণ আমরা শৈশবে কথা বলতে শেখার সময় বড়দের মুখে শুনে-শুনে বুঝে যাই। কিন্তু বড়দের কথার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও ছোটদের রসনায় সঞ্চারিত হয়। তাই ‘সামবাজারের সসিবাবু’ (শ্যামবাজারের শশীবাবু) যেমন অনায়াসে বলি, তেমনই ‘পোত্যেক’ (প্রত্যেক), ‘পোথম’ (প্রথম) ‘পোভিতি’ (প্রভৃতি) আমাদের অভ্যাসের মধ্যে এসে যায়। সবচেয়ে বেশি মুশকিল ই-কার যুক্ত র-ফলা আর ঋ-কারের উচ্চারণ-পার্থক্য লিখে বোঝানো। ‘প্রিয়’-র ‘প্রি’ আর ‘পৃথক’-এর ‘পৃ’-এর উচ্চারণ-যে আলাদা, ‘ব্রিটেন’-এর ‘ব্রি’ আর ‘বৃদ্ধ’-র ‘বৃ’-এর উচ্চারণে-যে পার্থক্য রয়েছে, ‘বিক্রীত’-র ‘ক্রী’ আর ‘বিকৃত’-র ‘কৃ’ যে এক নয় তা কি লিখে ঠিকমতো বোঝানো যায়? উচ্চারণ-বিশেষজ্ঞের মুখে শুনে অনুশীলনের দ্বারা পার্থক্যটা বোঝা ও আয়ত্ত করা সম্ভব। আমার পরিকল্পিত বানান ও উচ্চারণের অভিধানের সঙ্গে তাই এমন একটি ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করছি, যাতে সেটা প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ শুনে শেখার সহায়ক হয়।

আমাদের প্রচলিত বানান এবং সেইসব শব্দের প্রচলিত উচ্চারণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। তার একটা কারণ, বাঙালির উচ্চারণ-প্রবণতার বিশেষ কিছু লক্ষণ আর দ্বিতীয় কারণ, সম্পূর্ণ উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান লিখতে গেলে বহু শব্দকেই অতিরিক্ত স্বরচিহ্নের বোঝা বইতে হয়। তার ফলে অসংখ্য শব্দের পরিচিত চেহারা যেমন পালটে যায়, তেমনই একালে বাহুল্য বর্জনের যে-সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করেছেন তারও অমর্যাদা ঘটে। তা ছাড়া, একসময়ে যুক্তাক্ষর-বর্জিত বানান চালাতে গিয়ে একাংশ পত্রপত্রিকা-যে কী ধরনের হোঁচট খেয়েছিল সে-বৃত্তান্তও অনেকেরই

জানা আছে। সে-কারণে গত দুই দশকের আলোচনায় অল্প কিছু যুক্তিসংগত পরিবর্তনকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবং সেটাও করা হয়েছে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। এই আলোচনায় ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কিছু কিছু প্রস্তাব সচেতন মহলের স্বীকৃতি পায়নি। উচ্চারণের ব্যাপারেও তেমনই কিছুটা সমঝোতা করেই এগোতে হবে।

উচ্চারণের নিয়মগুলি এরপর আমাদের আলোচনায় আসবে। তার আগে বাঙালির উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। স্বরচিহ্নের ব্যবহার না-থাকা সত্ত্বেও বহু বাংলা বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ আমাদের বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গির অন্তর্গত আর সেটা শব্দের প্রথম বর্ণে, মাঝখানের বর্ণে কিংবা শেষ বর্ণেও ঘটতে পারে। এই স্বরান্ত উচ্চারণ কিন্তু সর্বত্র 'অ' নয়, অনেক ক্ষেত্রেই 'ও'-এর কাছাকাছি, যার হ্রস্ব-ও নাম দেওয়া হয়েছে। 'প্রধানত' শব্দটার উচ্চারণ লক্ষ করা যাক। এখানে 'প্র' 'ন' ও 'ত' এই তিনটি বর্ণে কোনো স্বরচিহ্ন যুক্ত হয়নি, অথচ উচ্চারণ স্বরান্ত। তবে প্রথম ও শেষ বর্ণের অর্থাৎ 'প্র' ও 'ত'-এর উচ্চারণে রয়েছে হ্রস্ব-ও আর মাঝখানের 'ন'-এ নির্ভেজাল 'অ'। এবং এটা ঘটছে কিছু নিয়ম মেনে। নিয়মগুলি আলোচনার সময়ে আমরা দেখব, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমটাই ঘটছে, অর্থাৎ যেখানে শব্দের আদি ও অন্ত্য স্বরচিহ্নহীন বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও সেখানে মাঝখানের বর্ণের উচ্চারণ 'অ'। তবে মাঝখানের বর্ণের পরে যদি ই-কার বা উ-কার থাকে তাহলে সেটাও হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয়। যেমন হচ্ছে 'প্রণতি' 'প্রগতি' শব্দে, 'প্র' ছাড়াও 'ণ' ও 'গ' বর্ণ দুটির উচ্চারণে হ্রস্ব-ও রয়েছে।

এ-ব্যাপারে নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পূর্বে অন্য একটা সমস্যার বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, যেখানে শব্দের আদি স্বরচিহ্ন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও পদভেদে উচ্চারণ পালটে যাচ্ছে আর সেটা ঘটছে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনের সূত্রে। সাধারণভাবে আমরা ক্রিয়াপদগুলোর বানান ও উচ্চারণ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। অথচ একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে ওই দুটো বিষয়েও নানারকম জটিলতা রয়েছে। যদিও কিছু নিয়ম মেনেই সেসব ঘটছে, তবু প্রচলিত পদ্ধতির বানানে সবসময় অভিপ্রেত উচ্চারণের প্রতিফলন ঘটে না। আবার, প্রচলিত বানানের ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করলে লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থ হয়তো ধরা না-দিতেও পারে। সংশয় দেখা দিতে পারে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াপদটি সমাপিকা, না অসমাপিকা। গদ্যে অনেক সময় বাক্যগঠন থেকে তা বোঝা গেলেও কবিতায় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমস্যাটা প্রধানত শব্দের আদ্য এ-কার নিয়ে।

'দেখে' 'ঠেকে' 'মেলে' প্রভৃতি শব্দের সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বানানে সাধারণত পার্থক্য রাখা হয় না, অথচ উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। ওইসব শব্দের উচ্চারণ শুনেই আমরা বুঝতে পারি কোন্‌টা সমাপিকা আর কোন্‌টা অসমাপিকা, তার ফলে অর্থটাও পরিষ্কার হয়। কিন্তু একই বানানে ক্রিয়ার দুটো রূপই প্রকাশ করলে সঠিক অর্থ কি সর্বদা পাঠক বা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে? 'সে হাত মুঠো করে আস্ফালন করে'—

এই বাক্যের প্রথম 'করে'-যে অসমাপিকা (যার উচ্চারণ ক'রে বা কোরে) আর শেষেরটা সমাপিকা (যার প্রথম বর্ণের উচ্চারণ অ-কারান্ত) তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যখন লেখা হয়— 'মন জড়তায় ঠেকে নিখিলেরে জীর্ণ দেখে' তখন দুটো ক্রিয়াপদের মধ্যে কোন্‌টা অসমাপিকা আর কোন্‌টা সমাপিকা তা একইরকম এ-কার দিয়ে লিখলে পাঠক কীভাবে বুঝবেন, আবৃত্তিশিল্পীই-বা কবির বক্তব্য সঠিকভাবে শ্রোতাকে বোঝাবেন? বলা বাহুল্য, ঠেকে ও দেখে শব্দের আদ্য এ-কার অভিন্ন হলে উপরের পঙ্‌ক্তিটির দুরকম অর্থ হতে পারে। ঠেকে অসমাপিকা আর দেখে সমাপিকা হলে বাক্যটির যে-অর্থ হয় তার ঠিক বিপরীত অর্থ দাঁড়াবে ঠেকে সমাপিকা আর দেখে অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ধরলে। এই সমস্যা থেকে পাঠক তথা শ্রোতাকে মুক্তি দেবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ শব্দের আদিতে দুরকম এ-কার ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর কবিতায় 'ঠেকে' মাত্রাহীন এ-কার যুক্ত, অর্থাৎ অসমাপিকা এবং 'দেখে' মাত্রাযুক্ত, অর্থাৎ সমাপিকা। তবে মাঝখানের এ-কার তো সর্বদা মাত্রাযুক্ত, তাই এই পদ্ধতিতে ওইরকম শব্দের অ্যা উচ্চারণ বোঝানো যায় না। সে-কারণে এই লেখায় ইতিমধ্যেই আমি জানিয়েছি যে কোনো শব্দের মধ্যবর্তী এ-কারের অ্যা উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে প্রয়োজন হলে মাত্রাযুক্ত এ-কারের পেট কেটে 'ে' ব্যবহার করছি। একইভাবে আদি এ-কারের অ্যা উচ্চারণ দেখানোর জন্যেও 'ে' ব্যবহার করছি। তবে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, শব্দের আদি এ-কার অভিন্ন হলে বহু ক্ষেত্রেই অর্থবোধে যেমন অসুবিধে হয় ঠিক তেমনটা মাঝখানের এ-কারের বেলায় ঘটে না। অসুবিধেটা বিশেষ করে দেখা দেয় আদি এ-কারের অ্যা উচ্চারণযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রেই। কীভাবে? একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

দেখা খেলা ফেলা বেলা (যেমন রুটি বেলা) মেলা (যেমন চোখ মেলা) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ 'দেখা' 'খেলা' 'ফেলা' 'বেলা' 'মেলা'। বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় লেখা হয় দেখো খেলো ফেলো বেলো মেলো, যেগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে 'দেখো' 'খেলো' 'ফেলো' 'বেলো' 'মেলো'। (কেউ-কেউ এ-কারের বক্র উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে 'দ্যাখা' 'দ্যাখে' 'দ্যাখো' প্রভৃতি বানান লেখেন, কিন্তু এ-জাতীয় অন্যান্য শব্দে অনুরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল বললেই চলে।) প্রচলিত বানান অনুযায়ী ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় শব্দ পাঁচটি দেখো খেলো ফেলো বেলো মেলো হিসেবেই লেখা উচিত, কারণ 'দেখিয়ো' 'খেলিয়ো' 'ফেলিয়ো' 'বেলিয়ো' 'মেলিয়ো' শব্দগুলির চলিত রূপের আদ্য এ-কারের উচ্চারণে 'এ' রয়েছে, 'অ্যা' নেই। সুতরাং বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে 'দেখো' 'খেলো' 'ফেলো' 'বেলো' 'মেলো' কিংবা আমার প্রস্তাবিত 'দেখো' 'খেলো' 'ফেলো' 'বেলো' 'মেলো' না-লিখলে ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার সঙ্গে কোনো পার্থক্য বানানে বজায় রাখা যাবে কি? অর্থাৎ শুধু সমাপিকা-অসমাপিকা বোঝার সমস্যা নয়, একইরকম এ-কার দিয়ে অভিন্ন বানান রাখলে অনুজ্ঞার ক্ষেত্রেও সেটা বর্তমানে পালনীয়, না ভবিষ্যতে পালনীয় সে-বিষয়ে সংশয়ের সুযোগ থেকে যায়।

উপরের শব্দগুলো সর্বত্র এ-কার দিয়ে লেখা হলেও উচ্চারণে পার্থক্য ঘটছে পক্ষ-বা ব্যক্তি-ভেদে এবং ক্রিয়ার কাল অনুযায়ী। এখানে একটা স্পষ্টীকরণ দিয়ে রাখা দরকার। ইংরেজিতে যাকে 'Person' বলে (যেমন 1st person, 2nd person, 3rd person), বাংলায় তা সংস্কৃতের অনুকরণে হয়েছে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। কিন্তু বাংলায় কর্তার সর্বনাম মাত্র তিনটে নয়, তার বেশি। পবিত্র সরকার তাঁর 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' এবং 'পকেট বাংলা ব্যাকরণ'-এ পাঁচটার কথা বলেছেন এবং Person-এর নামকরণ করেছেন 'পক্ষ'। লিখেছেন— আমি পক্ষ, তুমি পক্ষ, তুই পক্ষ, সে পক্ষ আর মানী পক্ষ। সর্বনামগুলো যেহেতু নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেহেতু 'পুরুষ' নামকরণ আমারও অপছন্দ। পক্ষ বা ব্যক্তি বলাই ভালো মনে হয়। আর বাংলায় সর্বনাম আসলে ছ-টা হলেও (আমি, আপনি, তুমি, তুই, সে, তিনি) এক হিসেবে পক্ষ পাঁচটা। 'আপনি' আর 'তিনি'-র বর্তমান কালের (সাধারণ, ঘটমান ও পুরাঘটিত তিন ক্ষেত্রেই) ক্রিয়ারূপ অভিন্ন। যথা, আপনি করেন, তিনি করেন। অনুরূপভাবে, আপনি করছেন, তিনি করছেন, আপনি করেছেন, তিনি করেছেন। অবশ্য 'তুমি' 'তুই'-এর মতো 'আপনি'-তেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার ব্যবহার আছে, 'আমি' 'সে' 'তিনি' পক্ষে নেই। তবে 'তিনি'-তে সরাসরি অনুজ্ঞা না-থাকলেও 'আপনি'-র ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের যে-রূপ ব্যবহার করা হয় সেই একই রূপ 'তিনি'-র ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয় একটু ঘুরিয়ে বললে। যেমন— 'আপনি কাজটা করুন' আর 'আমি চাই যে তিনি কাজটা করুন' 'আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে কথাটা বলুন' আর 'তিনি স্পষ্টভাবে কথাটা বলুন এটাই আমার কাম্য' প্রভৃতি। অনুরূপ অন্যান্য বাক্যেও ক্রিয়ার রূপ একই থাকছে। অর্থাৎ সর্বনাম ছ-টা হলেও পক্ষ পাঁচটা ধরলেই চলে।

এবার এ-কার যুক্ত অথচ 'অ্যা' উচ্চারণ সূচক ক্রিয়াপদগুলির আদ্য উচ্চারণ কীভাবে পালটে যাচ্ছে সেদিকে নজর দেওয়া যাক। প্রথমে 'দেখা' শব্দটা নিচ্ছি। এই শব্দের বর্তমান কালের তিনটি রূপ যথাক্রমে—

আমি পক্ষে : দেখি, দেখছি, দেখেছি। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত 'এ' উচ্চারণ।

তুমি পক্ষে : দ্যেখ, দেখছ, দেখেছ। শুধু প্রথমটায় বক্র-এ বা 'অ্যা' উচ্চারণ।

তুই পক্ষে : দেখিস, দেখছিস, দেখেছিস। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত 'এ' উচ্চারণ।

সে পক্ষে : দ্যেখে, দেখছে, দেখেছে। শুধু প্রথমটায় বক্র-এ বা 'অ্যা' উচ্চারণ।

মানী পক্ষে : দ্যেখেন, দেখছেন, দেখেছেন। শুধু প্রথমটায় বক্র-এ বা 'অ্যা' উচ্চারণ।

আর বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়—

মানী পক্ষে : দেখুন, তুমি পক্ষে : দ্যেখো, তুই পক্ষে : দ্যেখ্। শুধু প্রথমটায় অবিকৃত 'এ', বাকি দুটোয় বক্র-এ বা 'অ্যা' উচ্চারণ।

ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ চারটে : সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত ও নিত্যবৃত্ত। 'দেখা' শব্দে সেগুলোর রূপ যথাক্রমে—

আমি পক্ষে : দেখলাম, দেখছিলাম, দেখেছিলাম, দেখতাম। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত

‘এ’ উচ্চারণ।

তুমি পক্ষে : দেখলে, দেখছিলে, দেখেছিলে, দেখতে। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

তুই পক্ষে : দেখলি, দেখছিলি, দেখেছিলি, দেখতি। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

সে পক্ষে : দেখল, দেখছিল, দেখেছিল, দেখত। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

মানী পক্ষে : দেখলেন, দেখছিলেন, দেখেছিলেন, দেখতেন। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ তিনটে : সাধারণ, ঘটমান ও পুরাঘটিত। ‘দেখা’ শব্দে সেগুলোর রূপ যথাক্রমে—

আমি পক্ষে : দেখব, দেখতে থাকব, দেখে থাকব। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

তুমি পক্ষে : দেখবে, দেখতে থাকবে, দেখে থাকবে। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

তুই পক্ষে : দেখবি, দেখতে থাকবি, দেখে থাকবি। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

সে পক্ষে : দেখবে, দেখতে থাকবে, দেখে থাকবে। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

মানী পক্ষে : দেখবেন, দেখতে থাকবেন, দেখে থাকবেন। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

আর ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায়—

মানী পক্ষে : দেখবেন, তুমি পক্ষে : দেখো, তুই পক্ষে : দেখিস। সর্বত্রই এ-কারের অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ।

একই রকম ঘটছে বক্র-এ উচ্চারণ যুক্ত বাকি চারটে শব্দ খেলা ফেলা বেলা মেলা-র ক্ষেত্রেও। অনুজ্ঞা-সহ বর্তমান কালের যে-কয়েকটি ক্রিয়াপদে ‘দেখা’-য় ‘অ্যা’ উচ্চারিত হয়, বাকি চারটে শব্দের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটে এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে (অনুজ্ঞা-সহ) সর্বত্র অবিকৃত ‘এ’ উচ্চারণ। মোট পাঁচটি ক্ষেত্রে (দ্যাখ, দ্যাখে, দ্যাখেন, দ্যাখো ও দ্যাখ্) প্রথম এ-কারের অ্যা উচ্চারণ অবিকৃত থাকছে। একই ব্যাপার ঘটছে খেলা (খ্যাল, খ্যালে, খ্যালেন, খ্যালো ও খ্যাল্), ফেলা (ফ্যাল, ফ্যালে, ফ্যালেন, ফ্যালো ও ফ্যাল্), বেলা (ব্যাল, ব্যালে, ব্যালেন, ব্যালো ও ব্যাল্), মেলা (ম্যাল, ম্যালে, ম্যালেন, ম্যালো ও ম্যাল্) প্রভৃতির বেলাতেও। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত পাঁচটা ক্রিয়াপদকে আমরা শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছি, অ্যা উচ্চারণ যুক্ত অন্যান্য ক্রিয়াপদেও একই নিয়ম ক্রিয়াশীল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উক্ত ক্রিয়াপদগুলির সমাপিকা ও অসমাপিকার উচ্চারণ যেমন

আলাদা, তেমনই তুমি ও তুই পক্ষেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে পালনীয় অনুজ্ঞায় পার্থক্য রয়েছে। একইরকম এ-কার দিয়ে লিখলে, বিশেষ করে কবিতায়, অনেক সময়েই অর্থবোধে অসুবিধে হতে পারে। আমার মনে হয়, এসব ক্ষেত্রে দুরকম এ-কার ব্যবহারই একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান। অর্থাৎ কবিতায় অর্থের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে কবিরা করে বলে ধরে প্রভৃতি শব্দের অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান যেমন ক'রে ব'লে ধ'রে লেখেন বা লিখবেন, তেমনই আদি এ-কারের উচ্চারণ পদভেদে যেখানে অ্যা হয়ে যাচ্ছে সেখানে পেটকাটা এ-কার (৻) অথবা মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহার করুন। তার ফলে বানান পালটানোর দরকার হবে না আর ভুল উচ্চারণ ও সেইসূত্রে ভুল অর্থ করার সম্ভাবনারও ইতি ঘটবে। আমার বিনীত নিবেদন, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব গৃহীত হোক।

চলিত ভাষায় যেসব শব্দের আদি এ-কারের উচ্চারণ 'এ' সেখানে অবশ্য এই সমস্যা নেই। 'লেখা' (লিখন শব্দজাত) 'গেলা' (গিলন শব্দজাত) 'মেলা' (মিলন শব্দজাত) 'মেশা' (মিশ্রণ শব্দজাত) প্রভৃতি শব্দের আদ্য এ-কারের উচ্চারণ অবিকৃত 'এ'। আদি এ-কারের 'অ্যা' উচ্চারণযুক্ত 'খেলা' 'ঠেলা' 'দেখা' 'ফেলা' 'মেলা' (উন্মীলন অর্থে) প্রভৃতি যেমন সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় অর্থেই সাধারণত 'খেলে' 'ঠেলে' 'দেখে' 'ফেলে' 'মেলে' প্রভৃতি অভিন্ন বানানে লেখা হয়, যদিও উচ্চারণ আলাদা, 'লেখা' 'গেলা' 'মেলা' (মিলন অর্থে) 'মেশা'-র ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটছে না। ওইসব শব্দের সমাপিকা ক্রিয়ারূপের বানান 'লেখে' 'গেলে' 'মেলে' 'মেশে' আর অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান যথাক্রমে 'লিখে' 'গিলে' 'মিলে' 'মিশে'। অনুরূপভাবে, শব্দগুলির বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞা এবং ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার বানানও আলাদা— বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় 'লেখো' 'গেলো' 'মেলো' 'মেশো' আর ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার বানান 'লিখো' 'গিলো' মিলো' 'মিশো'। পদভেদেও এইসব শব্দের এ-কারের উচ্চারণ পালটে যাচ্ছে না। তা ছাড়া, চলিত ভাষার শব্দে প্রথম বর্ণের পরে ই বা উ থাকলেও মূল শব্দগুলোর (লিখন, গিলন, মিলন, মিশ্রণ) পূর্ব ই-উচ্চারণ ফিরে আসছে। যেমন— লিখি লিখুন, গিলি গিলুন, মিলি মিলুন, মিশি মিশুন প্রভৃতি।

ইতিপূর্বে বলেছি, প্রথম বর্ণে এ-কারবিহীন কিছু শব্দের (যেমন, করে ধরে বলে) অসমাপিকা ক্রিয়া যদি বানানে পরিবর্তন না-ঘটিয়ে আদৌ বোঝানো না-যায়, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, তাহলে ঊর্ধ্বকমা দিয়ে ক'রে ধ'রে ব'লে (যেগুলোর প্রথম বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব ও-কারান্ত অর্থাৎ কোরে ধোরে বোলে) লিখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তবে বেশকিছু ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তনের সূত্রে বানানেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন— ওঠা ওড়া গোনা তোলা ভোলা প্রভৃতি। অবশ্য, পরিবর্তনগুলি একটা নিয়মের অধীন। আদ্যক্ষরে ও বা ও-কার যুক্ত এইসব শব্দের বানান সমাপিকা ক্রিয়ায় ওঠে ওড়ে গোনে তোলে ভোলে, অর্থাৎ ও বা ও-কার অবিকৃত থাকছে, কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ায় উঠে উড়ে গুনে তুলে ভুলে। আবার, বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় মূল ক্রিয়ার ও বা ও-কার ফিরে এসে বানান দাঁড়াচ্ছে ওঠো ওড়ো গোনো তোলো ভোলো, কিন্তু ভবিষ্যৎকালে পালনীয়

অনুজ্ঞায় বানান উঠো উড়ো গুনো তুলো ভুলো, অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার মতোই আদ্যক্ষরের ও বা ও-কার উ বা উ-কার হয়ে গেল। এ-জাতীয় ক্রিয়াপদে কালের পরিবর্তনের সূত্রে বানান ও উচ্চারণ দুই-ই পালটে যাচ্ছে, ফলে বানান ও উচ্চারণ ভুলের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শুধু এটা মনে রাখলেই হয় যে সাধারণ বর্তমান কালে সমাপিকা ক্রিয়ায় প্রথম বর্ণ ও বা ও-কার যুক্ত আর অসমাপিকা ক্রিয়ায় উ বা উ-কার যুক্ত এবং অনুজ্ঞায় বর্তমান কালে ও বা ও-কার আর ভবিষ্যৎ কালে উ বা উ-কার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আসল সমস্যা শব্দের আদিতে ‘অ্যা’ উচ্চারণযুক্ত ক্রিয়াপদগুলি নিয়ে। সেখানে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) কিংবা পেটকাটা এ-কার (৻) ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বলেই মনে হয়। অন্যদিকে, শব্দের মাঝখানের এ-কারের ‘এ’ ও ‘অ্যা’ দুরকম উচ্চারণ থাকলেও সেটা ঘটছে সাধারণত কিছু জোড়া শব্দে। যেমন— ছেলেখেলা ছেলেবেলা হেলাফেলা দেখাদেখি বেলাবেলি খোলামেলা ইত্যাদি। এইসব শব্দে একই বানানে ভিন্ন উচ্চারণের দৃষ্টান্ত নেই, ভুল উচ্চারণও শোনা যায় না বলেই আমার ধারণা। সে-কারণে সাধারণ লেখায় শব্দের মাঝখানের ‘অ্যা’ উচ্চারণযুক্ত এ-কারগুলোর পৃথক রূপ (যেমন ‘৻’) প্রদর্শন জরুরি কি? সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত যদি এই হয় যে মাঝখানের এ-কারের সঠিক ‘অ্যা’ উচ্চারণ নির্দেশের জন্যও সব লেখাতেই ‘৻’ ব্যবহার করা উচিত, তাহলে আমারও সেটা মেনে নিতে আপত্তি নেই। তবে উচ্চারণের অভিধানগুলিতে পার্থক্য অবশ্যই দেখানো দরকার এবং সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ‘ছেলেখ্যালা’ ‘ছেলেব্যালা’ ‘হ্যালাফ্যালা’ ‘দ্যাখাদেখি’ ‘ব্যালাবেলি’ না-লিখে ‘ছেলে ৻খলা ‘ছেলে ৻বলা’ ‘৻হলা ৻ফলা’ ‘৻দখাদেখি’ ‘৻বলাবেলি’ লেখা যেতেই পারে।

আমাদের বর্ণমালায় প্রথমেই রয়েছে অ। বাংলা বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই বর্ণটির এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, ‘অ’-এর কোনো ‘কার’ নেই, বাকি সব ক-টি স্বরবর্ণের ‘কার’ বা পৃথক চিহ্ন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আ বর্ণটিও আসলে অ-এ আ-কার দিয়ে লেখা হয়। তৃতীয়ত, শব্দের শুরুতে যেখানে এ-কার বা এ নেই সেখানকার অ্যা ধ্বনি বোঝানোর জন্যও ‘অ’-এর সঙ্গে দুটো বাড়তি চিহ্ন দিয়ে ‘অ্যা’ বর্ণটির আমদানি করা হয়েছে। চতুর্থত, শব্দ গঠনের সময়ে যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অন্য কোনো স্বরবর্ণের যোজ্য রূপ যুক্ত হচ্ছে না সেখানেও অ রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, কলম শব্দটি। এখানে কোনো স্বরবর্ণ বা তার যোজ্য রূপ অনুপস্থিত। ফলে শব্দটির বানানের বিশ্লেষণ করা হয় এভাবে— ক্+অ ল্+অ ম্+অ। কারণ কোনো ব্যঞ্জনবর্ণই স্বরের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না।

আরো আছে। শব্দে অ-এর অবস্থান অনুযায়ী কোথাও তার উচ্চারণ অবিকৃত অ, কোথাও হ্রস্ব-ও। এই হ্রস্ব-ও উচ্চারণের পিছনে বেশ কয়েকটি নিয়ম কাজ করে। নিয়মগুলি বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির অন্তর্গত, তবে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে লিখিত আকারে সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের অধিকাংশই যথার্থ বলে

পরবর্তী আলোচকগণও মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের গবেষণায় আরো কিছু নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো মোটামুটি পড়েছি। দু-চারটে আমারও নজরে এসেছে। আপনারাও একটু ভেবে দেখলে এমন কয়েকটার সন্ধান পাবেন যা আমার জানা নেই। নিয়মগুলি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

উচ্চারণের কিছু নিয়ম ও ব্যতিক্রম

১. বাংলায় যুক্তবর্ণগুলি শব্দের মধ্যে বা শেষে যেখানেই বসুক, অ ছাড়া অন্য কোনো স্বরচিহ্ন না-থাকলে সবসময় হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয়। উদাহরণ অজস্র পাওয়া যাবে। এখানে কয়েকটা মাত্র পেশ করছি। অঙ্ক (উচ্চারণ অংক'), অঙ্গ (অংগ'), অন্ত (অন্ত'), অন্তরিন (অন্ত'রিন্), অন্ধ (অন্ধ'), আপ্ত (আপ্ত'), আস্ত (আস্ত'), ইন্দ্র (ইন্দ্র'), কণ্ব (কন্ন'), কষ্ট (কশ্ট'), কাণ্ড (কান্ড'), গন্ধ (গন্ধ'), ছন্দ (ছন্দ'), দণ্ড (দন্ড'), দুষ্ট (দুশ্ট'), দুস্থ (দুস্থ'), দ্বন্দ্ব (দন্দ'), নিঃস্ব (নিশ্শ'), নিজস্ব (নিজশ্শ'/ নিজ'শ্শ'), প্রশ্ন (প্রশ্ন'), বহুত্ব (ব'হুত্ত'), ব্যস্ত (ব্যাস্ত'), ভক্ত (ভক্ত'), ভগ্ন (ভগ্ন'), মন্দ (মন্দ', এটা তৎসম শব্দ, যার অর্থ মৃদু, ধীর বা মন্থর, সে-কারণে ছন্দ শব্দের মতোই প্রথম বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত অ, হ্রস্ব-ও নয়), মন্দ (ম'ন্দ', খারাপ অর্থে এই শব্দটি অতৎসম, ম-এর উচ্চারণে তাই হ্রস্ব-ও রয়েছে, অনুরূপভাবে, মন্দমতি-র উচ্চারণ ম'ন্দ'ম'তি), মহত্ত্ব (মহ'ত্ত'), রত্ন (রত্ন'), রন্ধ্র (রন্ধ্র'), লুপ্ত (লুপ্ত') ইত্যাদি।

এখানে কয়েকটা ব্যতিক্রমের কথাও বলা দরকার।

(ক) ব-ফলা যুক্ত শেষ বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হলেও শব্দের মাঝখানে ব-ফলা থাকলে ব-ফলা যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত অ। যেমন— অনুস্বর (অ'নুশ্শর্), অন্বয় (অন্নয়্), ঈশ্বর (ঈশ্শর্), নশ্বর (নশ্শর্), নিঃস্বর (নিশ্শর্), নিস্বন (নিশ্শন্), বিদ্বৎকুল (বিদ্দত্কুল্), বিশ্বস্ত (বিশ্শস্ত'), ভাস্বর (ভাশ্শর্), রজস্বলা (রজ'শ্শলা), শাশ্বত (শাশ্শত')। [এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে— বিদ্বজ্জন শব্দটি। এখানে দ-এর সঙ্গে ব শব্দের মধ্যে থাকলেও হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয় (বিদ্দ'জ্জ'ন্) সম্ভবত পরবর্তী যুক্তবর্ণ জ্জ-এর হ্রস্ব-ও উচ্চারণের প্রভাবে।] কিন্তু পরে ই বা ঈ-কার থাকলে হ্রস্ব-ও আসবে। যেমন— অন্বয়ী (অন্ন'য়ি), অস্বস্তি (অশ্শ'স্তি) ঈশ্বরী (ঈশ্শ'রি), ভাস্বতী (ভাশ্শ'তি), শাশ্বতী (শাশ্শ'তি)। এইসূত্রে মনে রাখা দরকার, উল্লিখিত শব্দগুলিতে ব-এর কোনো উচ্চারণ নেই, তার পরিবর্তে যে-বর্ণের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হয় সেটা দু-বার উচ্চারিত হচ্ছে। আর ব-ফলা যদি শব্দের শুরুতে থাকে তাহলে যে-বর্ণের সঙ্গে ব যুক্ত সেটাই শুধু একবার উচ্চারিত হয়, ব-এর উচ্চারণ সম্পূর্ণ লোপাট। যথা— ত্বরা (তরা), দ্বয় (দয়্), দ্বাদশ (দাদশ্), দ্বাপর (দাপর্), দ্বার (দার্), দ্বারকা (দারকা), দ্বেষ (দেশ্), দ্বৈত (দৈত' বা দ'ই্ত'), ধ্বস্ত (ধস্ত'), স্বত্ব (শত্ত') ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, ব-ফলা যদি শব্দের মধ্য বা শেষ বর্ণে যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে উচ্চারণে যে-বর্ণের সঙ্গে ব যোগ হচ্ছে সেই বর্ণের দ্বিত্ব আসে। মাঝখানে ব-যুক্ত বর্ণে দ্বিত্বের উদাহরণ আমরা

উপরের অনুস্বর, অন্বয়, ঈশ্বর, নশ্বর প্রভৃতি এবং অন্বয়ী, অস্বস্তি, ভাস্বতী, শাশ্বতী প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে দেখিয়েছি। শেষে ব-যুক্ত বর্ণে দ্বিত্বের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ : অশ্ব (অশ্‌শ'), নিঃস্ব (নিশ্‌শ'), নিজস্ব (নিজশ্‌শ'), পরস্ব (পরশ্‌শ'), বিশ্ব (বিশ্‌শ'), রাজস্ব (রাজশ্‌শ') প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, বানানের আলোচনায় যা বলেছিলাম সেটাও আরেকবার মনে করিয়ে দিই। উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত যেসব ব উচ্চারিত হয়, সেগুলি পূর্ব বর্ণের সঙ্গে যুক্ত না-করে আলাদাভাবে লেখাই সংগত। যথা— উদ্‌বাস্তু, উদ্‌বেল, উদ্‌বোধন, উদ্‌ব্যস্ত, সদ্‌বুদ্ধি, সদ্‌ব্যবহার, সদ্‌ব্যয় প্রভৃতি।

(খ) দুস্তর শব্দের উচ্চারণ দুস্‌তর্‌, দুস্‌ত'র্‌ নয়। এখানে ত-এর উচ্চারণ হ্রস্ব-ও না-হয়ে অবিকৃত অ হওয়ার কারণ, তর-এর সঙ্গে দুর্‌ উপসর্গ যোগ। একইভাবে উৎ (উদ্‌) উপসর্গ যুক্ত উত্তপ্ত শব্দের উচ্চারণও উত্‌ত'প্‌ত' নয়, উত্‌তপ্‌ত'। উদ্‌ উপসর্গ যুক্ত উদ্ভট শব্দের 'ভ'-এর উচ্চারণেও হ্রস্ব-ও নেই। সম্‌ উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত অ। যেমন— সম্পদ (শম্‌পদ্‌), সম্বন্ধ (শম্‌বন্‌ধ'), সম্মান (শম্‌মান্‌)। তবে এইসব শব্দেও ম্প, ম্ব, ম্ম-এর পরে ই-কার থাকলে তার প্রভাবে যুক্তবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণে অ-এর হ্রস্ব-ও উচ্চারণ এসে যায়। যেমন— সম্পত্তি (শমপ'ত্‌তি), সম্বন্ধি (শমব'ন্‌ধি), সম্মতি (শমম'তি)। সম্‌-এর ম-এর সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জন যুক্ত না-হলে কী ঘটে সে-ব্যাপারে এরপরে ২(ঘ) নিয়মে আলোকপাত করা হয়েছে।

(গ) হ-এর সঙ্গে অন্য বর্ণ যুক্ত হলে সাধারণত দ্বিতীয় বর্ণটির উচ্চারণ আগে আর হ-এর উচ্চারণ পরে হয়। ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু চারটি শব্দে— হ্লাদ (হ্‌লাদ্‌), হ্লাদন (হ্‌লাদ'ন্‌), হ্লাদিত (হ্‌লাদিত') আর হ্লাদিনী (হ্‌লাদিনি)। কারণ হ্ল এসব ক্ষেত্রে শব্দের শুরুতে রয়েছে। বাকি সব ক্ষেত্রে হ উচ্চারিত হয় তার সঙ্গে যুক্ত বর্ণটির পরে। উদাহরণ প্রচুর— আহ্লাদ (আল্‌হাদ্‌), আহ্লাদি (আল্‌হাদি), আহ্লাদিত (আল্‌হাদিত'), প্রহ্লাদ (প্র'ল্‌হাদ্‌), অপরাহ্ণ (অপ'রান্‌হ'), আহ্নিক (আন্‌হিক্‌), চিহ্ন (চিন্‌হ'), পূর্বাহ্ণ (পুর্‌বান্‌হ'), প্রাহ্ণ (প্রান্‌হ', সায়াহ্ন (শায়ান্‌হ'), মধ্যাহ্ন (ম'ধ্‌ধান্‌হ'), ব্রহ্ম (ব্র'ম্‌হ') আর সেইসঙ্গে ব্রহ্ম যুক্ত অন্য সমস্ত শব্দ, ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হ'ন্‌) আর সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ যুক্ত অন্যান্য শব্দ, হ্রদ (র্‌হদ্‌), হ্রস্ব (র্‌হশ্‌শ')। উল্লেখ্য, শেষ দুটি বর্ণ পরবর্তী ৬ নম্বর নিয়মের অধীন নয়, কারণ র-ফলা এখানে হ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

(ঘ) হ-এর সঙ্গে ব যুক্ত হলে আবার এই দুটি বর্ণের একটিও উচ্চারিত হয় না, বাংলায় তার উচ্চারণ সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে। যথা— আহ্বান (আও্‌ভান্‌), গহ্বর (গও্‌ভর্‌), জিহ্বা (জিও্‌ভা), বিহ্বল (বিও্‌ভল্‌)। সুভাষ ভট্টাচার্য তাঁর 'সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান'-এ এর কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, ''হ-য় ব-ফলার উচ্চারণে হ ধ্বনি খণ্ডিত ও-ধ্বনিতে পরিণত হয়। এবং ব-ধ্বনি ভ-ধ্বনিতে পরিণত হয়।''

(ঙ) হ-য় য-ফলা থাকলে আরো উদ্ভট কাণ্ড ঘটে, উচ্চারণ দাঁড়ায় জ্‌ঝ'। কেন এমন হয় জানা নেই। তবে এটা স্বীকৃত যে ঊহ্য, গ্রাহ্য, দাহ্য, বাহ্য, সহ্য প্রভৃতি শব্দের বাংলা উচ্চারণ যথাক্রমে উজ্‌ঝ', গ্রাজ্‌ঝ', দাজ্‌ঝ', বাজ্‌ঝ', শ'জ্‌ঝ'। লক্ষণীয়, শেষ বর্ণে য-ফলা

থাকায় সব শব্দেরই অন্তিম উচ্চারণে যুক্তবর্ণের মতোই হ্রস্ব-ও আসে।

২. পরে ই (বা ই-কার) ঈ (বা ঈ-কার) উ (বা উ-কার) এবং ঊ (বা ঊ-কার) থাকলে তার আগেকার 'অ' বা অ-ধ্বনি হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয়। যথা— কই (ক'ই), খই, (খ'ই), দই (দ'ই), বই (ব'ই), অতি (অ'তি), অধিক (অ'ধিক্), অপি (অ'পি), অভিঘাত (অ'ভিঘাত্) অভিজ্ঞতা (অ'ভিগ্গঁতা), অরি (অ'রি), কঠিন (ক'ঠিন্), কলি (ক'লি), কলিকাতা (ক'লিকাতা), গতি (গ'তি), গড়িমসি (গ'ড়িম'সি), গরীয়সী (গ'রিয়'শি), ঘড়ি (ঘ'ড়ি), দড়ি (দ'ড়ি), দরিদ্র (দ'রিদ্র'), পরি (প'রি), পরিবর্তন (প'রিবর্ত'ন্), বংশী (ব'ংশি), বড়ি (ব'ড়ি),বধির (ব'ধির্), বরিষ্ঠ (ব'রিশ্ঠ'), বলিহারি (ব'লিহারি), বশিষ্ঠ (ব'শিশ্ঠ'), বশীকরণ (ব'শিকর'ন্), বহির্ভাগ (ব'হির্ভাগ্), ভক্তি (ভ'ক্তি), ভঙ্গি (ভ'ংগি), মরীচিকা (ম'রিচিকা), মসি (ম'শি), শক্তি (শ'ক্তি), সহিত (শ'হিত্), বউ (ব'উ), মউ (ম'উ), অঙ্গুলি (অ'ংগুলি), অঙ্গুরীয় (অ'ংগুরিয়'), অধুনা (অ'ধুনা), অরুণ (অ'রুন্), অরুণোদয় (অ'রুনোদয়্), অরুন্ধতী (অ'রুন্ধ'তি), করুণ বা করুন (ক'রুন্), গরু (গ'রু), চরু (চ'রু), ধরুন (ধ'রুন্), পড়ুন বা পরুন (প'ড়ুন্ বা প'রুন্), বরুণ (ব'রুন্), বসুন (ব'সুন্), ভঙ্গুর (ভ'ংগুর্), মরু (ম'রু), রসুন (র'সুন্), শক্তু (শ'ক্তু), সমুখ (শ'মুখ্) ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, এই ধরনের বানানে (ভিন্নার্থক হলেও) দ্বিতীয় বর্ণে যদি ই-কার বা উ-কার না-থাকে তাহলে আদি অ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হয় না। উচ্চারণ পালটে হ্রস্ব-ও হয়ে যায় ই-কার বা উ-কার যুক্ত হওয়ার পরে। যেমন অত (কিন্তু অ'তি), কল (কিন্তু ক'লি), ক্ষত (কিন্তু খ'তি), গত (কিন্তু গ'তি), দড় (কিন্তু দ'ড়ি), পর (কিন্তু প'রি), বংশ (কিন্তু ব'ংশি), বড় (কিন্তু ব'ড়ি), ভক্ত (কিন্তু ভ'ক্তি), ভঙ্গ (কিন্তু ভ'ংগি), শক্ত (কিন্তু শ'ক্তি, শ'ক্তু), করণ (কিন্তু ক'রুন্), ধরন (কিন্তু ধ'রুন্), পরন (কিন্তু প'রুন্), বরণ (কিন্তু ব'রুন্), বসন (কিন্তু ব'সুন্) ইত্যাদি।

ঋ-কারের উচ্চারণের মধ্যে 'ই' আছে, তাই কর্তা, বক্তা, বক্তব্য প্রভৃতি শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত অ হলেও পরবর্তী বর্ণে ঋ-কার যুক্ত হওয়ায় ওইসব শব্দের পরিবর্তিত রূপের আদ্যক্ষরে হ্রস্ব-ও উচ্চারণ এসে যায়। উদাহরণ— কর্তৃত্ব (ক'র্তৃত্ত'), বক্তৃতা (ব'ক্তৃতা)।

এই নিয়মটির কয়েকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।

(ক) শব্দের আদি 'অ' যদি অভাবের সূচক কিংবা 'না' বোঝায় তাহলে পরে ই-কার, ঈ-কার বা উ-কার, ঊ-কার থাকলেও উক্ত অ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হবে না, অবিকৃত অ থেকে যাবে। যেমন— অখিল, অনিকেত, অনিল, অনিবার, অনিন্দ্য, অবিরাম, অধীর, অনীশ, অনীহা, অসীম, অকুতোভয়, অকূল, অক্ষুণ্ণ, অটুট,অনুত্তম, অনুন্নত, অপুষ্টি, অপূর্ব, অমূল্য, অদৃষ্ট, অদৃশ্য, অনৃত, অমৃত, অরুচি ইত্যাদি। তবে ভুল করে এই নিয়ম থেকে সরে আসার কিছু দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের অনুমোদনও

লাভ করেছে, যদিও কেউ-কেউ দ্বিমত পোষণ করেন। এই সূত্রে 'অতুল' শব্দের উচ্চারণ লক্ষ করা যাক। নিয়ম অনুযায়ী শব্দটির অ বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও অর্থাৎ 'ওতুল' হওয়ার কথা নয়, আমরা 'অতুল ঐশ্বর্য' 'অতুলনীয় সৌন্দর্য'ই বলে থাকি। কিন্তু পরবর্তী উ-কারের প্রভাবে কারো-কারো মুখে ওই শব্দের প্রথম বর্ণের হ্রস্ব-ও উচ্চারণ প্রচলিত হয়েছে। সে-কারণে ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে 'ওতুল' 'ওতুল্য' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে স্থান পেয়েছে, সুনীতিকুমার ও পবিত্র সরকারও ছাড়পত্র দিয়েছেন, সুভাষ ভট্টাচার্যও তাঁর উচ্চারণ অভিধানে বিকল্পে 'ওতুল' রেখেছেন। জামিল চৌধুরীর 'শব্দসংকেত' এবং ঢাকার বাংলা একাডেমির অভিধানে 'ওতুল' নেই, শুধুই 'অতুল'।

উচ্চারণ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনার সময়ে বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক, অভিনেতা, আবৃত্তিশিল্পী তথা নাট্যপরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানালেন, ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রেও সভাসমিতিতে তিনি 'ওতুল' বলতে সংকোচ বোধ করেন, জনসমক্ষে 'অতুল'ই বলে থাকেন। ফলে সংশয় দূর হচ্ছে না। তাহলে কি 'ওতুল'-কে শুধুই ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করব, যেমন করে থাকি ব্যক্তিবিশেষের শ-এ ঈ-কার ও ষ যুক্ত 'আশীষ' আর 'দেবাশীষ' বানানের ব্যাপারে? জ্ঞানেন্দ্রমোহন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ দেব প্রমুখের পুরনো অভিধানগুলিতে 'আশিস' ও 'আশীষ' দুই বানানই পাওয়া যায়, কিন্তু রাজশেখরের 'চলন্তিকা'-সহ সমস্ত আধুনিক অভিধানে শুধু 'আশিস' বানানেরই অস্তিত্ব রয়েছে।

অন্যদিকে, অণিমা ও অতীন্দ্র শব্দ দুটির অ না-বোধক এই ভুল ধারণা থেকে তার অ উচ্চারণ অবিকৃত থাকে অনেকের মুখেই। অথচ দুটি শব্দের গঠনে আমরা পাচ্ছি অণু+ইমা আর অতি+ইন্দ্র। শব্দ দুটির প্রথমাংশে অ-এর পরে যথাক্রমে উ-কার ও ই-কার থাকায় স্বাভাবিক নিয়মে উচ্চারণ হওয়া উচিত 'ওণিমা' ও 'ওতিন্‌দ্র'। পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে অ-এর হ্রস্ব-ও যুক্ত এই উচ্চারণই প্রচলিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, সুভাষ ভট্টাচার্য এবং জামিল চৌধুরীর অভিধানে 'অতীন্দ্র' শব্দ নেই, রয়েছে 'অতীন্দ্রিয়' এবং সর্বত্রই তার অবিকল্প উচ্চারণ হ্রস্ব-ও যুক্ত অর্থাৎ 'ওতিন্‌দ্রিয়''। আরো একটা কথা। অণিমার মতোই লঘিমাও লঘু+ইমা। লঘু শব্দে দ্বিতীয় বর্ণে উ-কার থাকায় প্রথম বর্ণের বাংলা উচ্চারণ হ্রস্ব-ও যুক্ত অর্থাৎ 'ল'ঘু'। লঘিমা বানানেও দ্বিতীয় বর্ণে ই-কার রয়েছে, এই শব্দের উচ্চারণ তাই সব অভিধানেই 'লোঘিমা' (ল'ঘিমা) হিসেবে শোভা পাচ্ছে। তাহলে অণিমা, অতীন্দ্র বা অতীন প্রভৃতি শব্দের অ-এর হ্রস্ব-ও উচ্চারণই কি সংগত নয়?

(খ) দ্বিতীয় ব্যতিক্রম শব্দের শুরুতে সহ অর্থবোধক 'স' থাকলে। ওইরকম শব্দগুলির স-এর পরে ই-কার বা উ-কার থাকলেও উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে না, 'অ'-ই থেকে যায়। অসীম-এর অ-তে যেমন হ্রস্ব-ও নেই, তেমনই নেই 'সসীম'-এর স-তেও। সচিত্র, সঠিক, সপিণ্ড, সবিনয়, সবিরাম, সবিশেষ, সবিস্তার, সবিস্ময়, সজীব, সতীর্থ, সগুণ, সপুত্রক, সধূম, সমূল প্রভৃতি শব্দও এই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

(গ) 'সৎ'-এর সঙ্গে অন্য শব্দের সন্ধি হলেও ই-কার ও উ-কারের প্রভাবে আদি

স-এর অ-উচ্চারণ পালটায় না। এইরকম কয়েকটি শব্দের উদাহরণ— সদিচ্ছা, সন্নিকট, সন্নিধান, সন্নিপাত, সন্নিবদ্ধ, সন্নিবিষ্ট, সন্নিহিত, সদুত্তর, সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সদৃশ (ঋ-কারে ই-এর উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা আগেই বলেছি)। একমাত্র ব্যতিক্রম সন্ন্যাস/সন্ন্যাসী (শ'ন্‌ন্যাশ্/শ'ন্‌ন্যাশি), কারণ পরবর্তী য-ফলার প্রভাবে প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও এসেছে।

(ঘ) 'সম্'-যুক্ত অনেকগুলি শব্দের বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃতানুসারী, অর্থাৎ ই-কার বা উ-কার থাকলেও স-এর অ-উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ : সম্পুট, সম্পূর্ণ, সম্পৃক্ত, সম্বুদ্ধ, সম্মিলন, সম্মিলিত, সম্মিলনী, সম্মুখ। তবে সম্-যুক্ত বেশকিছু শব্দে বাংলা উচ্চারণের নিয়ম ক্রিয়াশীল। যেমন— সঞ্চিত (শ'ন্‌চিত'), সমিতি (শ'মিতি), সমীকরণ (শ'মিকর'ন্), সমীক্ষণ (শ'মিক্‌খন্), সমীচীন (শ'মিচিন্), সমীপ (শ'মিপ্), সমীভবন (শ'মিভব'ন্), সমীর (শ'মির্), সমীহ (শ'মিহ'), সমুচিত (শ'মুচিত্), সমুজ্জ্বল (শ'মুজ্‌জল্), সমুৎপত্তি (শ'মুত্‌প'ত্‌তি), সমুদয় (শ'মুদয়্), সমুদায় (শ'মুদায়্), সমুদিত (শ'মুদিত'), সমুদ্র (শ'মুদ্‌দ্র'), সমূহ (শ'মুহ') প্রভৃতি। 'সং'-এর সঙ্গে যুক্ত শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণ, পরে ই-কার বা উ-কার থাকা সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুগ। যথা— সংবিৎ, সংবিদা, সংবিদিত, সংবিধান, সংবৃত, সংহিতা, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকুচিত, সংকুল, সংকুলান প্রভৃতি। অর্থাৎ এই শব্দগুলির প্রথম বর্ণে হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয় না। বাংলা নিয়মটা একটিমাত্র শব্দে ক্রিয়াশীল, সেটা 'সংগীত' (শ'ংগিত্)। এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

এইসূত্রে সম্-যুক্ত অন্য দুটো শব্দের উচ্চারণে দ্বিমতের বিষয়টা উল্লেখ করা দরকার। পূর্ববর্তী নিয়মটিতে আমরা দেখেছি, ই-কার বা উ-কার পরে থাকলেও সৎ-যুক্ত অন্যান্য শব্দে সংস্কৃতানুসারী উচ্চারণ হলেও পরবর্তী য-ফলার প্রভাবে সন্ন্যাস/সন্ন্যাসী শব্দ দুটির প্রথম বর্ণের বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-ও এসেছে। অনুরূপভাবে, সং-যুক্ত সংখ্যক/সংখ্যা শব্দ দুটির প্রথম বর্ণের উচ্চারণেও কি পরবর্তী য-ফলার প্রভাবে হ্রস্ব-ও (অর্থাৎ শ'ংখ্যক/শ'ংখা) থাকা উচিত নয়? অথচ এ-ব্যাপারে উচ্চারণবিদদের স্পষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ করা গেল। এবং বহু শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলনের কারণে দু-রকম উচ্চারণ স্বীকার করলেও অভিধানগুলিতে এই দুটি শব্দে বিকল্প রাখা হয়নি। আমার কাছে যেসব বাংলা অভিধান রয়েছে তার মধ্যে দুটি উচ্চারণের অভিধান এবং অর্থ সংবলিত অন্য তিনটি অভিধানে উচ্চারণ সম্পর্কিত নির্দেশ রয়েছে। উচ্চারণের অভিধান দুটিতে অবিকল্প 'শংখোক্/শংখা' এবং 'শঙ্‌খক্(-খোক্)/শঙ্‌খা' মুদ্রিত। কিন্তু বাকি তিনটি অভিধানে অবিকল্প হ্রস্ব-ও প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষোক্তদের মতে শব্দ দুটির উচ্চারণ 'শোংখক্/শোংখা'। প্রথমোক্তগণ বিকল্পেও প্রথম বর্ণের হ্রস্ব-ও উচ্চারণ স্বীকার করেননি আর দ্বিতীয়োক্তগণ বিকল্পেও হ্রস্ব-ও বর্জিত (অর্থাৎ 'অ') উচ্চারণ দেখাননি। সংখ্যা-যুক্ত অন্যান্য শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রেও এই দ্বিমত প্রতিফলিত। আবার, যে-দুজন 'শংখোক্/শংখা' এবং 'শঙ্‌খক্(-খোক্)/শঙ্‌খা' উচ্চারণই সংগত মনে করেন তাঁদের একজন

‘অসংখ্য’ শব্দের উচ্চারণ দেখিয়েছেন ‘অশোংখো’ আর অন্যজন ‘অশঙ্খো’, ‘অশোঙ্খো’ দুটোই রেখেছেন। আমরা কোনোটাই এককথায় বাতিল করতে পারছি না অসংখ্য/সংখ্যক/সংখ্যা এবং সংখ্যা-যুক্ত অন্যান্য শব্দের দুরকম উচ্চারণ শোনার কারণেও, তাই বিকল্প রাখাই এ-ব্যাপারে উপযুক্ত সমাধান বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সংখ্যক শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণ অ-কারান্ত হলে ‘খ’-তে হ্রস্ব-ও আসবে, অর্থাৎ উচ্চারণ দাঁড়াবে ‘শংখ’ক্’ (বা ‘শংখোক্’)। আর প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও থাকলে খ-এর উচ্চারণ হবে অ-কারান্ত, অর্থাৎ ‘শ’ংখক্’ (বা ‘শোংখক্’)।

বাংলায় অ বা অ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হওয়ার পিছনে বেশ কয়েকটি নিয়ম ক্রিয়াশীল। ইতিপূর্বে যা বলেছি তার সঙ্গে আরো কয়েকটি নিয়ম নীচে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

৩. পরে য-ফলা থাকলে অ বা অ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হয়ে যায়, সে-কথা এর আগে প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি। সেইসঙ্গে য-ফলা যুক্ত বর্ণটিতে অন্য স্বরচিহ্ন না-থাকলে তার উচ্চারণেও হ্রস্ব-ও আসে। এই নিয়মের অধীন কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ : অত্যন্ত, অত্যধিক, অন্য, গণ্য, গব্য, তথ্য, ধন্য, পণ্য, পথ্য, বন্য, ভব্য, মদ্য, লভ্য, সখ্য, সত্য, সদ্য। এই শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে ওত্ত’ন্ত’ (ওত্তোন্তো), ওত্ত’ধিক্ (ওত্তোধিক্), ওন্ন’ (ওন্নো), গ’ন্ন’ (গোন্নো), গ’ব্ব’ (গোববো), ত’ত্থ’ (তোত্থো), ধ’ন্ন’ (ধোন্নো), প’ন্ন’ (পোন্নো), প’ত্থ’ (পোত্থো), ব’ন্ন’ (বোন্নো), ভ’ব্ব’ (ভোব্বো),ম’দ্দ’ (মোদ্দো), ল’ব্ভ’ (লোব্ভো), শ’ক্খ’ (শোক্খো), শ’ত্ত’ (শোত্তো), শ’দ্দ’ (শোদ্দো)। এইসূত্রে বলা প্রয়োজন, য-ফলার প্রভাবে অ-এর (বা অ-যুক্ত বর্ণের) হ্রস্ব-ও উচ্চারণ হয় শুধু য-ফলা যুক্ত বর্ণে ও তার ঠিক আগের বর্ণে। নীচের শব্দগুলোর প্রথম বর্ণের উচ্চারণে তাই হ্রস্ব-ও আসে না, অবিকৃত অ থাকে— অনন্য, অবশ্য, কর্তব্য, গন্তব্য, জঘন্য, নগণ্য, পর্জন্য। তবে উপরোক্ত নিয়মের জন্য য-ফলা যুক্ত শেষ বর্ণের মতোই তার আগের (তিন অক্ষরের শব্দের ক্ষেত্রে মধ্য) বর্ণের উচ্চারণও স্বরসংগতির প্রভাবে হ্রস্ব-ও হবে। অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে অন’ন্ন’ (অনোন্নো), অব’শ্শ’ (অবোশ্শো), কর্‌ত’ব্ব’ (কর্‌তোব্বো), গন্‌ত’ব্ব’ (গন্‌তোব্বো), জঘ’ন্ন’ (জঘোন্নো), নগ’ন্ন’ (নগোন্নো), পর্‌জ’ন্ন’ (পর্‌জোন্নো)। দন্ত শব্দের উচ্চারণ দন্‌ত’ (দন্‌তো), কিন্তু দন্ত্য শব্দের উচ্চারণে-যে দ-এ হ্রস্ব-ও আসছে, অর্থাৎ উচ্চারণ দ’ন্‌ত’ (দোন্‌তো), সেটাও এই ৩ নম্বর নিয়মের জন্যে।

(ক) অর্ঘ শব্দের অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত, কিন্তু অর্ঘ্য শব্দে য-ফলা থাকায় তার উচ্চারণ ওর্‌ঘ’ (ওর্‌ঘো)। একই কারণে বর্জ্য ও হর্ম্য শব্দ দুটির উচ্চারণ যথাক্রমে ব’র্‌জ’ (বোর্‌জো) ও হ’র্‌ম’ (হোর্‌মো)। তবে, ঠিক কী কারণে জানা নেই, ইদানীং অনেকেই অর্ঘ ও অর্ঘ্য শব্দ দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য রাখছেন না।

(খ) পর্যন্ত শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণে-যে হ্রস্ব-ও রয়েছে অর্থাৎ শব্দটির উচ্চারণ প'র্‌জ'ন্‌ত' (পোর্‌জোন্‌তো) সে-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এর কারণ, এককালে রেফ-যুক্ত বর্ণে দ্বিত্বের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, শব্দটির বানান ছিল 'পর্য্যন্ত'। আচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষও এটা স্বীকার করেছেন— "...য-ফলাযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ 'বিবৃত অ'-কারান্ত হলে তা 'সংবৃত অ'-কারান্ত হয়ে যায়।... 'পর্য্যন্ত' শব্দের 'প'-এ সংবৃত-অ। এই 'প'-কে 'পো' করেছে পরবর্তী বর্ণের য-ফলা।" ('বাংলা বানান' গ্রন্থের দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, বিশে শ্রাবণ ১৪২০, পৃ. ১০৪) করিত বলিত বা করিল বলিল (উচ্চারণ কোরিতো বোলিতো বা কোরিলো বোলিলো) প্রভৃতি শব্দের ই-কার চলিত ভাষায় উঠে যাওয়ার পরেও পূর্ব ই-কারের প্রভাবসূচক হ্রস্ব-ও যুক্ত উচ্চারণ রয়ে গেল করত বলত বা করল বলল (উচ্চারণ ক'র্‌ত' ব'ল্‌ত' বা কোর্‌তো বোল্‌তো, ক'র্‌ল' ব'ল্‌ল' বা কোর্‌লো বোল্‌লো) প্রভৃতি শব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের বানান সংস্কারের সূত্রে রেফের সঙ্গে দ্বিত্বের বিলুপ্তির পরেও তাই 'পর্যন্ত' শব্দের প্রথম বর্ণের হ্রস্ব-ও যুক্ত উচ্চারণ পালটায়নি। একই যুক্তিতে পর্যঙ্ক, পর্যটন, পর্যবসান, পর্যবসিত, পর্যবেক্ষক, পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষিত, পর্যসন, পর্যাকুল, পর্যাপ্ত, পর্যাপ্তি, পর্যাবৃত্ত, পর্যায়, পর্যালোচনা, পর্যালোচিত, পর্যাস, পর্যুদস্ত, মর্যাদা প্রভৃতি শব্দেও প-এর উচ্চারণে অনুরূপ হ্রস্ব-ও থাকা উচিত। অর্থাৎ শব্দগুলির উচ্চারণ হওয়া উচিত যথাক্রমে প'র্‌জ'ংক' বা পোর্‌জোংকো, প'র্‌জ'ট'ন্‌ বা পোর্‌জোটোন্‌, প'র্‌জ'বশান্‌ বা পোর্‌জোবশান্‌, প'র্‌জ'ব'শিত' বা পোর্‌জোবোশিতো, প'র্‌জ'বেক্‌খক্‌ বা পোর্‌জোবেক্‌খক্‌, প'র্‌জ'বেক্‌খন্‌ বা পোর্‌জোবেক্‌খন্‌, প'র্‌জ'বেক্‌খিত' বা পোর্‌জোবেক্‌খিতো, প'র্‌জ'শন্‌ বা পোর্‌জোশন্‌, প'র্‌জাকুল্‌ বা পোর্‌জাকুল্‌, প'র্‌জাপ্‌ত' বা পোর্‌জাপ্‌তো, প'র্‌জাপ্‌তি, ব পোর্‌জাপ্‌তি, প'র্‌জাবৃত্‌ত' বা পোর্‌জাবৃত্‌তো, প'র্‌জায়্‌ বা পোর্‌জায়্‌, প'র্‌জালোচনা বা পোর্‌জালোচনা, প'র্‌জালোচিত' বা পোর্‌জালোচিতো, প'র্‌জাশ্‌ বা পোর্‌জাশ্‌, প'র্‌জুদস্‌ত' বা পোর্‌জুদস্‌তো, ম'র্‌জাদা বা মোর্‌জাদা। অথচ এর মধ্যে কোনো কোনো শব্দে কেউ কেউ যাঁর যেমন ইচ্ছে প'(পো)-এর পরিবর্তে অবিকৃত 'প' উচ্চারণ করছেন। এটা কি উচিত? যদি এমনটা মনে করা যায় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারণও পালটায়, সেক্ষেত্রেও যে-প্রশ্নের সদুত্তরের দাবি আমরা উপেক্ষা করতে পারি না তা হলো, এ-জাতীয় কিছু-কিছু শব্দে নিয়মটা মানলে আর বাকি শব্দগুলিতে নিজের মরজিকে প্রাধান্য দিলে সেটা কি শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায় না? আমাদের তাই মনে হয়, নিয়মটায় অল্প কয়েকটা শব্দের জন্য বিকল্পের ব্যবস্থা না-রেখে ওই ধরনের সমস্ত শব্দে একই উচ্চারণপদ্ধতি অনুসরণ করা সংগত। অর্থাৎ একই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় উপরের সব ক-টি শব্দেই প-এর একইরকম হ্রস্ব-ও উচ্চারণই কি বাঞ্ছিত নয়?

৪. ঋ-কার যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও, কারণ ঋ-কারের উচ্চারণের মধ্যে 'ই' রয়েছে। এইরকম কিছু শব্দ কর্তৃক, কর্তৃপক্ষ, মসৃণ, ভর্তৃ ও ভর্তৃহরি, বক্তৃতা প্রভৃতি;

যেগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে ক'র্তৃক্ (কোর্তৃক্), ক'র্তৃপ'ক্ক' (কোর্তৃপোক্খো), ম'সৃন্ (মোসৃন্), ভ'র্তৃ (ভোর্তৃ) ও ভ'র্তৃহ'রি (ভোর্তৃহোরি), ব'ক্তৃতা (বোক্তৃতা)। রবীন্দ্রনাথ যকৃৎ শব্দটিকেও এই তালিকাভুক্ত করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মতে শব্দটির উচ্চারণ জ'কৃত্ (জোকৃত্)। অন্য দুটি পুরনো অভিধানেও এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। অথচ অন্তত তিনটি আধুনিক অভিধানে এই শব্দের য-এর হ্রস্ব-ও উচ্চারণ স্বীকার করা হয়নি। ফলে মনে হয়, এই শব্দটি হয়তো ব্যতিক্রম হিসেবে মূল নিয়ম থেকে একসময়ে সরে এসেছে এবং একালে 'য'-এর অ-যুক্ত 'জকৃত্' উচ্চারণই মান্যতা পেয়েছে।

৫. ক্ষ-এর আগের অ বা অ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণও হ্রস্ব-ও। যেমন— অক্ষ, অক্ষর, কক্ষ, দক্ষ/দক্ষতা, পক্ষ, বক্ষ, যক্ষ, লক্ষ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ওক্খ' (ওক্খো), ওক্খ'র্ (ওক্খোর্), ক'ক্খ' (কোক্খো), দ'ক্খ'/দ'ক্খ'তা (দোক্খো/ দোক্খোতা),প'ক্খ' (পোক্খো), ব'ক্খ' (বোক্খো), জ'ক্খ'(জোক্খো), ল'ক্খ' (লোক্খো)। এইসূত্রে মনে রাখা দরকার, ক্ষ-এর উচ্চারণেও-যে হ্রস্ব-ও রয়েছে তার কারণ এটি যুক্তবর্ণ (ক+ষ)। যুক্তবর্ণে এই নিয়মটির কথা ইতিপূর্বে ১ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছে। আর ক্ষ-র আগের বর্ণের হ্রস্ব-ও হওয়ার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা : ''ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়।" ('বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের বিশ্বভারতী প্রকাশিত তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯১-এর অন্তর্গত 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ১৯)

৬. শব্দের প্রথম বর্ণে অ ভিন্ন অন্য স্বরচিহ্নহীন র-ফলা থাকলে পরে ই-কার উ-কার থাক বা না-থাক তার উচ্চারণ সর্বদাই হ্রস্ব-ও হবে। উদাহরণ প্রচুর— ক্রম, ক্রমশ, গ্রন্থ, গ্রহ, গ্রহণ, ত্রস্ত, দ্রব, দ্রবণ, দ্রষ্টব্য, ব্রজ, ব্রত, ব্রততী, ভ্রম, ভ্রমণ, প্রকরণ, প্রগতি, প্রণত, প্রতাপ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিভা, প্রতিভূ, প্রতীক্ষা, প্রতীয়মান, প্রত্যন্ত, প্রত্যয়, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাহার, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যুক্তি, প্রভু, প্রভূত, প্রভৃতি, প্রমাণ, প্রমাদ, প্রমিতা, প্রমুখ, প্রমোদ, প্রযত্ন, প্রযোজ্য, প্রয়োজন, প্রলয়, প্রলাপ, প্রশংসা, প্রশস্ত, প্রশান্ত, প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, প্রশ্ন, প্রশ্বাস, প্রশ্রয়, প্রসঙ্গ, প্রসব, প্রসার, প্রসিদ্ধ, প্রসূন, প্রস্তর, প্রস্তাব, প্রস্তুত, প্রস্থ, প্রস্থান, প্রহর, প্রহার, স্রবণ, স্রষ্টা, স্রস্ত, শ্রবণ, শ্রমণ, শ্রমিক ইত্যাদি। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ক্র'ম্ (ক্রোম্), ক্র'ম'শ' (ক্রোমোশো), গ্র'ন্থ' (গ্রোন্থো), গ্র'হ'ন্ (গ্রোহোন্), ত্র'স্ত' (ত্রোস্তো), দ্র'ব' (দ্রোবো), দ্র'ব'ন্ (দ্রোবোন্), দ্র'শ্ট'ব্ব' (দ্রোশ্টোব্বো), ব্র'জ' (ব্রোজো), ব্র'ত' (ব্রোতো), ব্র'ত'তি (ব্রোতোতি), ভ্র'ম্ (ভ্রোম্), ভ্র'ম'ন্ (ভ্রোমোন্), প্র'কর'ন্ (প্রোকরোন্), প্র'গ'তি (প্রোগোতি), প্র'নত' (প্রোনতো), প্র'তাপ্ (প্রোতাপ্), প্র'তিগ্গাঁ (প্রোতিগ্গাঁ), প্র'তিভা (প্রোতিভা), প্র'তিভু (প্রোতিভু), প্র'তিক্খা (প্রোতিক্খা), প্র'তিয়'মান্ (প্রোতিয়োমান্), প্র'ত্তন্ত' (প্রোত্তন্তো), প্র'ত্তয়্ (প্রোত্তয়্), প্র'ত্তাখ্খান্ (প্রোত্তাখ্খান্), প্র'ত্তাহার্ (প্রোত্তাহার্), প্র'ত্তাবর্ত'ন্ (প্রোত্তাবর্তোন্), প্র'ত্তুক্তি (প্রোত্তুক্তি), প্র'ভু (প্রোভু), প্র'ভুত' (প্রোভুতো),

প্র'ভৃতি (প্রোভৃতি), প্র'মান্ (প্রোমান্), প্র'মাদ্ (প্রোমাদ্), প্র'মিতা (প্রোমিতা), প্র'মুখ' (প্রামুখো), প্র'মোদ্ (প্রোমোদ্), প্র'জত্ন' (প্রোজত্নো), প্র'জ'জ্জ' (প্রোজোজ্জো), প্র'য়োজ'ন্ (প্রোয়োজোন্), প্র'লয়্ (প্রোলয়্), প্র'লাপ্ (প্রোলাপ্), প্র'শংশা (প্রোশংশা), প্র'শসত' (প্রোশস্তো), প্র'শান্ত' (প্রোশান্তো), প্র'শাশ'ন্ (প্রোশাশোন্), প্র'শিক্খ'ন্ (প্রোশিক্খোন্), প্র'শ্ন' (প্রোশ্নো), প্র'শ্শাশ্ (প্রোশ্শাশ্), প্র'স্স্রয়্ (প্রোস্স্রয়্), প্র'শঙ্গ' (প্রোশঙ্গো), প্র'শব্ (প্রোশব্), প্র'শার্ (প্রোশার্), প্র'শিদ্ধ' (প্রোশিদ্ধো), প্র'শুন্ (প্রোশুন্), প্র'স্তর্ (প্রোস্তর্), প্র'স্তাব্ (প্রোস্তাব্), প্র'স্তুত্ (প্রোস্তুত্), প্র'স্থ' (প্রোস্থো), প্র'স্থান্ (প্রোস্থান্), প্র'হ'র্ (প্রোহোর্), প্র'হার্ (প্রোহার্), স্র'ব'ন্ (স্রোবোন্), স্র'শ্টা (স্রোশ্টা), স্র'স্ত' (স্রোস্তো), স্র'ব'ন্ (স্রোবোন্), স্র'ম'ন্ (স্রোমোন্), স্র'মিক্ (স্রোমিক্)। কিন্তু পরে য় থাকলে পূর্ববর্তী র-ফলা যুক্ত বর্ণের অ উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা— ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়। আরো দুটি শব্দ এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত, যার কারণ র-ফলা যুক্ত হয়েছে হ-এর সঙ্গে, যেমন— হ্রদ ও হ্রস্ব।

রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০) লিখেছেন যে কয়েকটি শব্দ কোনো নিয়ম মানে না, ''অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায়।'' উদাহরণস্বরূপ তিনি মন্দ, মন্ত্র, মন্ত্রণা, নখ, মঙ্গল, ব্রহ্ম এই ছ-টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। মন্দ শব্দটির বানান এক হলেও আসলে দুটি ভিন্ন অর্থ বহন করে, সেই অনুযায়ী উচ্চারণও আলাদা হয়, তৎসম শব্দের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও নেই, রয়েছে 'খারাপ' অর্থসূচক অতৎসম শব্দটিতে। এ-সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। মন্ত্র ও মন্ত্রণা নিয়ে পরে বলছি। নখ ও মঙ্গল সত্যিই এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না, সুতরাং এ-দুটিকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম-কে রবীন্দ্রনাথ নিয়ম-বহির্ভূত বললেন কেন? এটা তো উপরের র-ফলা যুক্ত বর্ণের হ্রস্ব-ও উচ্চারণেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে-নিয়মে ব্রজ বা ব্রত-র ব্র 'ব্রো' উচ্চারিত হচ্ছে সেই একই নিয়মে ব্রহ্ম-র ব্র-ও 'ব্রো' হয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্র/মন্ত্রণা শব্দের দুরকম উচ্চারণ বিশিষ্ট বাচিক শিল্পীদের মুখেও শোনা যায়। কেউ বলেন 'মন্ত্রো'/'মন্ত্রোনা', অন্য কেউ বলেন 'মোন্ত্রো'/'মোন্ত্রোনা'। তিনটি অভিধানে শুধুই 'মন্ত্রো' স্বীকৃত, একটি অভিধানে শুধু 'মোন্ত্র', এবং অন্য একটি অভিধানে 'মন্ত্রো'/'মন্ত্রোনা' এবং 'মোন্ত্রো'/'মোন্ত্রোনা' দুরকম উচ্চারণকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, 'মন্ত্রো'/'মন্ত্রোনা' তৎসম শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ, বাংলায় 'মন' শব্দের উচ্চারণ ম'ন্ (মোন্), অর্থাৎ প্রথম বর্ণে হ্রস্ব-ও রয়েছে, সুতরাং মন-এর সঙ্গে ত্র যুক্ত শব্দটির ম'ন্ত্র' (মোন্ত্রো) আর সেইসঙ্গে ম'ন্ত্র'না (মোন্ত্রোনা) উচ্চারণই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেও ভাবা যেতে পারে। অনুরূপ তিনটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ স্মরণ করা যাক। শব্দগুলি হলো অন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র। এর কোনোটিতেই প্রথম বর্ণে হ্রস্ব-ও উচ্চারণ নেই। মান্য উচ্চারণ যথাক্রমে অন্ত্র' (অন্ত্রো), তন্ত্র' (তন্ত্রো), জন্ত্র' (জন্ত্রো), শুধু শেষ বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও রয়েছে

যুক্তবর্ণ এবং র-ফলা থাকায়। মন্ত্র শব্দটিও তো একই গোষ্ঠীভুক্ত। তাহলে এখানেও অযথা প্রথম বর্ণে হ্রস্ব-ও আমদানি করার দরকার আছে কি? একইভাবে মন্ত্রক শব্দের উচ্চারণেও ম'ন্ত্র'ক্ (মোন্‌ত্রোক্)-এর পরিবর্তে মন্ত্র'ক্ (মন্‌ত্রোক্)-কে অগ্রাধিকার দিলেই ভালো হয় বলে আমরা ধারণা। তবে বিশিষ্টজনদের মুখে ম'ন্ত্র' (মোন্‌ত্রো) উচ্চারণের বহুল প্রচলন থাকায় এটিকে এবং সেইসঙ্গে ম'ন্ত্র'না (মোন্‌ত্রোনা), ম'ন্ত্র'ক্ (মোন্‌ত্রোক্)-কে পুরোপুরি বাতিল করা মুশকিল। আমি সাধারণত যতদূর সম্ভব বিকল্প বর্জনের পক্ষপাতী, কিন্তু এক্ষেত্রে ম-এর হ্রস্ব-ও যুক্ত উচ্চারণকেও স্বীকার করা ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর নেই।

প্রসঙ্গত এ-কথাও বলা দরকার, তন্ত্র ও যন্ত্র শব্দের সঙ্গে যখন ঈ-কার যুক্ত হয় তখন তার প্রভাবে এই দুটি শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে। অর্থাৎ তন্ত্রী ও যন্ত্রী-র উচ্চারণ যথাক্রমে ত'ন্ত্রি (তোন্‌ত্রি) ও জ'ন্ত্রি (জোন্‌ত্রি)। মন্ত্র থেকে ঈ-কার ও ই-কার যুক্ত মন্ত্রী ও মন্ত্রিত্ব-র ক্ষেত্রেও সেরকমই ঘটছে, শেষোক্ত শব্দ দুটির প্রথম বর্ণের হ্রস্ব-ও যুক্ত উচ্চারণ দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ম'ন্ত্রি (মোন্‌ত্রি) ও ম'ন্ত্রিত্‌ত' (মোন্‌ত্রিত্‌তো)। সুতরাং অন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র শব্দগুলিতে যেমন, ঠিক তেমনই মন্ত্র শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণেও হ্রস্ব-ও আমদানি না-করে অ অবিকৃত রাখলেই কি ভালো হয় না?

ক) শব্দের প্রথমে র-ফলা যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ যেমন হ্রস্ব-ও, তেমনই শব্দের শেষ বর্ণ র-ফলা যুক্ত হলেও তার উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে। ক্ষিপ্র, তীব্র, দীপ্র, নম্র, বিপ্র, ভদ্র প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে খিপ্প্র' (খিপ্‌প্রো), তিব্ব্র' (তিব্‌ব্রো), দিপ্প্র' (দিপ্‌প্রো), নম্ম্র' (নম্‌ম্রো), বিপপ্র' (বিপ্‌প্রো), ভদ্দ্র' (ভদ্‌দ্রো)।

খ) র-ফলার কথা যখন উঠলই তখন আরো একটা ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। সাধারণভাবে বাংলায় যুক্তবর্ণ ছাড়া স-এর উচ্চারণ শ-এর মতো হয়। কিন্তু তার উলটোটা ঘটে যখন শ-এর সঙ্গে র-ফলা বা ঋ-কার যুক্ত হয়, তখন শ-এর উচ্চারণ স হয়ে যায়। নীচের শব্দগুলো লক্ষ করা যাক— শ্রদ্ধা, শ্রবণ, শ্রবণী, শ্রব্য, শ্রম, শ্রমণ, শ্রমিক, শ্রাবণ, শ্রাবণী, শ্রুত, শ্রুতি, শ্রেয়, শ্রেয়সী, শ্রেষ্ঠ, শ্রোতা, শৃগাল, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, শৃঙ্গী, বিশ্রী, শ্রী (এবং শ্রী-যুক্ত সমস্ত শব্দ) প্রভৃতি। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে স্র'দ্‌ধা (স্রোদ্‌ধা), স্র'ব'ন্ (স্রোবোন্), স্র'ব'নি (স্রোবোনি),স্র'ব্ব'(স্রোব্‌বো), স্র'ম্ (স্রোম্), স্র'ম'ন্ (স্রোমোন্), স্র'মিক্ (স্রোমিক্), স্রাব'ন্ (স্রাবোন্), স্রাব'নি (স্রাবোনি),স্রুত' (স্রুতো), স্রুতি, স্রেয়' (স্রেয়ো), স্রেয়'শি (স্রেয়োশি), স্রেশ্‌ঠ' (স্রেশ্‌ঠো), স্রোতা, সৃগাল্, সৃঙ্‌খল্, সৃঙ্‌গ` (সৃঙ্‌গো), সৃঙ্‌গি, বিস্‌স্রি, স্রি।

গ) এবার যে-নিয়মটার কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে র-ফলার সম্পর্ক নেই, তবে শ-এ উচ্চারণ এখানেও স হয়ে যাচ্ছে। সেটা ঘটে শ-এর সঙ্গে ল যুক্ত হলে। যেমন— অশ্লীল, অশ্লেষা, শ্লথ, শ্লাঘা, শ্লিষ্ট, শ্লীল, শ্লীলতা, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, শ্লোক প্রভৃতি। শব্দগুলির

উচ্চারণ যথাক্রমে অস্‌স্লিল্, অস্‌স্লেশা, স্লথ' (স্লথো), স্লাঘা, স্লিশ্‌ট' (স্লিশ্‌টো), স্লিল্, স্লিল'তা (স্লিলোতা), স্লেশ্, স্লেশ্‌শাঁ, স্লোক্। ইদানীং কোনো-কোনো বাচিক শিল্পীকে 'অশ্লীল' শব্দটিতে শ-এর উচ্চারণ অবিকৃত রেখে 'অশ্‌শ্লিল' বলতে শোনা যায়। এই ব্যতিক্রমকে কোন্ বিবেচনা থেকে কেউ-কেউ প্রশ্রয় দেন তা জানা নেই।

৭. বাংলায় কোনো বর্ণের সঙ্গে ম যুক্ত হলে উচ্চারণ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না, ম কোন্ বর্ণের সঙ্গে কোথায় বসছে তার ওপর উচ্চারণটা নির্ভর করে। নীচে কয়েকটি নিয়ম তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) শব্দের প্রথমেই যদি ম যুক্তবর্ণ হিসেবে থাকে তাহলে ম আদৌ উচ্চারিত হয় না, তার পরিবর্তে যে-বর্ণের সঙ্গে ম যুক্ত হয় সেই বর্ণে নাসিক্য ধ্বনি আসে। এইরকম কয়েকটি শব্দ শ্মশান, শ্মশ্রু, স্মরণ, স্মর্তব্য, স্মারক, স্মার্ত, স্মৃতি-র উচ্চারণ যথাক্রমে শঁশান্, শঁ'স্‌স্রু (শোঁস্‌স্রু), শঁর'ন্ (শঁরোন্), শঁর্‌ত'ব্‌ব' (শঁর্‌তোব্‌বো), শাঁর'ক্ (শাঁরোক্), শাঁর্‌ত' (শাঁর্‌তো), সৃঁতি।

(খ) ম যদি কোনো শব্দের মধ্য বা শেষ বর্ণে যুক্ত হয় সেক্ষেত্রেও ম উচ্চারিত হয় না, তার পরিবর্তে যে-বর্ণের সঙ্গে ম যুক্ত হয় সেই বর্ণ দু-বার উচ্চারিত এবং দ্বিতীয়টিতে নাসিক্য ধ্বনি আসে। এই গোত্রের কয়েকটি শব্দ অকস্মাৎ, আকস্মিক, আত্ম, কস্মিন, ছদ্ম, পদ্ম, বিস্ময়, বিস্মরণ, ভস্ম, মহাত্মা, রশ্মি, রুক্মিণী-র উচ্চারণ যথাক্রমে অক'শ্‌শাঁত্ (অকোশ্‌শাঁত্), আক'শ্‌শিঁক্ (আকোশ্‌শিঁক্), আত্‌তঁ' (আত্‌তোঁ), ক'শ্‌শিঁন্ (কোশ্‌শিঁন্), ছদ্‌দঁ' (ছদ্‌দোঁ), পদ্‌দঁ' (পদ্‌দোঁ), বিশ্‌শঁয়, বিশ্‌শঁরন্, ভশ্‌শঁ' (ভশ্‌শোঁ), মহাত্‌তাঁ, র'শ্‌শিঁ (রোশ্‌শিঁ), রুক্‌কিঁনি।

(গ) তবে শব্দের মধ্য বা শেষ বর্ণে ম যুক্ত হলে তা উচ্চারিত হয় এবং যে-বর্ণের সঙ্গে সেটি যুক্ত তার দ্বিত্বও ঘটে না যদি গ, ঙ, ণ, ন, ম ও ল-এর সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। এইসব বর্ণের সঙ্গে ম-যুক্ত শব্দের কিছু দৃষ্টান্ত ও উচ্চারণ নিম্নরূপ :

গ্+ম : বাগ্মী, যুগ্ম। উচ্চারণ যথাক্রমে বাগ্‌মি, জুগ্‌ম' (জুগ্‌মো)।

ঙ্+ম : পরাঙ্মুখ, বাঙ্ময়, বাঙ্ময়ী, বাঙ্মুখ। উচ্চারণ যথাক্রমে পরাঙ্‌মুখ্ বা পরাংমুখ্, বাঙ্‌ময়্ বা বাংময়্, বাঙ্‌ম'য়ি (বাঙ্‌মোয়ি) বা বাংম'য়ি (বাংমোয়ি), বাঙ্‌মুখ্ বা বাংমুখ্।

ণ্+ম : ষাণ্মাসিক, হিরণ্ময়। উচ্চারণ যথাক্রমে শান্‌মাশিক্, হিরন্‌ময়্।

ন্+ম : উন্মাদ, উন্মার্গ, চিন্ময়, জগন্ময়, জন্ম, মৃন্ময়। উচ্চারণ যথাক্রমে উন্‌মাদ্, উন্‌মার্‌গ' (উন্‌মার্‌গো), চিন্‌ময়্, জগ'ন্‌ময় (জগোন্‌ময়্), জন্‌ম' (জন্‌মো), মৃন্‌ময়্।

ম্+ম : সম্মত, সম্মতি, সম্মান, সম্মার্জন, সম্মিলন, সম্মিলনী, সম্মেলন, সম্মুখ, সম্মোহন, সম্মোহনী, সম্মোহিত। উচ্চারণ যথাক্রমে শম্‌মত' (শম্‌মতো), শম্‌ম'তি (শম্‌মোতি), শম্‌মান্, শম্‌মিলন্, শম্‌মিল'নি (শম্‌মিলোনি), শম্‌মেলন্, শম্‌মুখ্, শম্‌মোহন্, শম্‌মোহ'নি (শম্‌মোহোনি), শম্‌মোহিত' (শম্‌মোহিতো)।

ল্+ম : কল্মষ, গুল্ম, বল্মীক, বাল্মীকি, শাল্মলী। উচ্চারণ যথাক্রমে কল্‌মোশ্, গুল্‌ম'

(গুল্‌মো), ব'ল্‌মিক্ (বোল্‌মিক্), বাল্‌মিকি, শালম'লি (শাল্‌মোলি)।

(ঘ) ক্ষ-এর সঙ্গে ম যুক্ত বর্ণে ম-এর উচ্চারণ নেই। তার পরিবর্তে যুক্তব্যঞ্জনের শেষ বর্ণের উচ্চারণে খানিকটা নাসিক্যধ্বনি আসে। উদাহরণ— যক্ষ্মা, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম। উচ্চারণ যথাক্রমে জক্‌খাঁ, লক্‌খঁ'ন্ (লক্‌খোঁন্), ল'ক্‌খিঁ (লোক্‌খিঁ), শুক্‌খঁ' (শুক্‌খোঁ)।

(ঙ) শ, স ও ষ-এর সঙ্গে ম-যুক্ত কয়েকটি শব্দে বাংলাতেও ম-এর উচ্চারণ করা হয় সংস্কৃত রীতিতে। যেমন—কাশ্মীর, কুষ্মাণ্ড, আয়ুষ্মান, আয়ুষ্মতী, শুচিস্মিতা, স্মিত, স্মিতা, সুস্মিতা। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে কাশ্‌মির, কুশ্‌মান্‌ড' (কুশ্‌মান্‌ডো), আয়ুশ্‌মান্, আয়ুশ্‌ম'তি (আয়ুশ্‌মোতি), শুচিশ্‌মিতা/শুচিস্‌মিতা, স্মিত' (স্মিতো), স্মিতা, শুশ্‌মিতা/শুস্‌মিতা। কেউ-কেউ বাংলা নিয়মে কুষ্মাণ্ড ও স্মিত শব্দ দুটির উচ্চারণ করেন যথাক্রমে কুশ্‌শাঁন্‌ড' (কুশ্‌শাঁন্‌ডো) ও শিঁত' (শিঁতো)। কিন্তু বাঙালিদের মুখে স্মিতা বা সুস্মিতা নামের কোনো নারীকে 'শিঁতা' বা 'শুশিঁতা/শুশ্‌শিঁতা' সম্বোধনের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তাহলে শুধু স্মিত-র বেলায় ম বাদ দিয়ে অনুনাসিক উচ্চারণের প্রয়োজন আছে কি? তবে বাঙালির রসনায় কুষ্মাণ্ড শব্দটির কুশ্‌শাঁন্‌ড' (কুশ্‌শাঁন্‌ডো) উচ্চারণ বেশ প্রচলিত, তাই এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ইতিপূর্বে যুক্তবর্ণে 'ব' থাকলে তার উচ্চারণ নিয়ে কয়েকটা নিয়মের কথা বলা হয়েছিল। এবার আরো দুটো নিয়মের কথা মনে পড়ল।

৮. (ক) সন্ধিতে দিক্, ঋক্-এর পরে ব থাকলে সেটা উচ্চারিত হয়। যেমন— দিগ্বধূ, দিগ্বলয়, দিগ্বসনা, দিগ্বালিকা, দিগ্বিদিক, দিগ্বিজয়, ঋগ্বেদ। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে দিগ্‌ব'ধু (দিগ্‌বোধু), দিগ্‌বলয়্, দিগ্‌বশ'না (দিগ্‌বশোনা), দিগ্‌বালিকা, দিগ্‌বিদিক্, দিগ্‌বিজয়্, ঋগ্‌বেদ্।

(খ) ব ও ম-এর সঙ্গে ব যুক্ত হলেও সেটা উচ্চারিত হয়। যথা— অম্বর, অম্বা, গম্বুজ, জব্বর, তিব্বত, নব্বই, নিতম্ব, লম্বা, বাব্বা, বিম্ব, শম্বুক, সব্বাই, সম্বন্ধ, সম্বল প্রভৃতি। শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে অম্‌বর্, অম্‌বা, গ'ম্‌বুজ্ (গোম্‌বুজ্), জব্‌বর্, তিব্‌বত্, ন'ব্‌ব'ই্ (নোব্‌বোই্), নিতম্‌ব' (নিতম্‌বো), লম্‌বা, বাব্‌বা, বিম্‌ব' (বিম্‌বো), শ'ম্‌বুক্ (শোম্‌বুক্), শব্‌বাই্, শম্‌বন্‌ধ' (শম্‌বন্‌ধো), শম্‌বল্।

৯. জ-এর সঙ্গে ঞ যুক্ত হলে দুটো বর্ণের কোনোটাই উচ্চারিত হয় না। জ হয়ে যায় গ আর ঞ-র উচ্চারণে আসে চন্দ্রবিন্দু, অর্থাৎ অনুনাসিক। নীচের উদাহরণগুলি দেখলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে। অজ্ঞ, অজ্ঞাত, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়, জিজ্ঞাসা, জ্ঞান, জ্ঞাত, জ্ঞাতব্য, বিজ্ঞ, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান। এই শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে অগ্‌গঁ' (অগ্‌গোঁ), অগ্‌গ্যাঁত' (অগ্‌গ্যাঁতো), অগ্‌গ্যাঁন্, অগ্‌গেঁয়' (অগ্‌গেঁয়ো), জিগ্‌গাঁসা, গ্যাঁন্, গ্যাঁত' (গ্যাঁতো), গ্যাঁত'ব্‌ব' (গ্যাঁতোব্‌বো), বিগ্‌গঁ' (বিগ্‌গোঁ), বিগ্‌গঁ'প্‌তি (বিগ্‌গোঁপ্‌তি), বিগ্‌গ্যাঁন্।

১০. ঞ-র সঙ্গে চ ছ জ বা ঝ যুক্ত হলে ঞ-র উচ্চারণ ন-এর মতো হয়। যেমন— বঞ্চনা, সঞ্চয়, উঞ্ছ, বাঞ্ছা, অঞ্জন, খঞ্জ, জঞ্জাল, প্রাঞ্জল, ব্যঞ্জন, ব্যাঞ্জন, সঞ্জয়, ঝঞ্ঝা।

শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে ব্‌নচ'না (বন্‌চোনা), শন্‌চয়্‌, উন্‌ছ' (উন্‌ছো), বান্‌ছা, অন্‌জন্‌, খন্‌জ' (খন্‌জো), জন্‌জাল্‌, প্রান্‌জল্‌, ব্যান্‌জ'ন্‌, (ব্যান্‌জোন্‌), ব্যান্‌জ'ন্‌, (ব্যান্‌জোন্‌), শন্‌জয়্‌, ঝন্‌ঝা।

১১. শব্দের মধ্যে বিসর্গ থাকলে যে-বর্ণের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত সেটায় অন্য কোনো স্বরচিহ্ন না-থাকলে হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয় আর বিসর্গের পরবর্তী বর্ণে দ্বিত্ব আসে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি এই নিয়মের অনুবর্তী— অতঃপর, অধঃপাত, অন্তঃপুর, অন্তঃস্থ, নিঃশব্দ, নিঃসংকোচ, নিঃসন্দেহ, নিঃসম্বল, নিঃসংশয়, নিঃসহায়, মনঃকষ্ট, মনঃপীড়া, মনঃপূত, পুনঃপুন। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে অত'প্‌পর্‌ (অতোপ্‌পর্‌), অধ'প্‌পাত্‌ (অধোপ্‌পাত), অন্‌ত'প্‌পুর্‌ (অন্‌তোপ্‌পুর্‌), অন্‌ত'স্‌থ' (অন্‌তোস্‌থো), নিশ্‌শব্‌দ' (নিশ্‌শব্‌দো), নিশ্‌শংকোচ্‌, নিশ্‌শন্‌দেহ' (নিশ্‌শন্‌দেহো), নিশ্‌শম্‌বল্‌, নিশ্‌শংশয়্‌, নিশ্‌শহায়্‌, ম'ন'ক্‌কশ্‌ট' (মোনোক্‌কশ্‌টো), ম'ন'প্‌পিড়া, (মোনোপ্‌পিড়া, ম'ন'প্‌পুত' (মোনোপ্‌পুতো), পুন'প্‌পুন' (পুনোপ্‌পুনো)।

১২. ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, য-ফলা যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণের অ বা অ-কারাত্মক বর্ণের উচ্চারণে অনিবার্যভাবে হ্রস্ব-ও আসে, যেমন— অন্য, গণ্য, বন্য প্রভৃতি, যেগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে অ'ন্‌ন' (ওন্‌নো), গ'ন্‌ন' (গোন্‌নো), ব'ন্‌ন' (বোন্‌নো)। এ-ছাড়াও কোনো শব্দে য-ফলা থাকলে উচ্চারণে আরো অন্তত ছয় রকম নিয়মের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

(ক) শব্দের মধ্যে বা শেষে য-ফলা থাকলে যে-বর্ণের সঙ্গে সেটা যুক্ত হয় তার দ্বিত্ব ঘটে, য-ফলার কোনো উচ্চারণ নেই— অত্যন্ত, অত্যধিক, অত্যাচার, অদ্য, অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, অধ্যাত্ম, অধ্যাপক, অধ্যায়, অধ্যুষিত, অন্য, আদ্যা, কল্য, কাত্যায়ন, গদ্য, পথ্য, প্রত্যহ, যোগ্য, সত্য, সদ্য, অগত্যা, বাত্যা, বিদ্যা, মিথ্যা, হত্যা প্রভৃতি। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ওত্‌ত'ন্‌ত' (ওত্‌তোন্‌তো), ওত্‌ত'ধিক্‌ (ওত্‌তোধিক্‌), ওত্‌তাচার্‌ (ওত্‌তাচার্‌), ওদ্‌দ' (ওদ্‌দো), ওদ্‌ধ'বশায়্‌ (ওদ্‌ধোবশায়্‌), ওদ্‌ধয়'ন্‌ (ওদ্‌ধয়োন্‌), ওদ্‌ধাত্‌তঁ' (ওদ্‌ধাত্‌তোঁ), ওদ্‌ধাপক্‌ (ওদ্‌ধাপক্‌), ওদ্‌ধায়্‌ (ওদ্‌ধায়্‌), ওদ্‌ধুশিত' (ওদ্‌ধুশিতো), ওন্‌ন' (ওন্‌নো), আদ্‌দা, ক'ল্‌ল' (কোল্‌লো), কাত্‌তায়ন্‌, গ'দ্‌দ' (গোদ্‌দো), প'ত্‌থ' (পোত্‌থো), প্র'ত্‌ত'হ' (প্রোত্‌তোহো), জোগ্‌গ' (জোগ্‌গো), শ'ত্‌ত' (শোত্‌তো), শ'দ্‌দ' (শোদ্‌দো), অগ'ত্‌তা (অগোত্‌তা), বাত্‌তা, বিদ্‌দা, মিত্‌থা, হ'ত্‌তা (হোত্‌তা)।

(খ) পরে ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা 'অ', 'ও' ধ্বনি বা অন্য স্বর-যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা 'অ্যা' উচ্চারিত হয়, যথা— ন্যস্ত, ত্যক্ত, ব্যক্ত, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যথা, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যবধান, ব্যবস্থা, ব্যবসায়, ব্যয়। শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে ন্যাস্‌ত' (ন্যাস্‌তো), ত্যাক্‌ত' (ত্যাক্‌তো), ব্যাক্‌ত' (ব্যাক্‌তো), ব্যাগ্‌গ্র' (ব্যাগ্‌গ্রো), ব্যাংগ' (ব্যাংগো), ব্যান্‌জ'না (ব্যান্‌জোনা), ব্যাথা, ব্যার্‌থ' (ব্যার্‌থো), ব্যাব'ধান্‌ (ব্যাবোধান্‌), ব্যাব'স্‌থা (ব্যাবোস্‌থা), ব্যাব'শায়্‌ (ব্যাবোশায়্‌), ব্যাস্‌ত' (ব্যাস্‌তো), ব্যায়্‌। 'ন্যক্কার' শব্দের উচ্চারণ এই নিয়মে

কেউ-কেউ 'ন্যাক্‌কার্' করেন, তবে 'নক্‌কার্'ই বেশি প্রচলিত। কিন্তু আগে উপসর্গ থাকলে 'অ্যা' হয় না, 'অ' উচ্চারিত হয়— উত্ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, বিন্যস্ত। এই তিনটি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে উত্‌তক্‌ত' (উত্‌তক্‌তো), প'রিত্‌তক্‌ত' (পোরিত্‌তক্‌তো), বিন্‌নস্‌ত' (বিন্‌নস্‌তো)।

(গ) পরে 'ই' ধ্বনি থাকলে য-ফলা যুক্ত বর্ণে 'এ' উচ্চারণ আসে। যেমন— অভিব্যক্তি, ত্যজিয়া, ত্যজিলে, ব্যক্তি, ব্যক্তিগত (এবং ব্যক্তি-যুক্ত সমস্ত শব্দ), ব্যক্তিক, ব্যঞ্জিত, ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমী, ব্যতিক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিরিক্ত, ব্যতিরেক, ব্যতিরেকী, ব্যতিরেকে, ব্যতিহার, ব্যতীত, ব্যথিত, ব্যথী, ব্যধিকরণ, ব্যয়িত, ব্যয়ী, ব্যষ্টি। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ওভিব্‌বেক্‌তি (ওভিব্‌বেক্‌তি), তেজিয়া, তেজিলে, বেক্‌তি, বেক্‌তিগত' (বেক্‌তিগতো), বেক্‌তিক্, বেন্‌জিত' (বেন্‌জিতো), বেতিক্‌ক্র'ম্ (বেতিক্‌ক্রোম্), বেতিক্‌ক্র'মি (বেতিক্‌ক্রোমি), বেতিক্‌ক্রান্‌ত' (বেতিক্‌ক্রান্‌তো), বেতিব্‌ব্যাস্‌ত' (বেতিব্‌ব্যাস্‌তো), বেতিরিক্‌ত' (বেতিরিক্‌তো), বেতিরেক্, বেতিরেকি, বেতিরেকে, বেতিহার্, বেতিত' (বেতিতো), বেথিত' (বেথিতো), বেথি, বেধিকর'ন্ (বেধিকরোন্), বেয়িত' (বেয়িতো), বেয়ি, বেশ্‌টি। নিয়মটি ব্যভিচার/ব্যভিচারী শব্দের ক্ষেত্রে খাটছে না, এখানে পরে ই-কার থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ 'এ'-র পরিবর্তে 'অ্যা' অর্থাৎ ব্যাভিচার্/ব্যাভিচারি। সুতরাং এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা উচিত।

(ঘ) কিছু শব্দের মধ্যে বা শেষে য-ফলার উচ্চারণ নেই, যে-বর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত তার দ্বিত্বও হয় না, শুধু সংশ্লিষ্ট বর্ণটি উচ্চারিত হয়— অর্ঘ্য, সন্ধ্যা, সন্ন্যাসী, স্বাস্থ্য, বন্ধ্যা, মর্ত্য, হর্ম্য। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ওর্‌ঘ' (ওর্‌ঘো), শ'ন্‌ধা (শোন্‌ধা), শ'ন্‌নাশি (শোন্‌নাশি), শাস্‌থ' (শাস্‌থো), ব'ন্‌ধা (বোন্‌ধা), ম'র্‌ত' (মোর্‌তো), হ'র্‌ম' (হোর্‌মো)।

(ঙ) য-ফলা যুক্ত শব্দের গোড়ায় অ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ও-কার থাকলেও যে-বর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত থাকে, শুধু সেই বর্ণ স্বরচিহ্ন-সহ উচ্চারিত হয়— দ্যুতি, ন্যুব্জ, ন্যূন, দ্যোতনা, ব্যূঢ়, ব্যূহ। শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে দুতি, নুব্‌জ' (নুব্‌জো), নুন' (নুনো), দোত'না (দোতোনা), বুঢ়' (বুঢ়ো), বুহ' (বুহো)।

(চ) য-ফলা যুক্ত প্রথম বর্ণের সঙ্গে আ-কার (বা অ্যা-কার) থাকলে সংশ্লিষ্ট বর্ণের সঙ্গে 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। যেমন— ক্যাচ, ক্যামেরা, ক্যারম, ক্যালানো, খ্যাত, খ্যাতি, খ্যাদানো, খ্যাপা, গ্যাঁড়াকল, গ্যাস, ঘ্যানঘ্যান, চ্যাটচেটে, চ্যাটাং, চ্যানেল, চ্যাপটার, ছ্যাকড়া, ছ্যাবলা, জ্যাকেট, জ্যাঠা, জ্যামিতি, ট্যাংক, ট্যাংরা, ঠ্যাং, ঠ্যাঁটা, ঠ্যাঙাড়ে, ড্যাকরা, ড্যাম, ড্যাশ, ঢ্যাঁড়শ, ঢ্যাঙা, ত্যাঁদড়, ত্যাগ, ত্যাজ্য, ত্যারা, ত্যারছা, থ্যালাসেমিয়া, ধ্যান, ন্যাড়া, ন্যাতা, প্যাংলা, প্যাঁক, প্যাঁচা, প্যাকিং, প্যান্ট, প্যাশন, প্যাসেঞ্জার, ফ্যাঁকড়া, ফ্যাক্টরি, ফ্যান, ফ্যাসাদ, ব্যাক, ব্যাগ, ব্যাট, ব্যাপক, ব্যাবসা, ব্যায়াম, ব্যারাম, ভ্যান, ম্যাচ, ম্যাজমেজে, ম্যাট্রিক, ম্যানেজার, ম্যাপ, ম্যারাথন, ম্যারাপ, ল্যাংচা, ল্যাগব্যাগ, ল্যাঠা, ল্যান্ড, শ্যাওড়া, শ্যাওলা, শ্যাডো, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামা, শ্যালক, হ্যাংলা, হ্যাট, হ্যাপিনেস।

১৩. শব্দের শুরুতে 'অ্যা'-উচ্চারণযুক্ত বিদেশী শব্দগুলির উচ্চারণ সর্বদাই 'অ্যা' হবে— অ্যাক্ট, অ্যাটাক, অ্যানাটমি, অ্যাডভোকেট, অ্যান্ড, অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাথলিট, অ্যাভিনিউ, অ্যাসপিরিন, অ্যাসবেস্টস, অ্যালকোহল ইত্যাদি।

১৪. শব্দের মধ্যে বা শেষে র-ফলার সঙ্গে ই/ঈ-কার থাকলে যে-বর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হয় তার দ্বিত্ব ঘটে। যথা— বিক্রীত, নেত্রী। উচ্চারণ যথাক্রমে বিক্‌ক্রিত' (বিক্‌ক্রিতো), নেত্‌ত্রি। কিন্তু শব্দের প্রথমে থাকলে এই দ্বিত্ব হয় না, যেমন— ব্রিটিশ (ব্রিটিশ্), ব্রিটেন (ব্রিটেন্), ম্রিয়মাণ (ম্রিয়'মান্ বা ম্রিয়োমান্)।

১৫. ঋ-কারের উচ্চারণ ই-কার যুক্ত র-ফলার মতো নয়, সম্পূর্ণ আলাদা, লিখে বোঝানো মুশকিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় না। অতৃপ্ত, অদৃশ্য, অদৃষ্ট, অমৃত, আদৃত, আবৃত্তি, তৃপ্ত, দৃশ্য, নিভৃত, পিতৃ, বৃত, বৃদ্ধ, মাতৃভাষা, মৃত, মৃদু প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ উপযুক্ত ব্যক্তির মুখে শুনে নেওয়াই ভালো। তবে মসৃণ ও অপসৃত এই দুটি শব্দের উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিকল্পে প্রচলিত। অর্থাৎ শব্দ দুটির দুরকম উচ্চারণ শোনা যায়, যথা— ম'স্রিন্ (মোস্রিন্) বা ম'স্‌সৃন্ (মোস্‌সৃন্) এবং অপ'স্রিত' (অপোস্রিতো) বা অপ'স্‌সৃত' (অপোস্‌সৃতো)।

১৬. রেফ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে সাধারণত দ্বিত্ব আসে, যে-কারণে একসময়ে বানানেও দ্বিত্ব প্রচলিত ছিল। যেমন— অথর্ব, কর্ম, গর্ব, দর্প, ধর্ম, পূর্ব, বর্বর, মর্ম, সর্ব। শব্দগুলির পরিশীলিত উচ্চারণ যথাক্রমে অথর্‌ব্ব' (অথর্‌ব্বো), কর্‌ম্ম' (কর্‌ম্মো), গর্‌ব্ব' (গর্‌ব্বো), দর্‌প্প' (দর্‌প্পো), ধর্‌ম্ম' (ধর্‌ম্মো), পুর্‌ব্ব' (পুর্‌ব্বো), বর্‌ব্বর্, মর্‌ম্ম' (মর্‌ম্মো), শর্‌ব্ব' (শর্‌ব্বো)। তবে বানানে যেমন দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, তেমনই উচ্চারণেও এই দ্বিত্বের ভাব ক্রমশ ক্রমে আসছে এবং ইদানীং এইসব শব্দের দ্বিত্ববিহীন উচ্চারণই বেশি করে চলছে। অর্থাৎ এখনকার উচ্চারণ অথর্‌ব' (অথর্‌বো), কর্‌ম' (কর্‌মো), গর্‌ব' (গর্‌বো), দর্‌প' (দর্‌পো), ধর্‌ম' (ধর্‌মো), পুর্‌ব' (পুর্‌বো), বর্‌বর্, মর্‌ম' (মর্‌মো), শর্‌ব' (শর্‌বো) প্রভৃতি।

১৭. শব্দের মধ্যে ও শেষে র-ফলা যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে। আক্রমণ, আশ্রম, গাত্র, ছাত্র, পরিশ্রম, পাত্র, বিশ্রাম, মিত্র, রাত্র প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে আক্‌ক্র'ম'ন্ (আক্‌ক্রোমোন্), আস্‌স্র'ম্ (আস্‌স্রোম্), গাত্‌ত্র' (গাত্‌ত্রো), ছাত্‌ত্র' (ছাত্‌ত্রো), প'রিস্‌স্র'ম্ (পোরিস্‌স্রোম্), পাত্‌ত্র' (পাত্‌ত্রো), বিস্‌স্রাম্, মিত্‌ত্র' (মিত্‌ত্রো), রাত্‌ত্র' (রাত্‌ত্রো)।

১৮. অনুস্বারের পরবর্তী সিলেব্‌ল (দল)-এর উচ্চারণ স্বরান্ত হয়। যথা— অংশ, কংস, ত্রিংশ, বংশ, হংস। এগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে অংশ' (অংশো), কংশ' (কংশো), ত্রিংশ' (ত্রিংশো), বংশ' (বংশো), হংস' (হংসো)।

১৯. চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ সর্বদা অনুনানসিক— আঁশ, কাঁচা, কাঁটা, কাঁদা, কুঁড়ি, খাঁচা, গাঁ, গাঁথা, গাঁদা, ছোঁড়া, পাঁক, পাঁজি, পাঁঠা, বাঁধা, বাঁশ, বাঁশি, বেঁচে, ভাঁজা, হাঁস প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে শুধু খাঁচা, বাঁশ ও বাঁশি ছাড়া বাকি সব ক-টা শব্দে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ

না-করলে শব্দের অর্থই পালটে যাবে। অর্থান্তরিত ওইসব শব্দের উদাহরণ যথাক্রমে আশ, কাচা, কাটা কাদা, কুড়ি, গা, গাথা, গাদা, ছোড়া, পাক, পাজি, পাঠা, বাধা, বেচে, ভাজা, হাস।

২০. শব্দের শেষে 'ত' 'ইত' থাকলে উচ্চারণ স্বরান্ত হবে। এত, আগত, কত, গত, গলিত, চলিত, তত, দলিত (দলন করা হয়েছে এই অর্থে), দুঃখিত, নত, পঠিত, পতিত (পড়ে গেছে বা পতন হয়েছে এই অর্থে), পরীক্ষিত, পালিত, প্রধানত, মৃত, বঞ্চিত, যত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে এ্যত' (এ্যতো), আগত' (আগতো), কত' (কতো), গত' (গতো), গলিত' (গলিতো), চলিত' (চলিতো), তত' (ততো), দলিত' (দলিতো), দুক্‌খিত' (দুক্‌খিতো), নত' (নতো), পঠিত' (পঠিতো), পতিত' (পতিতো), প'রিক্‌খিত' (পোরিক্‌খিতো), পালিত' (পালিতো), প্র'ধানত' (প্রোধানতো), মৃত' (মৃতো), ব'ন্‌চিত' (বোন্‌চিতো), জত' (জতো)।

২১(ক) তৎসম শব্দের শেষে খণ্ড-ত (ৎ) থাকলে উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত হবে। তাই অকস্মাৎ, ক্বচিৎ, কিঞ্চিৎ, কদাচিৎ, জগৎ, তাবৎ, পরীক্ষিৎ, ভবিষ্যৎ, যাবৎ, হঠাৎ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে অক'শ্‌শাঁত্ (অকোশ্‌শাঁত্), ক'চিত্ (কোচিত্), কিন্‌চিত্, কদাচিত্, জগ'ত্ (জগোত্), তাব'ত্ (তাবোত্), প'রিক্‌খিত্ (পোরিক্‌খিত্), ভ'বিশ্‌শত্ (ভোবিশ্‌শত্), জাব'ত্ (জাবোত্), হঠাত্।

(খ) অতৎসম শব্দে সাধারণত খণ্ড-ত (ৎ) ব্যবহৃত হয় না, তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দে হতে পারে, উচ্চারণও তাই ব্যঞ্জনান্ত হবে, যেমন— কড়াৎ (কড়াত্), ফুড়ুৎ (ফুড়ুত্), মড়াৎ (মড়াত্)।

২২. কিছু বাংলা শব্দের শেষে 'ত' থাকলেও খণ্ড-ত (ৎ)-এর মতো ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ হয়, যথা— অতীত (ওতিত্), আঘাত (আঘাত্), আড়ত (আড়োত্), উচিত (উচিত্), দলিত (সম্প্রদায় অর্থে) (দোলিত্), নিশ্চিত (নিশ্‌চিত্), পতিত (পড়ে-থাকা অর্থে, যেমন পতিত জমি) (পোতিত্)।

২৩. দুই অক্ষরবিশিষ্ট অধিকাংশ শব্দের শেষ বর্ণে কোনো স্বরচিহ্ন না-থাকলে উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত হয়— আট (আট্), আম (আম্), ইট (ইট্), উট (উট্), উল (উল্), ঋণ (রিন্), এক (এ্যক্), ওত (ওত্), ওল (ওল্), কচ (কচ্), কম (কম্), কল (কল্), কাঠ (কাঠ্), কান (কান্), কাচ (কাচ্), কাপ (কাপ্), কাম (কাম্), কাল (কাল্), কাশ (কাশ্), কুল (কুল্), কূল (কুল্), কুশ (কুশ্), কূট (কুট্), কোট (কোট্), কোল (কোল্), খড় (খড়্), খাট (খাট্), খিল (খিল্), খেত (খেত্), খোদ (খোদ্), গান (গান্), গুণ (গুন্), চুন (চুন্), ছাদ (ছাদ্), জাত (জাত্), জ্বর (জ্বর্), টন (টন্), টান (টান্), টিন (টিন্), ঠক (ঠক্), ঠগ (ঠগ্), ডাল (ডাল্), ডিম (ডিম্), ঢিল (ঢিল্), তার (তার্), তাস (তাশ্), তিন (তিন্), থান (থান্), দশ (দশ্), দিশ (দিশ্), দাস (দাশ্), ধস (ধশ্), নীল (নিল্), পল (পল্), পাত (পাত্), পান (পান্), ফুস (ফুশ্), বিশ (বিশ্), বিষ (বিশ্), ভাত (ভাত্), ভূত (ভুত্), মাছ (মাছ্), যার (যার্), রথ (রথ্), রস (রশ্), রাত (রাত্), রাম (রাম্), রাশ (রাশ্), রাস

(রাশ্), লব (লব্), লাভ (লাভ্), লাশ (লাশ্), শন (শন্), শান (শান্), শ্বাস (শাশ্), শীত (শিত্), ষাট (শাট্), সন (শন্), সাত (শাত্), সার (শার্), হাম (হাম্), হার (হার্), হিম (হিম্) প্রভৃতি।

২৪. তিন অক্ষরবিশিষ্ট বহু শব্দের মধ্য বর্ণে কোনো স্বরচিহ্ন যুক্ত না-হলেও তা স্বরান্ত আর শেষ বর্ণের উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত হয়। সেইসঙ্গে উল্লেখ্য, ওইসব শব্দের শুরুতে যদি 'অ', ই-কার বা 'উ' থাকে তাহলে মধ্যবর্ণের উচ্চারণ নির্ভেজাল 'অ' হয়, কিন্তু প্রথমে অ-উচ্চারণ সূচক অন্য ব্যঞ্জন বা আ-কার বা 'ও' বা এ-কার বা ও-কার থাকলে মধ্যবর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে। উচ্চারণ-সহ এইরকম কিছু শব্দের উল্লেখ করা হচ্ছে। অচল (অচল্), অটল (অটল্), অতল (অতল্), অধর (অধর্), অমল (অমল্), অলস (অলস্), আখর (আখ'র্ বা আখোর্), আগর (আগ'র্ বা আগোর্), আজব (আজ'ব্ বা আজোব্), আদর (আদ'র্ বা আদোর্), আনন (আন'ন্ বা আনোন্), ইতর (ইতর্), ইমন (ইমন্), ঈগল (ইগল্), উপর (উপর্), ওজন (ওজ'ন্ বা ওজোন্), ওপর (ওপ'র্ বা ওপোর্), কমল (কম'ল্ বা কমোল্), কলম (কল'ম্ বা কলোম্), কলস (কল'শ্ বা কলোশ্), কসম (কস'ম্ বা কসোম্), কাজল (কাজ'ল্ বা কাজোল্), কেশর (কেশ'র্ বা কেশোর্), কোমল (কোম'ল্ বা কোমোল্), কোরক (কোর'ক্ বা কোরোক্), খড়ম (খড়'ম্ বা খড়োম্), খতম (খত'ম্ বা খতোম্), গমন (গম'ন্ বা গমোন্), গরজ (গর'জ্ বা গরোজ্), গরম (গর'ম্ বা গরোম্), চরণ (চর'ন্ বা চরোন্), চরম (চর'ম্ বা চরোম্), চলন (চল'ন্ বা চলোন্), ছগন (ছগ'ন্ বা ছগোন্), ছাগল (ছাগ'ল্ বা ছাগোল্), ছেদক (ছেদ'ক্ বা ছেদোক্), ছোবল (ছোব'ল্ বা ছোবোল্), জঠর (জঠ'র্ বা জঠোর্), জনম (জন'ম্ বা জনোম্), জবর (জব'র্ বা জবোর্), জাগর (জাগ'র্ বা জাগোর্), জাতক (জাত'ক্ বা জাতোক্), জারক (জার'ক্ বা জারোক্), জালক (জাল'ক্ বা জালোক্), জ্বলন (জল'ন্ বা জলোন্), ঝলক (ঝল'ক্ বা ঝলোক্), ঝাড়ন (ঝাড়'ন্ বা ঝাড়োন্), ঝাপট (ঝাপ'ট্ বা ঝাপোট্), ঝালর (ঝাল'র্ বা ঝালোর্), টনক (টন'ক্ বা টনোক্), টহল (টহ'ল বা টহোল্), ঠমক (ঠম'ক্ বা ঠমোক্), ডগর (ডগ'র্ বা ডগোর্), ডলন (ডল'ন্ বা ডলোন্), ডাগর (ডাগ'র্ বা ডাগোর্), ঢোলক (ঢোল'ক্ বা ঢোলোক্), তখন (তখ'ন্ বা তখোন্), তরণ (তর'ন্ বা তরোন্), তাকত (তাক'ত্ বা তাকোত্), তারক (তার'ক্ বা তারোক্), তারণ (তার'ন্ বা তারোন্), তরল (তর'ল্ বা তরোল্), তলব (তল'ব্ বা তলোব্), তোষণ (তোশ'ন্ বা তোশোন্), থমক (থম'ক্ বা থমোক্), থাপড় (থাপ'ড়্ বা থাপোড়্), দখল (দখ'ল্ বা দখোল্), দমক (দম'ক্ বা দমোক্), দমন (দম'ন্ বা দমোন্), দরদ (দর'দ্ বা দরোদ্), দলন (দল'ন্ বা দলোন্), দশক (দশ'ক্ বা দশোক্), দশন (দশ'ন্ বা দশোন্), দানব (দান'ব্ বা দানোব্), ধমক (ধম'ক্ বা ধমোক্), ধরন (ধর'ন্ বা ধরোন্), ধরম (ধর'ম্ বা ধরোম্), নকল (নক'ল্ বা নকোল্), নখর (নখ'র্ বা নখোর্), নগদ (নগ'দ্ বা নগোদ্), নগর (নগ'র্ বা নগোর্), নজর (নজ'র্ বা নজোর্), নধর (নধ'র্ বা নধোর্), নবম (নব'ম্ বা নবোম্), নাগর (নাগ'র্ বা নাগোর্), নীরদ (নিরদ্), নীরব (নিরব্), পরম

(পর'ম্ বা পরোম্), পরব (পর'ব্ বা পরোব্), পিছন (পিছন্), পিতল (পিতল্), পেছন (পেছ'ন্ বা পেছোন্), পেতল (পেত'ল্ বা পেতোল্), পোষণ (পোশ'ন্ বা পোশোন্), ফলন (ফল'ন্ বা ফলোন্), বলদ (বল'দ্ বা বলোদ্), বসন (বশ'ন্ বা বশোন্), বেতন (বেত'ন্ বা বেতোন্), ভরণ (ভর'ন্ বা ভরোন্), ভিতর (ভিতর্), ভেতর (ভেত'র্ বা ভেতোর্), মদন (মদ'ন্ বা মদোন্), মরণ (মর'ন্ বা মরোন্), মরম (মর'ম্ বা মরোম্), মোদক (মোদ'ক্ বা মোদোক্), যতন (জত'ন্ বা জতোন্), রতন (রত'ন্ বা রতোন্), লগন (লগ'ন্ বা লগোন্), লেহন (লেহ'ন্ বা লেহোন্), লোচন (লোচ'ন্ বা লোচোন্), শরণ (শর'ন্ বা শরোন্), শরম (শর'ম্ বা শরোম্), সমর (শম'র্ বা শমোর্), সাগর (শাগ'র্ বা শাগোর্) ইত্যাদি।

২৫(ক) সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দযুগলের প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। যথা— করযুগ, গীতগোবিন্দ, পথচারী, পথসভা, বনবাস, বনবাসী, বিষবৃক্ষ, রণতূর্য, লোকগীতি প্রভৃতি। এইসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে কর'যুগ্ (করোযুগ্), গিত'গোবিন্দ' (গিতোগোবিন্দো), পথ'চারি (পথোচারি), পথ'শভা (পথোশভা), ব'ন'বাস্ (বোনোবাস্), ব'ন'বাসি (বোনোবাসি), বিশ'বৃক্‌খ' (বিশোবৃক্‌খো), রন'তুর্‌জ' (রনোতুর্‌জো), লোক'গিতি (লোকোগিতি)।

২৫(খ) বাংলায় অনেক তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দে আবার এই নিয়ম মানা হয় না। যেমন— কামধেনু, দুর্গেশনন্দিনী, বিধানসভা, নবীনচন্দ্র, মেঘদূত, রাজপুত্র, রাজহংস, রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, লোকসভা, সংবাদপত্র, হেমচন্দ্র। এগুলির বাংলা উচ্চারণ যথাক্রমে কাম্‌ধেনু, দুর্‌গেশ্‌ন'ন্‌দিনি (দুর্‌গেশ্‌নোন্‌দিনি), বিধান্‌শভা, ন'বিন্‌চন্‌দ্র' (নোবিন্‌চন্‌দ্রো), মেঘ্‌দূত্ (তবে 'মেঘদূতম্'-এর উচ্চারণ মেঘ'দুতম্ বা মেঘোদুতম্), রাজ্‌পুত্‌ত্রো, রাজ্‌হংশ' (রাজ্‌হংশো), রাম্‌চন্‌দ্র' (রাম্‌চন্‌দ্রো), রাম্‌কৃশ্‌ন' (রাম্‌কৃশ্‌নো), লোক্‌নাথ্, লোক্‌শভা, শংবাদ্‌পত্‌ত্র' (শংবাদ্‌পত্‌ত্রো), হেম্‌চন্‌দ্র' (হেম্‌চন্‌দ্রো)।

২৫(গ) তবে যেসব সমাসবদ্ধ শব্দে তৎসম ও অতৎসম দু-ধরনের শব্দই রয়েছে সেখানে প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের উচ্চারণ সর্বদাই ব্যঞ্জনান্ত। যথা— মনপসন্দ, মনখারাপ, মনগড়া, মনচোরা, রণপা প্রভৃতি। শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে ম'ন্‌পসন্দ্ (মোন্‌পসন্দ্), ম'ন্‌খারাপ্ (মোন্‌খারাপ্), ম'নগড়া (মোন্‌গড়া), ম'ন্‌চোরা (মোন্‌চোরা), রন্‌পা।

২৬) 'তর', 'তম' (উচ্চারণ 'তরো', 'তমো') প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণের শেষ 'অ' সাধারণত হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয়। যেমন— অধিকতম (ওধিক'তম' বা ওধিকোতমো), অধিকতর (ওধিক'তর' বা ওধিকোতরো), অন্যতর (ওন্‌ন'তর' বা ওন্‌নোতরো), উচ্চতম (উচ্‌চ'তম' বা উচ্‌চোতমো), উচ্চতর (উচ্‌চ'তর' বা উচ্‌চোতরো), গুরুতর (গুরুতর' বা গুরুতরো), ভিন্নতর (ভিন্‌ন'তর' বা ভিন্‌নোতরো), নিকৃষ্টতম (নিকৃশ্‌ট'তম' বা নিকৃশ্‌টোতমো), নিকৃষ্টতর (নিকৃশ্‌ট'তর' বা নিকৃশ্‌টোতরো), সর্বোত্তম (শর্‌ব'ত্‌তম' বা শর্‌বোত্‌তমো)।

২৭) শব্দের প্রথম ঐ-কার আর ঔ-কার যথাক্রমে 'ওই' আর 'ওউ' এবং শেষ বর্ণ

স্বরান্ত তথা হ্রস্ব-ও উচ্চারিত হয়। যথা— জৈন (জোইন' বা জোইনো), তৈল (তোইল' বা তোইলো), দৈব (দোইব' বা দোইবো), নৈব (নোইব' বা নোইবো), বৈধ (বোইধ' বা বোইধো), শৈব (শোইব' বা শোইবো), শৈল (শোইল' বা শোইলো), স্ত্রৈণ (স্ত্রোইন' বা স্ত্রোইনো), গৌণ (গোউন' বা গোউনো), ধৌত (ধোউত' বা ধোউতো), পৌর (পোউর' বা পোউরো), বৌদ্ধ (বোউদ্ধ' বা বোউদ্ধো), ভৌম (ভোউম' বা ভোউমো), মৌন (মোউন' বা মোউনো), মৌল (মোউল' বা মোউলো), যৌথ (জোউথ' বা জোউথো), যৌন (জোউন' বা জোউনো), লৌহ (লোউহ' বা লোউহো), সৌধ (শোউধ' বা শোউধো), সৌর (শোউর' বা শোউরো)।

ব্যতিক্রম : নিম্নোক্ত শব্দগুলির শেষ বর্ণের উচ্চারণ হসন্ত— দৌড় (দোউড়্), পৌষ (পোউশ্), শৌচ (শোউচ্)।

এবার এ-কার ও এ স্বরবর্ণের 'এ' ও 'এ্' (অ্যা) উচ্চারণের নিয়মগুলো দেখা যাক :

২৮) তৎসম শব্দের আদ্য এ-কার 'এ' উচ্চারিত হয়। যেমন— কেকা, কেয়ূর (কেয়ুর্), কেশর (কেশর্), কেশরী (কেশ'রি বা কেশোরি), তেজস্ক্রিয় (তেজ'শ্ক্রিয়' বা তোজোশ্ক্রিয়ো), ফেনিল (ফেনিল্), বেগবান (বেগ'বন্ বা বেগোবান্), বেগবতী (বেগ'ব'তি বা বেগোবোতি), রেবা, হেমন্ত (হেমন্ত' বা হেমন্তো)।

২৯) যুক্তবর্ণের শুরুতে এ-কার থাকলে সেটা 'এ' উচ্চারিত হয়। যথা— ক্রেতা, দ্বেষ (দেশ্), প্রেত (প্রেত্), প্রেম (প্রেম্), গ্রেপ্তার (গ্রেপ্তার্), প্রেরণ (প্রের'ন্ বা প্রেরোন্), প্রেরণা (প্রের'না বা প্রেরোনা), প্রেক্ষণ (প্রেক্খোন্), প্রেক্ষাপট (প্রেক্খাপট্), প্রেরক (প্রেরোক্), শ্রেণি (স্রেনি), শ্বেত (শেত্), শ্রেষ্ঠ (স্রেশ্ঠ' বা স্রেশ্ঠো), হ্রেষা (র্হেশা)।

৩০) শব্দের দ্বিতীয় সিলেব্ল-এ (দল-এ) 'ই' থাকলে প্রথম সিলেব্ল-এর 'অ্যা' হয়ে যায় 'এ'। যেমন— ফ্যান থেকে ফেনিল (ফেনিল্), প্যাঁচ বা প্যাঁচানো থেকে পেঁচিয়ে।

৩১(ক) বিশেষ্য বা বিশেষণের 'য়' বা 'হ'-এর পূর্ববর্তী এ-কার 'এ' উচ্চারিত হয় এবং শেষে স্বরধ্বনি থাকে। যথা— কলহ (কলহ' বা কলহো), কেহ (কেহ' বা কেহো), গেহ (গেহ' বা গেহো), গেয় (গেয়' বা গেয়ো), অদেয় (অদেয়' বা অদেয়ো), অজেয় (অজেয়' বা অজেয়ো), দেয় (দেয়' বা দেয়ো), প্রদেয় (প্র'দেয়' বা প্রোদেয়ো), দেহ (দেহ' বা দেহো), দাহ (দাহ' বা দাহো), জ্ঞেয় (গেঁয়' বা গেঁয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়' বা ওনুমেয়ো), নির্ণেয় (নির্নেয়' বা নির্নেয়ো), তুলনীয় (তুলনিয়' বা তুলনিয়ো), প্রিয় (প্রিয়' বা প্রিয়ো), বরণীয় (বর'নিয়' বা বরোনিয়ো), স্মরণীয় (শঁর'নিয়' বা শঁরোনিয়ো), নমনীয় (নম'নিয়' বা নমোনিয়ো), পেয় (পেয়' বা পেয়ো), পানীয় (পানিয়' বা পানিয়ো), বহ (বহ' বা বহো), মদীয় (ম'দিয়' বা মোদিয়ো), সহ (শহ' বা শহো), বিবাহ (বিবাহ' বা বিবাহো), মোহ (মোহ' বা মোহো), বিরহ (বিরহ' বা বিরহো), দ্রোহ (দ্রোহ' বা দ্রোহো), স্নেহ (স্নেহ' বা স্নেহো)।

৩১(খ) শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলেও তার উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে। যথা— গাঢ় (গাড়্হ' বা গাড়্হো), মূঢ় (মুড়্হ' বা মুড়্হো), প্রৌঢ় (প্রৌড়্হ' বা প্রৌড়্হো), দৃঢ় (দৃড়্হ' বা

দৃড়্‌হো)।

৩১(গ) শব্দের শেষে 'ড়' থাকলে নিয়মটা পাকা নয়, অর্থাৎ 'ড়'-এর উচ্চারণ কখনো স্বরান্ত, কোথাও-বা হসন্ত। যেমন— বড় (বড়' বা বড়ো), দড় (দড়' বা দড়ো), কিন্তু আড় (আড়্), ঘাড় (ঘাড়্), সাড় (সাড়্)।

সংস্কৃতে তিনটে 'পুরুষ' (উত্তম, মধ্যম ও প্রথম), ইংরেজিতেও তিনটে person (First, second ও third), কিন্তু বাংলায় ৫টা person অর্থাৎ পক্ষ— আমি, তুমি, তুই, সে ও মানী, পক্ষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ বদলে যায়।

৩২(ক) বেশ কয়েকটা ক্রিয়াপদের এ-কারের সাধারণ উচ্চারণ 'এ্য' (অ্যা) হয়— দেখা (দ্যাখা), খেলা (খ্যালা), ফেলা (ফ্যালা), বেলা (ব্যালা, যেমন রুটি বা লুচি ব্যালা), মেলা (ম্যালা, যেমন চোখ ম্যালা)। কিন্তু এইসব ক্রিয়াপদে 'ই' বা 'উ' যুক্ত হলে এ-কারের উচ্চারণ পালটে 'এ' হয়ে যায়— দেখি/দেখুন, খেলি/খেলুন, ফেলি/ফেলুন, বেলি/বেলুন, মেলি/মেলুন।

৩২(খ) উক্ত ক্রিয়াপদগুলির সাধুভাষায় অসমাপিকা রূপে প্রথম বর্ণের পরে 'ই'-কার ছিল, ফলে তার প্রভাবে এ-কারের 'এ্য' (অ্যা) উচ্চারণ 'এ' হয়ে গিয়েছিল। যেমন— দেখিয়া, খেলিয়া, ফেলিয়া, বেলিয়া, মেলিয়া। চলিত ভাষায় 'ই'-কার উঠে গেলেও 'এ' উচ্চারণ বজায় রয়েছে— দেখে, খেলে, ফেলে, বেলে, মেলে।

৩২(গ) উক্ত ক্রিয়াপদগুলির বর্তমান কালের নিত্যবৃত্ত রূপ ও অনুজ্ঞায় পরে 'ই' 'উ' না-থাকায় এ-কারের 'এ্য' (অ্যা) উচ্চারণ অবিকৃত— (তুমি) দ্যাখ/দ্যাখো, খ্যাল/খ্যালো, ফ্যাল/ফ্যালো, ব্যাল/ব্যালো, ম্যাল/ম্যালো, (তুই) দ্যাখ্, (সে) দ্যাখে, (তিনি) দ্যাখেন। কিন্তু মানী পক্ষে অনুজ্ঞায় পরে 'উ' রয়েছে, যেমন— 'দেখুন', তাই এ-কারের উচ্চারণ 'এ' হয়ে যাচ্ছে।

৩২(ঘ) তুমি পক্ষে উক্ত ক্রিয়াপদগুলির ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সাধুভাষায় 'ই'-কার ছিল, চলিত ভাষায় 'ই'-কার উঠে গেলেও 'এ' উচ্চারণ বজায় রয়েছে— দেখিয়ো থেকে দেখো, খেলিয়ো থেকে খেলো, ফেলিয়ো থেকে ফেলো, বেলিয়ো থেকে বেলো, মেলিয়ো থেকে মেলো।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যেকটির বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা মিলিয়ে মোট ৫৬টি রূপ রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৫টি রূপে এ-কারের উচ্চারণ 'এ্য' (অ্যা) (যেমন দ্যাখা, দ্যাখো, দ্যাখে, দ্যাখ্, দ্যাখেন্), বাকি ৫১টাতেই এ-কারের উচ্চারণ অবিকৃত 'এ'। উপরের বাকি চারটে ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটছে।

৩৩(ক) সাধুভাষায় বেশকিছু ক্রিয়ারূপে দ্বিতীয় বর্ণে যদি 'ই'-কার 'উ-কার' থাকে তাহলে তার প্রভাবে প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে আর সেটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটি কালের ক্ষেত্রেই হয়। যেমন— করি, করিত/করিতে/করিল/করিলে/করিব/করিবে, এইসব শব্দে ক-এর উচ্চারণ হ্রস্ব-ও। অর্থাৎ ক'রি বা কোরি, ক'রিত' বা কোরিতো, ক'রিতে বা কোরিতে, ক'রিল' বা কোরিলো, ক'রিলে বা কোরিলে, ক'রিব' বা

কোরিবো, ক'রিবে বা কোরিবে ইত্যাদি। গড়া, চড়া, চরা, ধরা, নড়া, পড়া, পরা, বলা, হওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও একইরকম ঘটে। যেমন— গড়ি, গড়িত/গড়িতে/ গড়িল/গড়িলে/গড়িব/গড়িবে, চড়ি, চড়িত/চড়িতে/চড়িল/চড়িলে, চড়িব/চড়িবে, চরি, চরিত/চরিতে/চরিল/চরিলে/চরিব/চরিবে, ধরি, ধরিত/ধরিতে/ধরিল/ধরিলে/ধরিব/ ধরিবে, নড়ি, নড়িত/নড়িতে/নড়িল/নড়িলে/নড়িব/নড়িবে, পড়ি, পড়িত/পড়িতে/ পড়িল/পড়িলে/পড়িব/পড়িবে, পরি, পরিত/পরিতে/পরিল/পরিলে/পরিব/পরিবে, বলি, বলিত/বলিতে/বলিল/বলিলে/বলিব/বলিবে, হই, হইত/হইতে/হইল/হইলে/ হইব/হইবে। এই সমস্ত শব্দেরই প্রথম বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব-ও। চলিত বাংলায় শব্দগুলি থেকে ই-কার অবলুপ্ত হলেও প্রথম বর্ণের হ্রস্ব-ও উচ্চারণ অবিকৃত থাকছে। যেমন করত/করতে/করল/করলে/করব/করবে প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ক'র্‌ত' বা কোর্‌তো/ক'র্‌তে বা কোর্‌তে/ক'র্‌ল' বা কোর্‌লো/ক'র্‌লে বা কোর্‌লে/ক'র্‌ব' বা কোর্‌বো/ক'র্‌বে বা কোর্‌বে। উল্লিখিত অন্যান্য ক্রিয়াপদের চলিত রূপের প্রথম বর্ণের উচ্চারণেও হ্রস্ব-ও রয়েছে।

৩৩(খ) এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। 'হইতে' থেকে 'হতে' এবং 'হইলে' থেকে 'হলে'— চলিত বাংলার 'হতে' ও 'হলে' শব্দের উচ্চারণেও আমরা তাই হ্রস্ব-ও পাচ্ছি, অর্থাৎ শব্দ দুটির উচ্চারণ যথাক্রমে হ'তে বা হোতে আর হ'লে বা হোলে। কিন্তু 'হইব' ও 'হইবে' থেকে চলিত 'হব' ও 'হবে' শব্দের উচ্চারণ হ'ব' বা হোবো এবং হ'বে বা হোবে হচ্ছে না কেন? দেখা যাচ্ছে, এই ব্যতিক্রমও একটা নিয়মের অধীন এবং আরো কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে ঘটছে চলিত ভাষার রূপটি দুই অক্ষরের হলে এবং সেটাও শুধু ভবিষ্যৎ কালে। যেমন— কব (কহিব বা কইব থেকে), কবে (কহিবে বা কইবে থেকে), রব (রহিব বা রইব থেকে, উচ্চারণ রব' বা রবো), রবে (রহিবে বা রইবে থেকে), লব (লইব থেকে, উচ্চারণ লব' বা লবো), লবে (লইবে থেকে), বব (বহিব বা বইব থেকে, উচ্চারণ বব' বা ববো), ববে (বহিবে বা বইবে থেকে), সব (সহিবে থেকে, উচ্চারণ সব' বা সবো), সবে (সহিবে বা সইবে থেকে)। এইসব শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও নেই, অবিকৃত 'অ'। এর একটা সম্ভাব্য কারণের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো— হওয়া ক্রিয়াপদের শেষে যেমন 'ওয়া' রয়েছে তেমনই বাকি শব্দগুলির ক্রিয়াপদের শেষেও 'ওয়া' ছিল। যেমন— কওয়া, রওয়া, লওয়া, বওয়া, সওয়া ইত্যাদি।

৩৪) চলিত ভাষায় যেসব ক্রিয়ারূপের আদি এ-কারের উচ্চারণ 'এ' (যেমন 'লিখন' শব্দজাত 'লেখা', 'গিলন' শব্দজাত 'গেলা', 'মিলন' শব্দজাত 'মেলা', 'মিশ্রণ' শব্দজাত 'মেশা) সেগুলির কোনো রূপেই বক্র-এ (এ্য) বা 'অ্যা' উচ্চারিত হয় না। ওইসব ক্রিয়ার 'আমি' পক্ষে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায় মূল 'ই'-কার ফিরে আসে, বাকি সবগুলিতে বর্তমান কালের রূপে এ-কার এবং উচ্চারণ অবিকৃত 'এ' :

লেখা।। আমি লিখি/তুমি লেখো/তুই লেখ্/সে লেখে/তিনি লেখেন/ (অসমাপিকায়) লিখে

গেলা।। আমি গিলি/তুমি গেলো/তুই গেল্/সে গেলে/ তিনি গেলেন/ (অসমাপিকায়) গিলে

মেলা।। আমি মিলি/তুমি মেলো/তুই মেল্/সে মেলে/ তিনি মেলেন/ (অসমাপিকায়) মিলে

মেশা।। আমি মিশি/তুমি মেশো/তুই মেশ্/সে মেশে/তিনি মেশেন/(অসমাপিকায়) মিশে

চেনা।।আমি চিনি/তুমি চেনো/তুই চেন্/সে চেনে/ তিনি চেনেন/(অসমাপিকায়) চিনে

কেনা।।আমি কিনি/তুমি কেনো/তুই কেন্/সে কেনে/তিনি কেনেন/(অসমাপিকায়) কিনে

মানী পক্ষে বর্তমান অনুজ্ঞায় — (আপনি) লিখুন/গিলুন/মিলুন/মিশুন/চিনুন/ কিনুন

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় — তুমি লিখো/তুই লিখিস/আপনি লিখবেন
তুমি গিলো/তুই গিলিস/আপনি গিলবেন
তুমি মিলো/তুই মিলিস/আপনি মিলবেন
তুমি মিশো/তুই মিশিস/আপনি মিশবেন
তুমি চিনো/তুই চিনিস/আপনি চিনবেন
তুমি কিনো/তুই কিনিস/আপনি কিনবেন

এখানে শুধু ৫টায় এ-কার (লেখা/লেখো/লেখ্/লেখে/লেখেন), বাকি সব রূপে ই-কার। উল্লিখিত অন্য ক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটছে।

৩৫) ও বা ও-কার যুক্ত কিছু ক্রিয়া : ওঠা, ওড়া, গোনা, গোলা, তোলা, দোলা, ভোলা। এই ক্রিয়াপদগুলির সাধারণ সমাপিকা রূপে আদি ও বা ও-কার অবিকৃত থাকে। যেমন— ওঠে, ওড়ে, গোনে, গোলে, তোলে, দোলে, ভোলে। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া হলে আদি ও বা ও-কার উ বা উ-কারে পরিণত হয়। যেমন— উঠে, উড়ে, গুনে, গুলে, তুলে, দুলে, ভুলে।

৩৬(ক) ক্রিয়াপদের বাইরে কিছু শব্দের আদি এ-কারের উচ্চারণ '৫' বা 'অ্যা'। যেমন— বেলা (সময় বোঝাতে), মেলা (মেলা বসেছে), কেন, যেন, হেন। এগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে ৫বেলা (ব্যালা), ৫মেলা (ম্যালা) ৫কেনো (ক্যানো), ৫যেনো (জ্যানো), ৫হেনো (হ্যানো) আবার কিছু শব্দের প্রথম এ-কারের উচ্চারণে 'এ' রয়েছে— পেরেক, পেয়ারা, বেঠিক, বেয়াদব, বেআইন, বেআক্কেল। এইসব শব্দের এ-কারের 'অ্যা' ও 'এ' উচ্চারণ পালটায় না।

৩৬(খ) কিছু শব্দে 'এ' বা এ-কারের উচ্চারণ পালটায় পরবর্তী ই-কারের প্রভাবে। এখন, এমন, তেমন, যেমন শব্দগুলির উচ্চারণে এবা ৫ রয়েছে, অর্থাৎ ৫এখোন্ (অ্যাখোন্), ৫এমোন্ (অ্যামোন্), ৫তেমোন্ (ত্যামোন্), ৫জেমোন্ (জ্যামোন্)। শব্দগুলির পরে 'ই' যুক্ত

হলেও (যথা— এখনই, এমনই, তেমনই, যেমনই) প্রথম বর্ণের এ বা ে উচ্চারণ পালটায় না (অর্থ এ্যখোন্ই, এ্যমোন্ই, ত্যেমোন্ই, জ্যেমোন্ই), কিন্তু 'ই'-এর পরিবর্তে তৃতীয় বর্ণে যদি ই-কার যুক্ত হয় তাহলে মধ্য বর্ণের উচ্চারণে হসন্ত আসে আর প্রথম বর্ণের উচ্চারণ বদলে 'এ' হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন উচ্চারণ হবে এম্‌নি, তেম্‌নি, যেম্‌নি। এখনই থেকে কখনো 'এখনি' হয় না, তাই তার উচ্চারণ পালটানোর প্রশ্নও ওঠে না।

৩৬(গ) পরবর্তী উ-কারের প্রভাবেও প্রথম বর্ণের উচ্চারণ পালটে যায়। এখনও, এখনই (উচ্চারণ যথাক্রমে এ্যখোন্‌ও, এ্যখোন্ই) যখন এখুনি/এক্ষুনি হয় তখন প্রথম বর্ণের বক্র-এ অবিকৃত 'এ' রূপে উচ্চারিত হয়। আবার 'তখনও', 'তখনই' (উচ্চারণ যথাক্রমে তখোন্‌ও, তখোন্ই) শব্দ দুটি 'তখুনি' ও 'তক্ষুনি'-তে রূপান্তরিত হলে পরবর্তী উ-কারের প্রভাবে প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসে, অর্থাৎ তখন উচ্চারণ দাঁড়ায় ত'খুনি বা তোখুনি আর ত'ক্‌খুনি বা তোক্‌খুনি।

৩৭) উপরের ৩৬(খ) নম্বর নিয়মে আমরা দেখেছি যে এমন, তেমন, যেমন শব্দগুলির তৃতীয় বর্ণে ই-কার যুক্ত হওয়ায় প্রথম বর্ণের 'অ্যা' উচ্চারণ বদলে 'এ' হয়ে যাচ্ছে, একইসঙ্গে মধ্য বর্ণের স্বরান্ত হ্রস্ব-ও উচ্চারণ পালটে ব্যঞ্জনান্ত (বা হসন্ত) হয়ে যাচ্ছে। এইরকম ঘটনা কিছু শব্দের প্রথম বর্ণে হ্রস্ব-ও হওয়ার সময়েও ঘটে। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, পরবর্তী ই-কার ও উ-কারের প্রভাবে প্রথম বর্ণের 'অ' উচ্চারণ হ্রস্ব-ও হয়। হল শব্দের উচ্চারণ 'হল্', অথচ 'হলুদ' শব্দের উচ্চারণ হ'লুদ্ বা হোলুদ্, কারণ দ্বিতীয় বর্ণে ল-এর সঙ্গে উ-কার রয়েছে। কিন্তু 'হলদি' শব্দের উচ্চারণ হ'ল্‌দি বা হোল্‌দি হলো কেন, এখানে তো ই-কার এসেছে তৃতীয় বর্ণে? দেখা যাচ্ছে যে কিছু শব্দে তৃতীয় বর্ণের ই-কারের প্রভাবেও প্রথম বর্ণের উচ্চারণে হ্রস্ব-ও আসতে পারে, তবে সেইসঙ্গে মধ্য বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ বদলে হসন্ত হয়ে যায়, যেমন হলো 'হলদি' শব্দের 'হোল্‌দি' উচ্চারণের ক্ষেত্রে এবং যেমন হয়েছিল 'এমন', 'তেমন', 'যেমন' শব্দগুলির 'এম্‌নি', 'তেম্‌নি', 'জেম্‌নি' উচ্চারণের ক্ষেত্রে। চরক,পরশ, পশম, বরফ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে চর'ক বা চরোক্, পর'শ বা পরোশ্, পশ'ম্ বা পশোম্, বর'ফ্ বা বরোফ্। কিন্তু এই শব্দগুলির তৃতীয় বর্ণে ই-কার বা উ-কার যুক্ত হওয়ার পরে প্রথম বর্ণের উচ্চারণে যেমন হ্রস্ব-ও আসছে তেমনই দ্বিতীয় বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ পালটে ব্যঞ্জনান্ত হয়ে যাচ্ছে। যথা— চরকি, পরশু, পশমি, বরফি— উচ্চারণ যথাক্রমে চ'র্‌কি বা চোর্‌কি, প'র্‌শু বা পোর্‌শু, প'শ্‌মি বা পোশ্‌মি, ব'র্‌ফি বা বোর্‌ফি। 'পড়শি' আর 'বঁড়শি' শব্দের উচ্চারণও এই নিয়মের অধীন, অর্থাৎ শব্দ দুটির উচ্চারণ প'ড়্‌শি বা পোড়্‌শি আর বঁ'ড়্‌শি বা বোঁড়্‌শি।

৩৮) প্রথম বর্ণে এ-যুক্ত এক, একটা, একা-র উচ্চারণে 'অ্যা' রয়েছে, অর্থাৎ উচ্চারণ যথাক্রমে এ্যক্ বা অ্যাক্, এ্যক্‌টা বা অ্যাক্‌টা, এ্যকা বা অ্যাকা। কিন্তু পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে প্রথম বর্ণের উচ্চারণ 'এ' হয়ে যায়, যেমন— একটি, একটু, যার উচ্চারণ এক্‌টি ও এক্‌টু। এই নিয়মে একটুকু, একুশ, একূল, একীকরণ, একীভূত, একীকৃত প্রভৃতি শব্দের

প্রথম বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত 'এ'। তবে 'একা' শব্দের উচ্চারণ যেহেতু এ্যকা বা অ্যাকা এবং দ্বিতীয় বর্ণের পরে আ-কার রয়েছে সেহেতু তার পরবর্তী বর্ণে ই-কার যুক্ত হলেও প্রথম বর্ণের উচ্চারণ বদলে 'এ' হয়ে যাওয়ার কথা নয়, যেমন— একাকী, একাকিত্ব, একাকিনী, একাগ্নী, একাঙ্গী, একাদিক্রমে, একাধিক, একাধিপতি। শব্দগুলির মান্য উচ্চারণ যথাক্রমে এ্যকাকি বা অ্যাকাকি, এ্যকাকিত্‌তো বা অ্যাকাকিত্‌তো, এ্যকাকিনি বা অ্যাকাকিনি, এ্যকাঘ্‌নি বা অ্যাকাঘ্‌নি, এ্যকাংগি বা অ্যাকাংগি, এ্যকাদিক্‌ক্রোমে বা অ্যাকাদিক্‌ক্রোমে, এ্যকাধিক্ বা অ্যাকাধিক, এ্যকাধিপোতি বা অ্যাকাধিপোতি। অথচ একা (উচ্চারণ এ্যকা) যুক্ত এইরকম কিছু শব্দে পরে ই-কার বা উ-কার না-থাকা সত্ত্বেও একাঙ্গ, একান্ত, একাদশ, একান্ন, একানব্বই (উচ্চারণ যথাক্রমে এ্যকাংগ' বা অ্যাকাংগো, এ্যকান্‌ত' বা অ্যাকান্‌তো, এ্যকাদশ্ বা অ্যাকাদশ্, এ্যকান্‌ন' বা অ্যাকান্‌নো, এ্যকান'ব্‌ব'ই বা অ্যাকানোব্‌বোই) প্রভৃতি শব্দে প্রথম বর্ণের অ্যা উচ্চারণ পালটে অবিকৃত 'এ' করছেন কেউ-কেউ, অর্থাৎ একাংগো, একান্‌তো, একাদশ্, একান্‌নো, একানোব্‌বোই।

এ-প্রসঙ্গে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' চলচ্চিত্রের একটি গানের কথা মনে পড়ছে। 'ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী'—এই অংশের শেষ শব্দটি গাওয়ার সময় সংগীতশিল্পী উচ্চারণ করেছেন এ্যকাংগি বা অ্যাকাংগি, যা সঠিক বলেই আমি মনে করি। কিন্তু তার পরেই একজন চরিত্রাভিনেতার মুখে যখন ওই কথাগুলো পুনরাবৃত্ত হলো তখন প্রথম বর্ণের এ্য বা অ্যা উচ্চারণ বদলে অবিকৃত 'এ' অর্থাৎ 'একাংগি' হয়ে গেল।

মনে হয়, একাংশ (উচ্চারণ এ্যকাংশ' বা অ্যাকাংশো) বাচিক শিল্পী 'একা'-র পরে ই-কার যুক্ত কিছু শব্দের উচ্চারণ পালটে যাওয়া উচিত এই বিবেচনা থেকে প্রথম বর্ণের উচ্চারণে 'এ' আমদানি করেছেন এবং ক্রমশ সেটা বেশি করে প্রচলিত হচ্ছে। তবে এই যুক্তি তো পরে ই-কারবিহীন একাঙ্গ, একান্ত, একাদশ, একান্ন, একানব্বই প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে খাটছে না, এগুলোতে প্রথম বর্ণের অবিকৃত 'এ' উচ্চারণ এল কোত্থেকে?

যা-ই হোক, এই পরিবর্তনগুলো সংগত হয়েছে কি না সে-বিষয়ে রায় দেওয়ার অধিকার আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, এইসব শব্দে বক্র-এ বা অ্যা বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিসম্মত। তবে ভাষায় তো পরিবর্তন ঘটতেই থাকে, তাই এখন যা বেঠিক মনে হচ্ছে একসময়ে হয়তো সেগুলোই বেশি করে মান্যতা পাবে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলো শব্দের দু-রকম উচ্চারণ বিকল্প হিসেবে উচ্চারণের অভিধানে স্থান পেয়েছে।